আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য]

অধ্যাপক সুধাংশুভূষণ চন্দ এম. এ

ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, গুরুদাস কলেজ, কলিকাতা

পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মানসকুমার ভট্টাচার্য এম. এ., এল. এল. বি.

ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়

মাজদিয়া (নদীয়া)

পরীক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের ইতিহাস বিষয়ের দ্বিতীয় পত্র 'ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস (১৭৬৩-১৯৪৫)'-এর পাঠ্য-তালিকা অনুযায়ী এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাসের ঘটনাসমূহ, বলাবাহুল্য, একাধারে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়। পাঠ্যতালিকায় যে কাল নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহে ব্যাপক। এই সময়ের ইতিহাস কেবলমাত্র কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধাদি লইয়াই সম্পূর্ণ নহে, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান, রুশ বিপ্লবের মত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতিও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রন্থে এ-সকল বিষয়ই সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে তাহারা উপকৃত হইলেই শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

গ্রন্থরচনায় যাঁহারা সদা সর্বদা অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত যে সম্পর্ক বিদ্যমান, নামোল্লেখে তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনাবশ্যক। এতৎসত্ত্বেও, অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঔৎসুক্য এই গ্রন্থ রচনায় বহুল পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থকারদ্বয়

SYLLABUS OF HISTORY (Paper II)

Europe and the World (1763-1945)

CHAPTER I : **Europe (1763-1789) :**

Europe in 1763 : Enlightened Despotism.

CHAPTER II : **Industrial Revolution :**

Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries ; Factory System—Effects of the Industrial Revolution upon Contemporary society and politics.

CHAPTER III : **War of American Independence :**

Background ; Causes of war Treaty of Versailles, 1783.

CHAPTER IV **French Revolution and Napoleon :**

Causes of Revolution—Calling of the States General—National Assembly—Legislative Assembly—National Convention—Reign of Terror—Significance of the Revolution—Advent of Nepoleon—From Consulate to Empire—Reforms and Conquests of Napoleon—His fall ; Impact of the Revolution on Europe.

CHAPTER V : **Reconstruction of Europe :**

The Congress of Vienna—Metternich System—Concert of Europe : its activities, causes of its failure.

CHAPTER XII ; **First World War and its Aftermath :**

Causes of the war—Major Participants—Peace Settlement of 1919 to 1923—League of Nations —Modernisation of Turkey.

CHAPTER XIII : Russian Revolution - its impact.

CHAPTER XIV : **Dictatorship and Failure of Collective Security :**

Locarno Treaty and Pact of Paris—Disarmament Work of the League—Fascism on the ascendent and breakdown of Collective Security Chamberlain—Daldiar—Mussolini—Hitlar and Stalin—Origin of Second World War.

CHAPTER XV : **Second World War :**

Its Phases—U. N. O.

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম অধ্যায়ঃ	উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিপ্লব (The Midcentury upheaval) ১৮৪৮—৫০-এর বিপ্লবের ঘটনাবলী, পৃ: ৫৪—৫৫ ; ১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, পৃ: ৫৫—৫৬ ; ১৮৪৮—৫০-এর বিপ্লবের সাফল্য, পৃ: ৫৭—৫৮ ; অনুশীলনী, পৃ: ৫৮ ।	৫৪—৫৮
অষ্টম অধ্যায়ঃ	বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক (Relations of Great Powers) পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, পৃ: ৫৯—৬১ ; তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স পৃ: ৬৪—৭১ ; ইতালীর ঐক্য আন্দোলন, পৃ: ৭১—৮০ , জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন, পৃ: ৮০—৯১ ; অনুশীলনী, পৃ: ৯২ ।	৫৯—৯২
নবম অধ্যায়ঃ	ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ ও মৈত্রী নীতি (Major European States and the System of Alliances) বিসমার্ক এবং দ্বিতীয় উইলিয়মের শাসনাধীনে জার্মানী, পৃ: ৯২—১০২ ; তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে ফ্রান্স, পৃ: ১০২—১০৮ ; রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস (১৮৫৫—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ), পৃ: ১০৮—১২০ ; বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী নীতি (১৮৭১—১৯১৪) ; পৃ: ১২১—২২৪ ; অনুশীলনী, পৃ: ১২৪ ।	৯৩—১২৪
দশম অধ্যায়ঃ	সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ (Socialism and Imperialism) কার্ল মার্কস ও সমাজতন্ত্রবাদ, পৃ: ১২৫—১২৮ :	১২৫—১৪১

আধুনিক ইওরোপ ও বিশ্ব ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

ইওরোপ ১৭৬৩—১৭৮৯
(Europe : 1763-1789)

১৭৬৩ সালের ইওরোপ (Europe in 1763) :

ইওরোপের ইতিহাসে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ এক যুগের অবসান করিয়া অন্য যুগের সূচনা করিয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইওরোপীয় মহাদেশে অস্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি এবং আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে, প্যারিসের শান্তিচুক্তি (Treaty of Paris) দ্বারা, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয় তাহাতে ইংল্যাণ্ডের জয় ও ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইওরোপীয় তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ইংল্যাণ্ড সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক 'Guedalla' বলেন, **"By the Seven years' War England emerged everywhere triumphant".** অপরদিকে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে **হিউবার্টসবার্গের সন্ধি (Treaty of Hubertsburg)** দ্বারা সাইলেশিয়ার উপর প্রাশিয়ার অধিকার স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে একদিকে যেমন প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি জার্মানীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়ার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুদূর ভবিষ্যতে জার্মানীতে যে প্রাশিয়ার একক নেতৃত্ব স্থাপিত হইবে তাহার ইঙ্গিত ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দেই পাওয়া গিয়াছিল।

শান্তি-চুক্তির ফল

প্রাশিয়ার প্রতিপত্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের অপর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা। ফলে ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়। রাশিয়ার তুরস্ক সাম্রাজ্য দখল করার চেষ্টা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তাহাতে বাধাদানের ফলে ১৭৬৩ সালের পরে ইওরোপে যে রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে "নিকট প্রাচ্যের সমস্যা" (Near Eastern Question) বলা হইয়া থাকে।

এইভাবে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানের পরে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইওরোপীয় রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় হইতে ফরাসী দার্শনিকদের মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদের প্রচারের ফলে ভাবজগতে এক নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তদানীন্তন ইওরোপের বিশিষ্ট শাসকগণ **জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী (Enlightened Despot)** শাসক বলিয়া কথিত হন।

জ্ঞানদীপ্ত-স্বৈরাচার (Enlightened Despotism) :

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ২৫ বৎসরের ইতিহাসকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের যুগ বলা হয়।* ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে এই যুগে ইওরোপে এক নূতন রাজনৈতিক আদর্শ সৃষ্টি হয় যাহাকে বলা হয়, "রাষ্ট্রই রাজনৈতিক জীবনের সব, জাতি কিছু নহে"। **("The State is everything, the nation nothing".)** এই রাষ্ট্রে রাজা হইলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষমতা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করিবেন। রাজার ক্ষমতা ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষমতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্ব করিবেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসনের অধিকারী হইলেও সর্বদা প্রজাদের হিতসাধনের চেষ্টা করিবেন। এই শ্রেণীর শাসকবর্গ প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু শাসনকার্যে প্রজাদের কোন অংশ দিতে তাঁহারা রাজী ছিলেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে **মঁতেস্কু (Montesquieu), ভল্তেয়ার (Voltaire), রুশো (Rousseau)** প্রভৃতি ফরাসী দার্শনিকরা চিন্তাজগতে যে নূতন ভাবধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই তদানীন্তন স্বৈরাচারী শাসকদের প্রভাবিত করিয়াছিল। দার্শনিকদের মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আদর্শ সমসাময়িক প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট যোসেফকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে প্রাশিয়ার রাজা মহান ফ্রেডারিক ছিলেন অন্যতম। অল্প বয়স হইতেই ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে এক নূতন ধারণা লইয়া দেশ শাসন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, রাজা শুধু স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী নন, তিনি রাষ্ট্রের **'প্রধান সেবক'**।

শাসক সম্প্রদায়ের মূলনীতি

"The monarch is not the absolute master but only the first servant of the state." রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন ভল্তেয়ারের সহিত পত্রালাপ করিতেন এবং বিশ্বকোষ প্রণেতা **ডেনিস**

*"The quarter century which followed 1763 was pre-eminently the era of benevolent or philosophical despots".—*Hassall*

ডিডেরো (Denis Diderot)-কে তাঁহার সভায় আহ্বান জানাইয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ, রুশো এবং ভল্‌তেয়ারের রচনা পাঠ করিয়া রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যেদিন হইতে আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি সেদিন হইতে দর্শনকে আমার জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, দর্শনের মূলনীতির দ্বারাই অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হইবে।" **("Since I have mounted the throne I have made philosophy the legislator of my life, her governing principles shall transform Austria".)**

এই তিনপ্রধান জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন, যেমন স্পেনের রাজা **তৃতীয় চার্লস** ও পোর্তুগালের রাজা **প্রথম যোসেফ**। এই সকল শাসকগণ নিজেদের মনোজগতের পরিবর্তন হেতু, এবং এ পর্যন্ত প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কোন কিছু করা হয় নাই বলিয়া অনুশোচনার ফলে নিজেদের রাজ্যে নানাপ্রকার সংস্কার-কার্যে উদ্যোগী হন। এইজন্যই ১৭৬৩-১৭৮৯ সালের যুগকে **অনুতপ্ত রাজতন্ত্রের যুগ ("Age of Repentant Monarchy")** নামেও অভিহিত করা হইয়াছে।

এই শাসনপ্রথার প্রবক্তাগণ

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইহাতে জনসাধারণের কোন অংশ না থাকার ফলে কোন্ সংস্কার তাহাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা শাসকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। নিজেদের ইচ্ছামত সংস্কার করিলেই প্রজাদের মঙ্গল হইবে এই ছিল তাঁহাদের ধারণা। যে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণ এতকাল শোষিত হইয়াছে সেই শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে হঠাৎ সংস্কার ঘোষিত হওয়ায় তাহাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। পরস্পর অবিশ্বাসের ফলে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা কোন স্থায়ী সংস্কার সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়াও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা যে সংস্কারে হাত দিয়াছিলেন তাহা কার্যকরী করিতে দীর্ঘকালের চেষ্টার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের উত্তরাধিকারিগণ সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের সংস্কার আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই জ্ঞানদীপ্ত বা প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের বিফলতার জন্যই ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা জনগণের উন্নতি হইতে পারে ইহাই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল।

এই শাসনপ্রথার ত্রুটি

অনুশীলনী

1. What was the condition of Europe at the opening of 1763 ?
   (১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থা কি ছিল ?)

উঃ 'ইওরোপ (১৭৬৩)' (পৃঃ ১) দেখ।

2. What do you mean by 'Enlightened Despotism' ? Who were its spokesmen ? How were their ideas of sovereignty changed ?
   ('জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার' বলিতে কি বুঝ ? কাহারা ইহার প্রবক্তা ছিলেন ? কেমন করিয়া সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ পরিবর্তিত হইয়াছিল ?)

উঃ 'জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার' (পৃঃ ২-৩) দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব
(Industrial Revolution)

অষ্টাদশ শতাব্দীর আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা **"শিল্পবিপ্লব"**। ইংল্যাণ্ডেই ইহা সর্বপ্রথম দেখা দিয়াছিল; মানুষের শারীরিক শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদনের নূতন ব্যবস্থাকে **শিল্পবিপ্লব** বলা হয়। আবিষ্কারকদের দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে এই বিপ্লব সম্ভব হয়।

প্রয়োজনের তাগিদেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয় (**"Necessity is the mother of inventions"**)। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পর এক দেশ হইতে কাঁচামাল অপর দেশে পৌঁছিবার সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। নূতন আবিষ্কৃত দেশগুলির বাজারে শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের সুবিধা হইল, উপরন্তু সেই সকল দেশ হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধাও ছিল। তৈয়ারী সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অল্পকালের মধ্যে অধিক পরিমাণ সামগ্রী প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

শিল্পবিপ্লবের বহুমুখী প্রসার

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যন্ত্রশিল্পের বিকাশ (কারখানা প্রথা)

[Scientific Inventions and Growth of Mechanical Industries (Factory System)] :

নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যেই শিল্পবিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। ইংল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্পেই সর্বপ্রথম এক নূতন উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। অল্প-সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ সূতা এবং অধিক সংখ্যক বস্ত্র প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইল। বয়ন শিল্পের উন্নতি সাধনে **কে' (Key)**-এর **"ফ্লাই-শাটল" (Fly-Shuttle)** বা দ্রুত চালাইতে পারা যায় এরূপ **'মাকু'**, **হারগ্রীভস্ (Hargreaves)**-এর **"স্পীনিং জেনি" (Spinning Jenny)**, **কার্টরাইট (Cartwright)**-এর **'পাওয়ারলুম' (Power-loom)** এবং **আর্করাইট (Arkwright)**-এর **ওয়াটার-ফ্রেম (Water-Frame) প্রভৃতি** আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্পে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হইল।

বয়ন-শিল্পের আবিষ্কার

ইহার কিছুকালের মধ্যে (১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ) ইংল্যাণ্ডের **জেমস্ ওয়াট** বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ইহার ফলে রেলগাড়ী, বাষ্পীয়পোত ও মুদ্রণযন্ত্র বাষ্পের দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। **জর্জ স্টিফেনসন্** রেলইঞ্জিন নির্মাণ করিলেন। কয়লার খনিতে কাজ করিবার জন্য **নিরাপদ বাতি** (Safety Lamp) আবিষ্কৃত হওয়ায় কয়লা-খনির কাজের সুবিধা হইল। লোহা গলাইবার জন্য **"মারুত-চুল্লী"** (**Blast Furnace**) আবিষ্কৃত হওয়ায় ইস্পাত ও লৌহ-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হইল। কাঁচারাস্তাকে পিচ ঢালাই করিয়া বৎসরের সকল সময়ের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করিলেন **ম্যাকাডেম** (**Macadam**)—যাহার ফলে যাতায়াতের সুবিধা হইল। বাষ্পীয়-শক্তি আবিষ্কারের পর বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হইলে উৎপাদন প্রণালী সহজতর হইল। **হুইট্স্টোন ও কুক্** টেলিগ্রাম ও **প্রফেসার গ্রেহাম** টেলিফোন আবিষ্কার করিলে সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রেরণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই সুবিধা সৃষ্টি করে। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্পক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন দেখা দিল।

নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

শিল্পবিপ্লবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল হইল **কারখানা প্রথা** (**Factory System**)-এর সৃষ্টি। বড় বড় কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া উঠিল। এইসব শিল্প **শ্রম-বিভাজন** (**Division of Labour**) এবং **প্রচুর উৎপাদন** (**Large Scale Production**) এই নীতিগুলি গ্রহণ করার ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস হইয়া গেল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিশ্বের সকল অংশ একই অর্থনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ হইল। শিল্পপ্রধান দেশগুলির আর্থিক সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কারখানা প্রথার ফল

নূতন কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম হইতে আসিয়া কৃষক ও মজুরগণের কারখানার কাজ গ্রহণ করার ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য হইল। ধনী ব্যক্তিগণ সঞ্চিত অর্থ কারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ করিয়া লাভবান হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে সমাজে **পুঁজিপতি** (**Capitalist**) ও **শ্রমিক** (**Labour**) এই দুই শ্রেণী গড়িয়া উঠিল।

সমকালীন সমাজ এবং রাজনীতির উপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব (Effects of the Industrial Revolution on contemporary society & politics) :

শিল্প-বিপ্লবের দ্বারা অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত হওয়ায় সমসাময়িক সমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছিল ; কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর হইতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। নূতন নূতন অঞ্চল হইতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের এবং নূতন নূতন বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা তীব্র আকারে দেখা দিয়াছিল। অবশ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার সাধন হইয়াছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল।

নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব

শিল্পবিপ্লবের ফলে কেবলমাত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনই হয় নাই, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফলাফল দেখা যায়। (শিল্প-মালিকগণ তাঁহাদের অর্থবল ও সামাজিক প্রতিপত্তির সাহায্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে শ্রমিকগণ বুঝিতে পারিল যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিলে তাহাদের কোনও ভবিষ্যৎ নাই। এই কারণে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকগণ পার্লামেণ্টে আসন লাভের জন্য **'চার্টিস্ট আন্দোলন'** (**Chartist Movement**) নামে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করিয়া অবিলম্বে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার আদায় করিয়া লইল।) বিভিন্ন দেশে **ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union)** আন্দোলন গড়িয়া উঠিল এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ক্রমশ ইহাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যখন শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ তেমন ভাবে দূর করিতে পারিল না, তখন **সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)**-এর আদর্শ বিভিন্ন দেশে প্রচার হইতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন দেশের সরকার শ্রমিক-উন্নয়ন আইন-কানুন চালু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আন্দোলনের ফল

অনুশীলনী

1. **What is Industrial revolution ? How was it possible ?**

   (শিল্প বিপ্লব কাহাকে বলে ? কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইয়াছিল ?)

উঃ 'শিল্প বিপ্লব' (পৃঃ ৫-৬) দেখ।

2. **What were its farreaching effects ?**

   (ইহার সুদূরপ্রসারী ফলাফলগুলি কি হইয়াছিল ?

উঃ 'সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব' (পৃঃ ৬-৭) দেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ
(War of American Independence)

পূর্বকথা (Background) :

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে কানাডা হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমেরিকাবাসী ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ফরাসী ভীতি দূর হয়। ফরাসী ভীতি দূর হইলে ঔপনিবেশিকগণ ব্রিটিশ শক্তির উপর তাহাদের নির্ভরশীলতার আর প্রয়োজন বোধ করিল না। তাহারা স্বাধীনতাকামী হইয়া ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইতে চাহিল। ঔপনিবেশিকদের সমাজ-ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রাধান্য না থাকিয়া অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক থাকায় তাহারা নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছিল। ভৌগোলিক দিক হইতে দেখিলেও আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করার ইচ্ছা জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড হইতে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া শাসন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার অসুবিধা এবং ইংল্যাণ্ডে **হ্যানোভারবংশের** রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রী **ওয়ালপোলের** উপনিবেশগুলির প্রতি উদাসীনতা ঔপনিবেশিকদের মধ্যে মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডের প্রতি বিরোধিতার মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন **মার্কেণ্টাইলবাদ (Mercantilism)** নীতি অনুসারে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য মাতৃভূমি দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত যাহার ফলে সেখানেরই উন্নতি সাধিত হয়। দীর্ঘদিন এইরকম ব্যবস্থা বর্তমান ছিল, কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে ফরাসী ভীতি দূর হইলে এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা **তৃতীয় জর্জের** আদেশ অনুসারে ঔপনিবেশিকদের উপর ব্যাণিজ্যিক বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইলে ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা শুরু করে।

অস্বাভাবিক পরিবেশ

যুদ্ধের কারণ (Causes of War) :

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত **'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' (Stamp Act)**-কেই দায়ী করা যায়। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জের প্রধানমন্ত্রী **জর্জ গ্রেনভিল (George Grenville)** আমেরিকার তেরটি

উপনিবেশের উপর স্ট্যাম্প এ্যাক্ট বা দলিল কর বসাইয়া উপনিবেশগুলির প্রতিরক্ষা ব্যয়ের একাংশ আদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই আইন দ্বারা আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের যাবতীয় আইনগ্রাহ্য দলিল পত্রে 'স্ট্যাম্প' লাগান বাধ্যতামূলক হইয়াছিল। 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট'-এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ঔপনিবেশিকদের উপর কোন প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিতে চেষ্টা করে নাই। এমন অবস্থায় 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' পাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিকগণ এই করের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা শুরু করিয়াছিল। **"No taxation without representation"** এই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়াছিল। যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের কোন প্রতিনিধি নাই সেই পার্লামেণ্টের আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের উপর কর স্থাপন করার কোন অধিকার নাই, একথা ঔপনিবেশিকগণ জানাইল। সমস্ত আমেরিকায় 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট'-এর বিরোধিতা ছড়াইয়া পড়িল। ঔপনিবেশিকগণ ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বয়কট করিলে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। গ্রেনভিল মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী **লর্ড রকিংহাম** 'স্ট্যাম্প এ্যাক্ট' বাতিল করিয়া দিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক **'ঘোষণার আইন'** (Declaratory Act) পাস করিয়া জানাইলেন যে, উপনিবেশগুলির উপর ইংরেজ পার্লামেণ্টের কর স্থাপনের অধিকার আছে। এই ঘোষণার মধ্যেই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিবাদের কারণ রহিয়া গেল। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী **চার্লস টাউনসেণ্ড** উপনিবেশগুলিতে আনীত কাচ, কাগজ, চা, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিলেন। এই সকল কর স্থাপনের ফলে ঔপনিবেশিকগণ তীব্র আন্দোলন শুরু করিল। তাহারা ইংল্যাণ্ড হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। এদিকে ইংরেজ সরকার বোস্টনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিলেন, যাহার ফলে (১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে) ইংরেজ সৈন্যদল বহুসংখ্যক বোস্টনবাসীকে হত্যা করিল। ইহা **'বোস্টন হত্যাকাণ্ড'** (Boston Massacre) নামে খ্যাত।

স্ট্যাম্প এ্যাক্ট

ঘোষণার আইন

কর স্থাপন

এই ব্যাপারে পার্লামেণ্টের বিশিষ্ট সভ্যদের তীব্র সমালোচনায় **রাজা জর্জ** প্রমাদ গণিলেন। তিনি **লর্ড নর্থকে** প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। লর্ড নর্থ প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই কেবলমাত্র চা ভিন্ন অন্য সকল জিনিসের উপর কর উঠাইয়া লইলেন। চা-এর উপর কর বজায় রাখার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশগুলির উপর ইংরেজ পার্লামেণ্টের কর স্থাপনের অধিকার বজায় রাখা। ঔপনিবেশিকগণ নীতির দিক হইতে এই সামান্য

করদানেও রাজী ছিল না। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বোস্টন বন্দরে ইংল্যাণ্ডের জাহাজে করিয়া চা-এর বাক্স পৌঁছিলে কয়েকজন ঔপনিবেশিক রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠিয়া বহু চায়ের বাক্স জলে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রতিশোধ হিসাবে ইংরেজ সরকার বোস্টনের বন্দরটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ম্যাসাচুসেট্‌সের স্বায়ত্তশাসন কাড়িয়া লইলেন (১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ)। ঐ বৎসরই সর্বপ্রথম তেরটির মধ্যে বারটি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ ফিলাডেলফিয়া নামক শহরে এক কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবেত হইলেন। এই সভায় ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল এবং ইংরেজ সরকারের নিকট উপনিবেশগুলির অভিযোগ দূর করিবার জন্য এক আবেদন পত্র পাঠান হইল। কিন্তু এই সময় রাজা তৃতীয় জর্জ বৃটিশ পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনে ঔপনিবেশিকগণকে বলপ্রয়োগ নীতি অবলম্বন করিয়া দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকগণও তাঁহাদের দাবীতে অটল রহিলেন।

অনমনীয় মনোভাব

আপসের আবেদন

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ম্যাসাচুসেট্‌সের লেক্সিংটন শহরে ঔপনিবেশিকগণ ও ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। **১৭৭৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।** এই ঘোষণাপত্রে বলা হইল জীবনধারণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা ভোগ করা মানুষ মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। জনসাধারণ হইল সরকারের শক্তির উৎস এবং সরকার অত্যাচারী হইয়া উঠিলে উহাকে পদচ্যুত করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। এই ঘোষণার উপর ভিত্তি করিয়া আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঔপনিবেশিকগণ **জর্জ ওয়াশিংটনকে** তাঁহাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া যুদ্ধ শুরু করিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ও পার্লামেণ্ট আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাকে রাজদ্রোহিতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়া ঔপনিবেশিকগণকে দমন করিবার চেষ্টা করিলেন। ঔপনিবেশিকগণ কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি ফ্রান্স ভুলিতে পারে নাই। ফলে আমেরিকার **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন** যখন ফ্রান্সের সাহায্য চাহিবার জন্য প্যারিসে উপস্থিত হইলেন তখন ফরাসী সরকার উপনিবেশগুলিকে সাহায্য দান করিতে রাজী হইল। স্পেন ও হল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে **জেনারেল বার্গোয়েনের** অধীনে ইংরেজ বাহিনীর **স্যারাটোগার যুদ্ধে** পরাজয়, **নিউইয়র্ক টাউন ও ভার্জিনিয়ার যুদ্ধে** লর্ড

ঘোষণার শর্তাবলী

ফরাসী সাহায্য

কর্ণওয়ালিসের অধীনে ইংরেজ বাহিনীর আত্মসমর্পণ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান করিয়াছিল। **ভার্সাই-এর সন্ধি** (১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ) দ্বারা ইংল্যাণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে এক নতুন স্বাধীনদেশ রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির অন্যতম হিসাবে গণ্য হয়।

স্পেনীয় ও ওলন্দাজ সাহায্য

অনুশীলনী

1. What was the background of the war of American Independence?
   (আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বকথা কি?

উঃ 'পূর্বকথা' (৮) দেখ।

2. What were the causes of the war of American Independence?
   (আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি কি?)

উঃ 'যুদ্ধের কারণ' (৮-৯) দেখ।

3. Give an account of how and where did the nationalists get foreign help for achieveing their objectives?
   (কেমন করিয়া এবং কোথায় স্বাধীনতাকামীরা বৈদেশিক সাহায্য পাইয়াছিল তাহার একটি বর্ণনা দাও।)

উঃ (১০-১১) দেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন
French Revolution and Napoleon

ফরাসী বিপ্লবের কারণ (Causes of the Revolution) :

ইওরোপের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। বর্তমান সভ্যতার রাজনৈতিক আদর্শ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তা ফরাসী বিপ্লব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। এই বিপ্লব কিন্তু কোন একটি কারণে অথবা কোন আকস্মিক ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই।

বিপ্লবের কারণ

বহুদিনের পুঞ্জীভূত নানাপ্রকার অভিযোগ বিপ্লবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। (১) **দার্শনিক,** (২) **সামাজিক,** (৩) **অর্থনৈতিক** ও (৪) **রাজনৈতিক** এই চারিটি কারণের জন্য ফরাসী বিপ্লব শুরু হইয়াছিল। এই চারিটি কারণের মধ্যে আবার দার্শনিক ও অর্থনৈতিক কারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। "ফরাসী বিপ্লব অর্থনৈতিক কারণের জন্য আরম্ভ হয় এবং দার্শনিকরা যে বারুদের স্তূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সে বারুদে অর্থনৈতিক কারণ জলন্ত অগ্নি তৈয়ারি করিয়াছিল।"* আরও বলা হইয়াছে, "বিপ্লবের কারণগুলি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, দার্শনিক বা সামাজিক কারণগুলি তত নহে।"** অতএব দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কোন দেশেই বিপ্লব একটি বিশেষ কারণের জন্য হয় না। বহুদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ নানাবিধ কারণের মাধ্যমে বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।

(১) দার্শনিকদের প্রভাব (Influence of the French Philosophers) :

ফরাসী বিপ্লবের কারণ হিসাবে দার্শনিকদের অবদান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা পরোক্ষভাবে বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসী দার্শনিকদের মধ্যে **মঁতেস্কু (Montesquieu , ভল্‌তেয়ার (Voltaire)** এবং **রুশো (Rousseau)**-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দার্শনিক প্রভাব

---

*The French Revolution was the outcome of economic cause and the train which was laid by philosophy was fired by finance". —*Guedalla*.

**"The causes of the movement were chiefly economical and political, not philosophical or social". —*Morse Stephens*

মন্তেস্কু তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ **'দি স্পিরিট অব লজ'** (The Spirit of Laws)-এ রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ, আইনপ্রণয়ন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ দাবি করেন। তাঁহার অপর গ্রন্থ **'দি পারসিয়ান লেটার্স'** (The Persian Letters)-এ তিনি পরিহাসচ্ছলে সমসাময়িক ফরাসী সমাজের দোষত্রুটির সমালোচনা করেন।

মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

ভল্‌তেয়ার নাটক, ইতিহাস, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি যাজকদের দুর্নীতি ও অভিজাতদের সুযোগ-সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখেন।

ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)

রুশো ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশে এক নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার **'সোশিয়েল কনট্রাক্ট'** (Social Contract) গ্রন্থ ফরাসীদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। তিনি এই বিখ্যাত গ্রন্থে রাষ্ট্র এবং সরকারের উৎপত্তি আলোচনা করিতে গিয়া দেখাইলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে রহিয়াছে। রাজা যদি অন্যায় করেন তাহা হইলে জনসাধারণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। রুশোর এই সামাজিক চুক্তির মতবাদ ফ্রান্সের চিন্তাজগতে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

রুশো (১৭১১-১৭৭৮)

উপরিউক্ত তিনজন দার্শনিক ছাড়া **এনসাইক্লোপিডিস্ট** ("Encyclopaedists") নামক মনীষীরা একখানি বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সংক্ষিপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার-স্বরূপ গ্রন্থে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও চার্চের দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে।

এনসাইক্লোপিডিস্ট

দার্শনিকরা তাঁহাদের যুক্তিপূর্ণ রচনাদ্বারা ফরাসীদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ত্রুটিগুলি জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। ঐতিহাসিক Hazen বলিয়াছেন, ফরাসীদেশের জরুরী সমস্যাগুলির প্রতি তাঁহারা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনার ঝড় তোলেন। ঐতিহাসিক David Thomson বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং অশ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করেন। ফরাসী দার্শনিকরাই জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন সামাজিক ভিত্তিকে ভাঙ্গিবার মানসিক প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করিলেন।

ঐতিহাসিকদের নির্দেশ

(২) সামাজিক কারণ (Social Causes):

সামাজিক কারণের গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রাইকার বলেন, "শ্রেণীসংঘাতই

'ফরাসী বিপ্লবের কারণ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্ষমতা লাভের আন্দোলনই ইহার মূলে'*। ফরাসীদেশের সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সমাজ প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) **অধিকারপ্রাপ্ত (Privileged)** যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত সম্প্রদায় এবং (২) **অধিকারবিহীন (Unprivileged)** মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। প্রথম সম্প্রদায় সরকারী উচ্চপদ, সুযোগ-সুবিধা এবং সম্মান ভোগ করিত কিন্তু কর ফাঁকি দিত। অপরদিকে দ্বিতীয় সম্প্রদায় উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং কর দিতে বাধ্য হইয়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে তাহারা রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অবসান চাহিয়াছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক "অহমিকাই ছিল বিপ্লবের মূল কারণ।" কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরাও অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্যের জন্য অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সামাজিক বৈষম্য এবং শোষণ দূর করিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

সামাজিক বৈষম্য

(৩) অর্থনৈতিক কারণ (Economic Causes):

ইহা মনে রাখা দরকার এই সকল কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।** রাজকোষ শূন্য হওয়ার জন্যই ১৭৮৯ সালের ৫ই মে ষোড়শ লুইকে ১৭৫ বৎসর পর ফরাসীদেশের **প্রতিনিধি সভা** বা **States General**-কে ডাকিতে হইয়াছিল। অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী যুদ্ধ, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্সের যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। রাজকীয় বিলাসিতায়ও প্রচুর অর্থব্যয় হইত কিন্তু সেই অনুপাতে কর আদায় হইত না। সমাজের উপরের অভিজাত এবং যাজক এই দুই সম্প্রদায় নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত কিন্তু কর দিত না। ইহার ফলে রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দেয়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই কেহই কর আদায়ের কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ইহা বলা ন্যায়সঙ্গত হইবে যে, সবগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল হিসাবেই ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল।

*"The Revolution was the outcome of a struggle between classes, of a movement for social equality by the bourgeois". —*Riker*.

**"Fiscal cause lay at the root of the Revolution".

(৪) রাজনৈতিক কারণ (Political Causes) :

রাজনৈতিক কারণ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলা হয়। অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের রাজাদের ন্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের রাজারাও স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ভগবান-প্রদত্ত ক্ষমতার উপর নিজেদের স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরাজদ্বয় **পঞ্চদশ এবং ষোড়শ লুই-র** শাসনক্ষমতা মোটেই ছিল না। তাহারা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। ইহা ভিন্ন সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের মর্যাদা ফরাসী জাতির নিকট ম্লান হইয়াছিল। রাজারা শাসনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে স্বার্থান্বেষী, অভিজাত এবং যাজক শ্রেণী শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। **ইনটেনডেণ্ট** (Intendant) নামক রাজকর্মচারিগণ এখন **'স্বার্থলোলুপ নেকড়ে বাঘ' (ravening wolves)**-এ পরিণত হয়। শাসনকার্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বা কঠোর ব্যবস্থার দ্বারা অভিজাত এবং যাজক সম্প্রদায় হইতে কর আদায় করার ক্ষমতা **পঞ্চদশ বা ষোড়শ লুই** কাহারও ছিল না। পঞ্চদশ লুই বলিয়াছিলেন, "আমার পরে বন্যা হয় হউক"।* পঞ্চদশ লুই-এর অমিতব্যয়িতা এবং ষোড়শ লুই-এর আমলে ফরাসী সরকারের আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করিয়া উপনিবেশিকগণকে অর্থ সাহায্যদানের ফলে রাজকোষ নিঃশেষিত হয় এবং ফরাসী সরকার ঋণভারে নত হইয়া পড়ে। ফরাসী রাজতন্ত্র স্বৈরাচারের মূলভিত্তি পরিপূর্ণ রাজকোষ হারাইয়া এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৭৫ বৎসর পর জাতির **প্রতিনিধি সভা** (States-General) ডাকিতে বাধ্য হইল।

রাজকীয় ক্লীবতা

ফরাসী বিপ্লবের গতি (Course of the Revolution)

স্টেট স জেনারেলকে ডাকা (Calling of the States-General) :

১৭৮৯ সালের ৫ই মে **স্টেটস্ জেনারেলের** আনুষ্ঠানিক অধিবেশন শুরু হইলে ষোড়শ লুই এবং তাঁহার মন্ত্রী **নেকার** সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কথা সদস্যগণকে অবহিত করেন। কিন্তু সদস্যগণ প্রথমেই দাবি করিলেন যে তিন শ্রেণীর সদস্যগণ যাজক, অভিজাত এবং জনসাধারণ মিলিতভাবে একটি জাতীয়সভা গঠন করিবেন এবং প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। স্টেটস-জেনারেলের তিন শ্রেণীর সদস্যগণ আলাদা কক্ষে সমবেত হইতেন এবং প্রত্যেক কক্ষের

স্টেটস্ জেনারেল

*"After me the deluge".

একটি করিয়া ভোট ছিল। যাজক, অভিজাত এবং জনসাধারণ এই তিন শ্রেণীর একটি করিয়া ভোট থাকার ফলে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী সর্বদা ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিত। ষোড়শ লুই কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর দাবি মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে ১৬ই জুন, ১৭৮৯ সালে স্টেটস-জেনারেলের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ নিজেদের ফ্রান্সের **জাতীয় সভা (National Assembly)** বলিয়া ঘোষণা করিল। ষোড়শ লুই এবং যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর বিরোধিতায় ভীত না হইয়া এক টেনিস খেলার মাঠে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করিলেন, যতদিন তাঁহারা ফরাসী দেশে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিবেন ততদিন তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবেন।

জাতীয় সভা (National Assembly)

এই জাতীয় সভাকে ষোড়শ লুই শেষপর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইলেন (২৭শে জুন, ১৭৮৯) এবং তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদিগকে একত্রে বসিবার ও প্রত্যেককে একটি করিয়া ভোট দিবার আদেশ জারী করিলেন। ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ সালে এক ক্ষিপ্ত জনতা **বাস্টিল (Bastille)** দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্ত করিলে প্যারিসের জনতা বিপ্লবের গতি পরিচালনায় এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। ৫ই অক্টোবর, ১৭৮৯ সালে কয়েক হাজার ফ্রান্সের স্ত্রীলোক খাদ্যের দাবিতে ভার্সাই নগরীতে যায় এবং প্রায় বন্দী অবস্থাতেই রাজা ও রানীকে প্যারিস নগরীতে নিয়া আসে। বাস্টিল দুর্গের পতনের পর জনতা দ্বিতীয়বার এইরূপ নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। ভার্সাই হইতে রাজপরিবার প্যারিস নগরীতে আসিবার ফলে জাতীয় সভাও প্যারিসে অধিবেশনে বসিল এবং এক নূতন শাসনতন্ত্র রচনার কাজে মনোনিবেশ করিল। জাতীয় সভা **সংবিধান সভা (Constituent Assembly)**-তে পরিণত হইল।

বাস্টিল আক্রমণ

এই সংবিধান সভা ৬ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করিয়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া একটি **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)** প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। **প্রস্তাবনা পত্রে (Preamble)** আমেরিকার **স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of Independence)** ও ইংল্যাণ্ডের **ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta)**-র অনুকরণে **"ব্যক্তির অধিকার ঘোষণা" (Declaration of the Rights of Man)** নামে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত হইল এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, স্বাধীনতা

সংবিধান সভা (Constituent Assembly)

মানুষের জন্মগত অধিকার এবং প্রত্যেক মানুষই সমান অধিকারের অধিকারী। ইহাও বলা হইল আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান এবং বিনা বিচারে কাহাকেও বন্দী করা চলিবে না। প্রস্তাবনা-পত্র পাস করিয়া সংবিধান সভা রাজক্ষমতা নির্ধারণে মঁতেস্কুর ক্ষমতা-বিভাজন নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি অনুসারে শাসন বিভাগ, আইন প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগকে পৃথক করা হইল এবং রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা হইল। **রাজ পরিবারের ব্যয়ের** একটি **তালিকা** (Civil List) প্রস্তুত করা হইল এবং সেই তালিকা অনুযায়ী রাজাকে অর্থবরাদ্দ করা হইবে স্থির হইল।

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

শাসন বিভাগ (Executive) রাজা পরিচালনা করিবেন। কিন্তু রাজা আইনের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না বা আইনের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। রাজা **Suspensive veto** প্রয়োগ করিয়া আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত আইন সাময়িক স্থগিত রাখিতে পারেন কিন্তু আইনসভা কর্তৃক পর পর তিনটি অধিবেশনে সেই আইন পাস হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। রাজা মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাহারা আইনসভার সদস্য হইতে পারিবেন না। আইনসভার সম্মতি ভিন্ন রাজা কোন যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি-স্থাপন করিতেও পারিবেন না। এক-কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠিত হইল কিন্তু এই আইনসভার সদস্যগণ শুধু করদাতাদের ভোটদ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৮৩টি **ডিপার্টমেণ্ট** (Department) বা প্রদেশে ভাগ করা হইল। এই সকল ভাগের শাসনকর্তা বা বিচারকগণ নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে স্থির হইয়াছিল।

শাসন বিভাগ

সরকারের আর্থিক সমস্যা সমাধান করিবার জন্য সংবিধান সভা চার্চের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া **'এসাইনেট্'** (Assignat) নামে এক প্রকার কাগজের নোট প্রচলিত করে। এই নোট সাময়িক ভাবে সরকারের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইল।

আর্থিক বন্দোবস্ত

Civil constitution of the clergy নামে এক আইন পাস করিয়া চার্চকে রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগে পরিণত করা হইল।

সংবিধান সভার কার্যাবলী সমালোচনা করিয়া বলা যায় যে, এই সভা যদিও সাম্যের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছিল কিন্তু শুধু করদাতারা ভোট দিতে পারিবে এই নীতি গ্রহণ করিয়া **'ব্যক্তি অধিকারের ঘোষণা'** **(Declaration of the Rights of Man)**-এর বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল।

সংবিধান সভার কাজ চলাকালীন ২১শে জুন, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে রাজা ও রানী গোপনে দেশত্যাগ করিতে যাইয়া ভেরেনিস (Varennes) নামক স্থানে ধরা পড়েন। রাজকীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছে এজন্যই রাজা ও রানী দেশত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ব্যর্থ চেষ্টার ফলে রাজতন্ত্রের প্রতি ফ্রান্সের অধিবাসীদের আস্থা লোপ পাইল এবং ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক মনোভাব গড়িয়া উঠিল। রাজার পলায়নের চেষ্টার পর হইতেই ইউরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের সহিত জড়াইয়া পড়িল। ফরাসীদেশের **রানী মেরী এন্টোয়নেট** (Marie Antoinette)-এর ভ্রাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাট **লিওপোল্ড** (Leopold) পাড়ুয়া নামক স্থান হইতে এক **প্রচারপত্র** ঘোষণা (Manifesto of Padua, 6th July, 1791) করিয়া ইউরোপের রাজগণকে ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। ইংল্যাণ্ড এই অনুরোধ গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ২৭শে আগস্ট, ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে লিওপোল্ড ও প্রাশিয়ার রাজা **পিলনিজের ঘোষণা** (Declaration of Pilnitz) প্রচার করেন। এই যৌথ ঘোষণায় বলা হইল যে, ফরাসীদেশের পরিস্থিতি ইউরোপীয় রাজগণের চিন্তার বিষয় এবং ইউরোপীয় রাজগণ হস্তক্ষেপ করিয়া ফরাসীরাজকে স্বক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। দু'বার এইরূপ ভীতি প্রদর্শনের ফলে ফরাসী জাতি উত্তেজিত হইল বটে কিন্তু ভীত হইল না। এদিকে ষোড়শ লুই বাধ্য হইয়া নূতন সংবিধান স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)। ৩০শে সেপ্টেম্বর সংবিধান সভার অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন হওয়ার পর ১লা অক্টোবর হইতে নূতন **আইনসভা** (Legislative Assembly) সংবিধান সভার স্থান গ্রহণ করিল।

রাজকীয় পলায়ন প্রচেষ্টা

পাড়ুয়া প্রচার পত্র

পিলনিজের ঘোষণা

নূতন সংবিধান স্বীকার

আইন সভা (Legislative Assembly):

আইনসভার ৭৪৫ জন সদস্য রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সভাকক্ষের আসনগুলিতে বসিলেন। যাঁহারা শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন (**Feuillants or Constitutionalists**) তাঁহারা সভাকক্ষের দক্ষিণদিকের আসন গ্রহণ করিবেন। আর যাঁহারা প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী [যেমন, **জেকোবিন ও গিরাণ্ডিস্ট** (Jacobins and Girondists) দুইদল] তাঁহারা বামদিকে বসিবেন।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইনসভা দুইটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইল। প্রথমত, যে সকল যাজক **Civil constitution of the clergy** নামে আইন মানিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিষয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই সম্পর্কে ঠিক করা হইল, যাহারা এই civil constitution মানিতে অস্বীকার করিবে তাহারা রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়, **দেশত্যাগী (Emigres)** রাজতান্ত্রিকদিগকে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে বলা হইল। এই আদেশ অমান্য করিলে তাহাদের সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করিবে এবং তাহাদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে বলিয়া ঘোষিত হইল।

জটিল সমস্যা

ষোড়শ লুই আইনসভার উপরোক্ত দুইটি আইনেই **"ভিটো" (Veto)** দিলে এক প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দেখা দিল। ২০শে জুন, ১৭৯২ সালে এক বিরাট জনতা লুই-এর **'টুইলারিস্' (Tuileries)** নামে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে।* ফ্রান্সের এই উত্তেজনা-পূর্ণ অবস্থায় অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার রাজগণের নির্দেশ মত প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব **ব্রান্সউইক** এক **ঘোষণা (Brunswick's Proclamation)** জারী করিয়া বলিলেন তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিয়া রাজাকে স্বক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ব্রান্সউইকের ঘোষণা ফ্রান্সে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। ১০ই আগস্ট, ১৭৯২ সালে প্যারিসের জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া রাজার সুইজারল্যাণ্ডবাসী দেহরক্ষীদের হত্যা করিলে রাজা ও রাণী আইনসভাগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। জনতা আইনসভাগৃহ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিধি-বর্গকে রাজতন্ত্র বাতিল করিতে বাধ্য করিল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত এক **'ন্যাশনাল কনভেনশন্' (National Convention)** বা জাতীয় আইনসভার হাতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার ভার দিতে রাজী করাইল। রাজপরিবারকে **টেম্পল (Temple)** নামক কারাগারে বন্দী করা হইল। এদিকে বিদেশী সৈন্য ফ্রান্সের শহরগুলি একের পর এক দখল করিয়া ভার্দুন নগরীতে প্রবেশ করিলে প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহভাজন কয়েক সহস্র রাজনৈতিক বন্দী দেশদ্রোহীকে হত্যা করে। ইহাকে **সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড (September Massacre)** বলা হয়। ব্রান্সউইক ঘোষণার ইহাই প্রত্যুত্তর।

ব্রান্সউইক ঘোষণা

জাতীয় আইনসভা

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

দেশের অভ্যন্তরে এরকম বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ফরাসী সৈন্যবাহিনী **ডাণ্টন (Danton)**

*"The invasion of the Tuileries marked the final breach between the king and the people"—*Hassal.*

নামক বিপ্লবী কম্যুনের নেতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া **ভালমি (Valmy)** নামক স্থানে বিদেশী সৈন্যবাহিনীকে বাধা দিতে সমর্থ হয়। ব্রান্সউইক সৈন্যবাহিনী সহ ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলে নূতন নির্বাচিত 'ন্যাশনাল কনভেনশন' (National Convention) রাজতন্ত্র অবসান হইয়াছে ঘোষণা করিয়া ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৯২)।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র

ন্যাশনাল কনভেনশন (National Convention) :

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করার পর ন্যাশনাল কনভেনশনের প্রধান দুটি সমস্যা হইল দেশদ্রোহীদের শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাজার বিচারের ব্যবস্থা করা হইল এবং জেকোবিনদলের অভিযোগে রাজাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ২১শে জানুয়ারী, ১৭৯৩ সালে ষোড়শ লুইকে **গিলোটিনে (Guillotine)** হত্যা করা হয়। ইহার পর কনভেনশন দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার নীতি গ্রহণ করে। **লা-ভেণ্ডি (La-vendee)** নামক স্থানে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কৃষকগণ নূতন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের অন্যান্য নগরগুলিতে যেমন **লিয়ঁ (Lyons), মার্সাই (Marseilles)** এবং **বোর্দে (Bordeaua)**-তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। আভ্যন্তরীণ এইরূপ বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ১৭৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, সার্ডিনিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসঙ্ঘ গঠন করে। ইহাকে প্রথম শক্তিসঙ্ঘ (First Coalition) বলা হয়। এই শক্তিসঙ্ঘ ফ্রান্সের রাজ্যসীমা আক্রমণ করে এবং ২১শে মার্চ, ১৭৯৩ সালে **নীরউইণ্ডেন (Neerwinden)-এর যুদ্ধে** ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে।

লুই-এর হত্যা

প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

প্রথম শক্তিসঙ্ঘ

ঘরে এবং বাহিরে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া জেকোবিন দলের নেতৃত্বে কনভেনশন একটি 'সন্ত্রাসের শাসন ব্যবস্থা' বা Reign of Terror স্থাপন করে। কেন্দ্রীয় শাসনভার একটি **জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety)**-র হাতে দেওয়া হয়। এই সমিতির সভ্য-

শাসন ব্যবস্থা

সংখ্যা ছিল ৯ জন, পরে বাড়াইয়া ১২ জন করা হয়। এই সমিতি **Committee of General Security** এবং **Deputies on Mission** নামে দুটি প্রতিষ্ঠানের মারফত জাতির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পন্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। **Deputies on Mission**-রা দেশের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের **Law of the Suspects** এবং **Law of the Maximum** নামক দুটি আইনের দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া বিপ্লবী বিচারালয় **(Revolutionary Tribunal)**-এর সম্মুখে স্থাপন করিতে পারিত। বিচারালয়ে দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীকে **গিলোটিন (Guillotine)**-এ প্রাণ দিতে হইত। রাজতন্ত্রের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তিকে এইরূপ সন্দেহ করিলেই **Guillotine**-এ তাহার শিরশ্ছেদ করা হইত। এই কঠোর শাসনব্যবস্থার দ্বারা কনভেনশন **লা-ভেণ্ডির** কৃষক-বিদ্রোহ এবং **লিয়ঁ (Lyons), মার্সাই (Marseilles) ও বোর্দো (Bordeaua)**-র বিদ্রোহ দমন করে। দেশের বাহিরে **Carnot**-এর অধীনে ফরাসী বাহিনী প্রথম শক্তিসঙ্ঘের আক্রমণকে ব্যর্থ করে। ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনী **হণ্ডসশ্যোটেন (Hondschoten)**-এর যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী **ভাটিগনেস (Wattigunes)**-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়। প্রাশিয়া ও স্পেন পরাজিত হইয়া **বাস্‌ল (Basle)-এর সন্ধি** স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়।

ইহার কার্যক্রম

"সন্ত্রাস শাসনব্যবস্থা" ২রা জুন, ১৭৯৩ সাল হইতে ২৮শে জুলাই, ১৭৯৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সন্ত্রাস শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের অবসান হইয়াছিল বলা যায়।

বিপ্লবের তাৎপর্য (Significance of the Revolution) :

ফরাসী বিপ্লব ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথমত, ইহা ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। তাহার পরিবর্তে **জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার** অধিকারী **('Sovereignty of the people)** এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব

দ্বিতীয়ত, ফরাসী বিপ্লব-সাম্যের আদর্শ ঘোষণা করে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং রাষ্ট্রের কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে সকলে সমান সুযোগের অধিকারী এই নীতি গৃহীত হয়।

সাম্য

তৃতীয়ত, বিপ্লব ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদর্শও ঘোষণা করে। **বুরবোঁ (Bourbon)** রাজবংশের শাসনকালে **('Lettres de Cachet')'**

নামক গ্রেপ্তারী পরওয়ানার দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইত। বাস্তিল দুর্গে এইরূপ নিরপরাধ ব্যক্তিদের রাখা হইত। ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ সালে বাস্তিল দুর্গ উন্মুক্ত করিয়া এই সকল বন্দীদের মুক্ত করা হয়।

ব্যক্তি ও সং· স্বাধী·

চতুর্থত ফরাসী বিপ্লব **জাতীয়তা (Nationalism)**-র আদর্শও ঘোষণা করে। জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতা ছিল ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালীন ফ্রান্সের অধিবাসীরা দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

জাতীয়তা

নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান (Advent of Napoleon) :

যে সকল ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাহস ও শক্তি দ্বারা ইতিহাসের গতি-পরিবর্তনে সক্ষম হইতে পারিয়াছেন, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাঁহাদের অন্যতম। কর্সিকা নামক দ্বীপের **এজাকসিও (Ajaccio)** নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় (১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯)। তাঁহার পিতার নাম চার্লস্ বোনাপার্টি এবং মাতার নাম লেটিজিয়া বোনাপার্টি। পর্বত পরিপূর্ণ কর্সিকা দ্বীপের প্রাকৃতিক প্রভাবে নেপোলিয়নের চরিত্রে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, অটল এবং শান্ত প্রকৃতি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র এবং ভূগোল প্রভৃতি বিষয়গুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করেন এবং রুশো, ভলটেয়ার ও মণ্টেস্কু প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে আনন্দ পাইতেন।

নেপোলিয়ন

বাল্যজীবন

শিক্ষা সমাপন করিয়া নেপোলিয়ন ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে **সামরিক কর্মচারীপদ** (Sub-Lieutenant) গ্রহণ করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি **টুঁলো (Toulon)** বন্দর হইতে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া ফ্রান্সের নিরাপত্তা

রক্ষা করিয়াছিলেন। ডাইরেক্টরীর অধীনে নেপোলিয়নকে ইটালি অভিযানে নিযুক্ত করা হয়। তিনি আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করেন এবং স্যাভয় (Savoy) ও নিস্ (Nice) দখল করেন। ইহার পর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়াকে পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত করেন, যেমন—লোডি (Lodi), আর্কোলা (Arcola) ও রিভোলি (Rivoli)। এই যুদ্ধগুলিতে জয়লাভের ফলে নেপোলিয়ন মিলান (Milan) এবং মেনটুয়া (Mantua) দখল করেন এবং অস্ট্রিয়াকে ক্যাম্পো-ফরমিও (Campo-Formio)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর নেপোলিয়ন পোপের রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলে পোপ টলেনটিনো (Tolentino)-এর সন্ধি দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করেন।

সামরিক অভিযান

সার্ডিনিয়া, অস্ট্রিয়া ও পোপের পরাজয়

এখন ফ্রান্সের কেবলমাত্র শত্রু রহিল ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্য নষ্ট করার জন্য নেপোলিয়ন মিশর দখল করিবেন স্থির করেন। তিনি এক নৌ-বহর সহ ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া মিশরে পৌঁছেন। তিনি পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু নীলনদের যুদ্ধে নেলসনের নিকট পরাজিত হন। এদিকে নেপোলিয়নের অনুপস্থিতিতে ইংলণ্ড রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সহযোগে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ স্থাপন করে। দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ ইটালী হইতে ফরাসী অধিকার বিলুপ্ত করিল। নেপোলিয়নের ইটালী অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ডাইরেক্টারদের কর্মপন্থা ফ্রান্সের জনসাধারণের মনঃপূত হয় নাই। এই সকল সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন সামান্য কয়েকজন সৈন্যসহ ইংরেজ নৌ-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া ফ্রান্সে পৌঁছেন। একমাত্র নেপোলিয়নই জাতিকে রক্ষা করিতে পারিবেন এই ধারণা ফ্রান্সের সর্বত্র নেপোলিয়নকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ডাইরেক্টরীর একজন সদস্য এ্যাবি সাইস্ (Abbe Sieyes)-এর সহায়তায় ডাইরেক্টরদের পদচ্যুত করিয়া কনসালেট (Consulate) নামে এক নূতন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন (১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ)।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান

দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ

কনসালেট

কনসালেট হইতে সাম্রাজ্য স্থাপন (From Consulate to Empire):

প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়নের প্রধান কাজ হইল দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ বিনাশ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করিয়া ইটালিতে প্রবেশ করেন (১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি ম্যারেংগো (Marengo)-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে

সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করিয়া ইটালিতে ফ্রান্স যে সকল স্থান হারাইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করেন। অপরদিকে ফরাসী সেনাপতি **মোরো** (Moreu) **হোহেনলিনডেন** (Hohenlinden)-**এর যুদ্ধে** জয়লাভ করিয়া ভিয়েনার প্রবেশপথে উপস্থিত হন। এই প্রকার পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়া **লুনেভিল** (Luneville)-**এর সন্ধি** স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়া ক্যাম্পোফরমিওর সন্ধির শর্তাদি পুনরায় স্বীকার করিয়া লয়। রাইন নদীর বামতীরস্থ অঞ্চলে এবং বেলজিয়ামের উপর ফরাসী আধিপত্য স্বীকৃত হয়। এদিকে কয়েক বৎসর যাবৎ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ড ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি স্থাপন করে। এই শান্তি-চুক্তিকে **এমিয়েন্স এর** (Amiens)-এর **সন্ধি** বলা হয়। ট্রিনিদাদ ও সিংহল ভিন্ন অপর যে সকল ফরাসী উপনিবেশ ইংলণ্ড এই কয়েক বৎসরের যুদ্ধে দখল করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দেন। অপর পক্ষে নেপোলিয়ন মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ করিলেন। এইভাবে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের অবসান ঘটে।

ইটালিতে জয়লাভ

অস্ট্রিয়ার বশ্যতা স্বীকার

বেলজিয়াম অধিকার

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ বিনাশ করিয়া নেপোলিয়ন অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাহার ফলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কনসাল পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে এক রাজতান্ত্রিক বিদ্রোহের সুযোগ লইয়া নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ফরাসী রাজমুকুট ধুলায় লুণ্ঠিত হইতেছিল, আমি উহা তরবারির সাহায্যে মাথায় উঠাইয়া লইয়াছি।"* তিনি সম্রাট পদের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য গণভোট গ্রহণ করেন। তখন অত্যধিক জনপ্রিয়তার দরুন নেপোলিয়ন গণভোটে বিপুলভাবে জয়ী হইলেন।

ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা

নেপোলিয়নের সংস্কার (Reforms of Nepoleon) ;

প্রথম কনসাল পদ লাভ হইতে সম্রাট পদ লাভ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কাজে হাত দেন।

প্রথমতঃ, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার। কনসালেটের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণ কর্তৃক সরকারী কর্মচারী নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করা হইল। উহার পরিবর্তে প্রথম কনসাল এবং পরে সম্রাট কর্তৃক মনোনয়ন ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইল। পূর্বেকার ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশে একজন

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

* "I found the crown of France lying on the ground, I picked it up with my sword."—*Napoleon.*

করিয়া **প্রিফেক্ট** নিযুক্ত করা হইল। বিচার বিভাগেও বিচারপতিগণ এখন হইতে প্রথম কনসাল এবং পরে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এইভাবে নেপোলিয়ন একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন।

নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল তাঁহার **আইন-বিধি (Code of Napoleon)**। এই আইন-বিধিতে আইনের চক্ষে ব্যক্তিমাত্রই সমান এই নীতি ঘোষিত হইল। এই আইন-বিধি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—দেওয়ানী আইন, ফৌজদারী আইন ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় আইন। নেপোলিয়নের আইন-বিধি ইওরোপের সম্মুখে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

নেপোলিয়নের আইন-বিধি

নেপোলিয়ন একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করেন। **লিসিস্** (Lycees) নামে এক প্রকার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলও স্থাপন করেন। দশটি আইনের স্কুল ও দুইটি ডাক্তারী শিক্ষা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। **পলিটেকনিক স্কুল** (Polytechnic School)-এর উন্নতি সাধন করেন। সর্বোপরি তিনি ফ্রান্সে একটি **বিশ্ববিদ্যালয়** স্থাপন করেন।

শিক্ষা সংস্কার

অর্থনৈতিক দুরবস্থাই পূর্বে রাজতন্ত্রের এবং ডাইরেক্টরীর পতনের মূলে লক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ন অর্থনৈতিক সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কর-প্রদান প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য এই আদর্শ নেপোলিয়ন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। যদিও কোন নূতন কর ধার্য হয় নাই তথাপি পুরাতন করগুলি যেন সম্পূর্ণভাবে আদায় হয় নেপোলিয়ন সেদিকে লক্ষ্য রাখিলেন। মিতব্যয়িতা এবং দুর্নীতি রোধ করা হইল। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার জন্য ১৮০০ খৃস্টাব্দে **Bank of France** স্থাপন করা হইল।

অর্থনৈতিক সংস্কার

সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিবার জন্য চার্চের প্রয়োজন এই মনে করিয়া নেপোলিয়ন পোপের সহিত পূর্বের বিরোধ মিটাইয়া লইলেন। ১৮০১ খৃস্টাব্দে **ধর্মমীমাংসা (Concordat)** দ্বারা স্থির হয় যে ফরাসী চার্চের উর্ধ্বতন যাজকগণ প্রথম কনসাল দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং পোপ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হইবে। নিম্নস্তরের যাজকগণকে বিশপগণ নিযুক্ত করিবেন কিন্তু এই নিয়োগ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে। যাজকগণ সরকার হইতে বেতন পাইবেন। এইভাবে নেপোলিয়ন পোপের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করিলেন।

ধর্মীয় সংস্কার

উপরে উল্লিখিত নানাবিধ সংস্কারের দ্বারা নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে এক ব্যাপক পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকার করেন নাই; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। জনগণকে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন অংশ দান করেন নাই। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে তাঁহার বহুবিধ সংস্কারের ফলে ফ্রান্সের বিপ্লবের মূল আদর্শগুলি সুদৃঢ় হইয়াছিল। তাঁহাকে এইজন্য **বিপ্লবের যোগ্য উত্তরাধিকারী** **"heir to the Revolution"** বলা হইয়াছে।

ত্রুটি

নেপোলিয়নের দেশজয় (Conquests of Nepoleon):

সম্রাট হইবার পর হইতে নেপোলিয়ন পুনরায় ইংলণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার শত্রুতার সম্মুখীন হইলেন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **পিটের** উদ্যোগে **তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ** **(Third coalition)** স্থাপিত হয়। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে **উলম্** **(Ulm)** নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন (২০শে অক্টোবর, ১৮০৫) কিন্তু পরদিনই ইংরেজ সেনাপতি **নেলসনের** তৎপরতায় **ট্রাফালগার** **(Trafalgar)**-এর নৌ-যুদ্ধে ফরাসী নৌ-বাহিনী পরাজিত হয় (২১শে **অক্টোবর**, ১৮০৫)। উলম্-এর জয়লাভের পর নেপোলিয় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হন অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সম্মিলিত বাহিনী নেপোলিয়নকে বাধা দিলে তিনি **অস্টারলিজ** **(Austerlibz)**-এর যুদ্ধে তাহাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮০৫)। অস্ট্রিয়া **প্রেসবার্গ** **(Pressburg)**-এর সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির শর্তানুসারে অস্ট্রিয়া ভেনিস, ইস্ট্রিয়া ও ডালম্যাশিয়া নেপোলিয়নকে দিতে বাধ্য হয় এবং নেপোলিয়নকে ইটালীর রাজা বলিয়া স্বীকার করে। ইহার পর নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে **জেনা** **(Jena)** এবং **অ্যারস্ট্যাডট** **(Auerstadt)**-এর যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন (১৪ই **অক্টোবর**, ১৮০৬)। কিছুদিন পর নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। ইহার পর নেপোলিয়ন **"কনফেডারেশন অব-দি-রাইন"** **(Confederation of the Rhine)** নামে জার্মান রাজগণের এক রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ইহাতে ফ্রান্সের সামরিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং **ফ্রাইডল্যাণ্ড** **(Friedland)**-এর যুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন (১৪ই জুন,

অস্ট্রিয়ার আত্মসমর্পণ

ট্রাফালগারের যুদ্ধ

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পরাজয়

প্রাশিয়ার পরাজয়

১৮০৭)। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার **টিলসিট** (**Tilsit**)-এর **সন্ধি** স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। **টিলজিটের সন্ধি সমগ্র মধ্য ইওরোপে** নেপোলিয়নের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং **তৃতীয় শক্তিশক্তকে** ভাঙ্গিয়া দেয়।

রাশিয়ার পরাজয়

নেপোলিয়নের পতন (Downfall of Napoleon):

এরপর নেপোলিয়ন নির্বান্ধব অবস্থায় ইংলণ্ডকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে ইংলণ্ড আক্রমণে সুবিধা হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি অর্থনৈতিক অস্ত্রে ইংলণ্ডকে আঘাত করিতে চাহিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইংরেজরা "**দোকানদারের জাতি**" (**Nation of shopkeepers**)। সেইজন্য অর্থনৈতিক চাপ দ্বারা ইংরেজদের বিব্রত করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, **বার্লিন ডিক্রী** (**Berlin Decree**) জারি করেন (২১শে নভেম্বর ১৮০৬)। এই ঘোষণার দ্বারা ইওরোপের কোন বন্দরে ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বার্লিন ডিক্রীর প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড "**অর্ডার্স-ইন-ক্যাউন্সিল**" (**Orders in Council**) পাস করিয়া ফ্রান্স এবং ইওরোপের সকল বন্দরে পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করে। ইহার উত্তরে নেপোলিয়ন **মিলান ডিক্রী** (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮০৭) দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে কোন দেশের কোন জাহাজ এমন কি নিরপেক্ষ দেশগুলির জাহাজ পর্যন্ত যদি ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সেগুলি ধৃত ও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ ইহা কার্যকরী করিতে যে বিশাল নৌবাহিনীর প্রয়োজন নেপোলিয়নের তাহা ছিল না। ইংলণ্ড হইতে কারখানাজাত জিনিসগুলি না পাওয়ার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইল। ইহাতে নেপোলিয়নের প্রতি প্রত্যেক দেশেরই তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল। **কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের পতনের কারণ বলিয়া মনে করা হয়।**

মহাদেশীয় ব্যবস্থা (Continental System)

বার্লিন ডিক্রী

মিলান ডিক্রী

পেনিনসুলার যুদ্ধ (The Peninsular War):

পেনিনসুলার যুদ্ধ নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। নেপোলিয়ন পরবর্তিকালে বলিয়াছিলেন, "স্পেনীয় ক্ষতই আমার পরাজয়ের কারণ।"* স্পেন এবং পোর্তুগাল এই দুইটি দেশ লইয়া **আইবেরিয়ান উপদ্বীপ** (**Ibarian Peninsula**)

* "It was the Spanish ulcer which ruin'd me"—*Napoleon.*

গঠিত। নেপোলিয়ন স্পেন এবং পোর্তুগালে কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়নের চাপে পোর্তুগাল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া লইতে বাধ্য হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজা জনকে বিতাড়িত করিয়া পোর্তুগাল দখল করিয়াছিলেন। স্পেনেও কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম কার্যকরী করিতে যাইয়া নেপোলিয়ন স্পেনের বুর্বঁ বংশের অবসান করিতে চাহিলেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনী **পিরেনিস** (Pyrennes) পর্বত অতিক্রম করিয়া স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে পৌছে। রাজা চতুর্থ চার্লস সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং নেপোলিয়ন তাঁহার পরিবর্তে নিজ ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করেন (৬ই জুন, ১৮০৮)। এইভাবে নিজ ভ্রাতাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তিনি স্পেনবাসীর আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তার উপর আঘাত করিয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্পেনের প্রদেশগুলি একের পর এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্পেনের দেশপ্রেমিকরা **প্রতিরোধীদল** (Juntas) গঠন করিয়া **গরিলা যুদ্ধ** (Guerilla War) শুরু করিল। তাহারা ফরাসী সেনাপতি **ডুপোঁ** (Dupont)-কে **বেলেন** (Baylen)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে (১৯শে জুলাই, ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ)। ইহার পর স্পেন ইংলণ্ডের সাহায্য চাহিলে **স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর** নেতৃত্বে ইংলণ্ডের এক সৈন্য-বাহিনী পোর্তুগাল এবং স্পেনকে সাহায্য করিবার জন্য পোর্তুগালে উপস্থিত হয়। স্যার আর্থার ওয়েলেসলী অনায়াসে পোর্তুগালে অবস্থিত ফরাসী সেনাপতি **জুনো** (Junot) ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন। জুনো পোর্তুগাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদিকে স্পেনের অধিবাসীরা ইংলণ্ডের পোর্তুগাল বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু করিলে যোসেফ বোনাপার্টি মাদ্রিদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর নেপোলিয়ন স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মাদ্রিদ দখল করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা যোসেফকে পুনরায় স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করেন (ডিসেম্বর, ১৮০৮)। কিন্তু স্যার আর্থার ওয়েলেসলীর নিকট পরাজিত হইয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনী পোর্তুগাল ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ওয়েলেসলী (পরবর্তিকালে তিনি ডিউক অব ওয়েলিংটন হইয়াছিলেন) স্পেনে মোতায়েন ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে **স্যালামেনকা** (Salamanca) এবং **ভিটোরিয়া** (Vittoria)-র যুদ্ধে পরাজিত করিলে নেপোলিয়নের পতন আসন্ন হয়।

পোর্তুগাল দখল

স্পেনে অধিপত্য বিস্তার

নেপোলিয়নের স্পেনে ও পোর্তুগালে পরাজয়

রুশ অভিযান (Russian Expedition):

একদিকে যেমন পোর্তুগাল এবং স্পেনে নেপোলিয়ন পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন

অন্যদিকে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ইওরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় রাশিয়ার কারখানাগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়িয়া চলে এবং বেকার সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এমতাবস্থায় জার **প্রথম আলেকজাণ্ডার** কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম মানিয়া চলিতে অস্বীকার করিলে নেপোলিয়ন এক বিরাট বাহিনী নিয়া রাশিয়া আক্রমণ করেন। আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল এবং পশ্চাদপসরণের কালে তাহারা নেপোলিয়নের সৈন্যদল ব্যবহার করিতে পারে এমন সব জিনিস নষ্ট করিয়া গেল। রুশ সেনাপতি **কুটুসফ** (Kutusoff) নেপোলিয়নকে বাধা দিতে গিয়া **বোরোডিনো** (Borodino) নামক স্থানে পরাজিত হইলেন (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮১২) কিন্তু নেপোলিয়নের প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন মস্কো দখল করিলেন সত্য, কিন্তু শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে মস্কো পরিত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। ফ্রান্স হইতে এতদূরে বেশীদিন কাটান তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন না।

রাশিয়ার সমস্যা

রুশ পশ্চাদপসরণ

মস্কোর পতন

রাশিয়া হইতে ফিরিবার পথে **কোসাক** (Cossack) গরিলা বাহিনী, শীতের প্রকোপ এবং অনাহারে নেপোলিয়নের হাজার হাজার সৈন্যবাহিনী পথিমধ্যে প্রাণ হারাইল। অবশিষ্ট মাত্র ২০ হাজার সৈন্য ফ্রান্সে পৌছিতে পারিল। **মস্কো অভিযানে ব্যর্থতা তাঁহার পতনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।**

চতুর্থ শক্তিসঙ্ঘ এবং লিপজিগের যুদ্ধ (Fourth Coalition and Battle of Leipzig):

মস্কো অভিযানের পর নেপোলিয়ন ইংলণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত **চতুর্থ শক্তিসঙ্ঘ** (Fourth Coalition)-এর সম্মুখীন হইলেন। উঁহাদের মিলিত আক্রমণে তিনি **লিপজিগ** (Leipzig)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (অক্টোবর, ১৮১৩)। এই যুদ্ধে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সৈন্য যোগদান করিয়াছিল বলিয়া ইহাকে **ইওরোপীয় জাতিপুঞ্জের যুদ্ধ** (Battle of the Nations)-ও বলা হয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। প্যারিস নগরী আক্রান্ত হইল এবং নেপোলিয়ন আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্যারিস নগর শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে নেপোলিয়ন পদত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসিত

নেপোলিয়নের পরাজয়

ফ্রান্সে বিদ্রোহ

হইতে বাধ্য হইলেন (৬ই এপ্রিল, ১৮১৪)। কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিগুলির বিবাদের সুযোগ নিয়া তিনি ১লা মার্চ, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ (Battle of Waterloo):

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের উপস্থিতিতে ভীত হইয়া ইওরোপীয় শক্তিগুলি বিভিন্ন দিক হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিল। নেপোলিয়ন বিদ্যুৎবেগে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং **লিঞ্জি (Lingy)** নামক স্থানে তিনি প্রাশিয়ান সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। অন্যদিকে নেপোলিয়নের সেনাপতি **নে (Ney) কোয়ার্টার ব্রাস (Quarter Bras)**-এর যুদ্ধে ইঙ্গ-বেলজিয়ান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন প্রাশিয়ান ও ইংরেজ বাহিনী যাহাতে একত্রিত না হইতে পারে সেদিকে তেমন মনযোগ না দিয়া মারাত্মক ভুল করেন। ফলে প্রাশিয়ার জেনারেল **ব্লুচার (Blucher)** ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সঙ্গে **ওয়াটারলুর (Waterloo)** প্রান্তরে মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন। ইহার ফলেই ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ন ইংরেজ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং **সেন্ট হেলেনা (St. Helena)** দ্বীপে তাঁহাকে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে ইংরেজ সরকারের নজরবন্দী থাকিয়া ১৮২১ খৃস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নেপোলিয়নের বাধা

নেপোলিয়নের পরাজয়

ইওরোপের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব (Impact of the Revolution on Europe):

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র ইওরোপের উপর পড়িয়াছিল বলা যায়। নেপোলিয়ন যে সকল দেশ অধিকার করিয়াছিলেন সে সকল দেশে তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি প্রচার করিয়াছিলেন। জার্মানি, ন্যাপলস্, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন এবং রাইন নদীর তীরবর্তী দেশগুলিতে তিনি আইনের চক্ষে সকলের সমতা, রাষ্ট্রের কাজে যোগদানে সকলের সমান সুযোগ এবং ধর্মসহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের আইন বিধি (Napoleonic code)-র নীতিগুলি এবং উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা ইওরোপের দেশগুলিতে অনুকরণ করা হইয়াছিল। ইটালির রাজ্য গঠন করিয়া এবং পোল্যাণ্ডের একাংশ লইয়া **গ্র্যাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো** গঠন করিয়া নেপোলিয়ন দু'টি দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিপ্লবের স্বাধীনতা এবং জাতীয়তার আদর্শও ইওরোপের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অনুশীলনী

1, **What were the main causes of the French Revolution ?**
(ফরাসী বিপ্লবের প্রধান প্রধান কারণগুলি কি ?)

উঃ 'ফরাসী বিপ্লবের কারণ' (পৃঃ ১২-১৫) দেখ।

2. **Who were the French philosophers whose writings helped in hastening the French Revolution ? Describe their viewpoints.**
(কোন্ কোন্ দার্শনিকের লেখা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল ? তাঁহাদের মতবাদগুলি সম্বন্ধে লিখ।)

উঃ "দার্শনিকদের প্রভাব" (পৃঃ ১২-১৩) দেখ।

3. **What were the achievements of the constituent and the legislative Assemblies ?**
(সংবিধান ও আইন সভা কি কি কাজ করিয়াছিল ?)

উঃ 'সংবিধান ও আইন সভা' (পৃঃ ১৬-১৯) দেখ।

4. **What led to the Reign of Terror in France and what were the means adopted to maintain it ?**
(সন্ত্রাস শাসন-ব্যবস্থার কারণ কি ? কিভাবে এই সন্ত্রাস ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইয়াছিল ?)

উঃ 'সন্ত্রাস শাসন-ব্যবস্থা' (পৃঃ ২০-২১) দেখ।

5. **What were the significance of the Revolution ?**
(বিপ্লবের তাৎপর্য কি ছিল ?)

উঃ "বিপ্লবের তাৎপর্য" (পৃঃ ২১) দেখ।

6. **Trace the advent of Napoleon. Discuss in details how he tried to consolidate his position by successive victories.**
(নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে লিখ। কেমন করিয়া তিনি পরপর যুদ্ধজয়ের দ্বারা আপনাকে রাজনৈতিক দিক দিয়া দৃঢ়ীকৃত করিয়াছিলেন তাহা লিখ।)

উঃ (পৃঃ ২২-২৪) দেখ।

7. **What are the far-reaching effects of Napoleon's reforms ?**
(নেপোলিয়নের সংস্কারগুলির কি কি সুদূরপ্রসারী ফলাফল হইয়াছিল ?)

উঃ "নেপোলিয়নের-সংস্কার" (পৃঃ ২৪-২৫) দেখ।

8. **Account for the main causes of the downfall of Napoleon.**
(নেপোলিয়নের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলি নির্দেশ কর।)

উঃ 'নেপোলিয়নের পতন' (পৃঃ ২৭-৩০) দেখ।

9. **What was Peninsular war ? What was its real effects on Napoleon's causes of action ?**
(পেনিনসুলার যুদ্ধ কি ? নেপোলিয়নের কার্যপ্রগতির উপরই যুদ্ধের কি সামগ্রিক প্রভাব পড়িয়াছিল ?)

উঃ 'পেনিনসুলার যুদ্ধ' (পৃঃ ২৭-২৮) দেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ইওরোপের পুনর্গঠন
Reconstruction of Europe

ভিয়েনা সম্মেলন (The Congress of Vienna):

নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের দেশগুলিকে পুনর্গঠন করিবার জন্য ইওরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে সমবেত হইলেন। সমস্যার জটিলতা অথবা সদস্যদের সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে এইরূপ রাজনৈতিক সম্মেলন পূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহাকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বৈঠকও বলা হয়। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী, প্রিন্স মেটারনিক সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। মেটারনিক ছাড়া সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রিয়ার সম্রাট **প্রথম ফ্রান্সিস্**, রাশিয়ার জার **প্রথম আলেকজাণ্ডার**, প্রাশিয়ার রাজা **তৃতীয় ফ্রেডারিক** এবং ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব **লর্ড ক্যাসালরি** (Lord Casalereagh)। একমাত্র তুরস্কের সুলতান এবং স্পেন ভিন্ন ইওরোপের সকল দেশের প্রতিনিধিগণই এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সকল প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। ফলে জাতীয়তাবাদ বা গণতন্ত্রের ন্যায় উদারনীতি তাহাদের গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাহারা নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনটি নীতি গ্রহণ করিলেন: (১) ন্যায্য—অধিকার (Legitimacy), (২) ভারসাম্য (Balance of Power), (৩) ক্ষতিপূরণ (Compensation)।

আন্তর্জাতিক বৈঠক

ত্রয়ী নীতি

ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগুলি (Principles of the Vienna Congress):

ন্যায্য-অধিকার নীতির প্রয়োগের দ্বারা তাহারা ফরাসি বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা ("Old Regime") ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। যে দেশ যে রাজবংশের অধীন ছিল সেই দেশ সেই রাজবংশের অধীনে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন এবং নেপলসে বুরবোঁ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবার, হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ পরিবার এবং জার্মানীতে নেপোলিয়ন কর্তৃক বিতাড়িত জার্মান শাসকদের পুনঃস্থাপিত করা হয়।

ন্যায় অধিকার

ভারসাম্য নীতি অনুসারে ফ্রান্সকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করা হয়। বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি রাষ্ট্র গঠন, রাইন সীমান্তে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি এবং ইটালিতে লম্বার্ডি-ভেনিশিয়াকে যুক্ত করিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন, ভারসাম্য নীতিরই পরিচয়।

ভারসাম্য

ক্ষতিপূরণ নীতি দ্বারা বিজয়ী রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের কার্যের পুরস্কার দেওয়া হইল। নেপলিয়নের পরাজয়ে ইংলণ্ডের প্রধান ভূমিকা ছিল বলিয়া ইংলণ্ডের ক্ষতিপূরণ সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। হেলিগোল্যাণ্ড, মাল্টা, আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ, ট্রিনিডাড, টোবাগো, মরিসস্, সিংহল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ইংলণ্ড লাভ করিল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ, ফিনল্যাণ্ড এবং বেসারাবিয়া লাভ করিল। প্রাশিয়া পাইল ডানজিগ, থর্ণ, পোজেন, স্যাক্সনির উত্তরাংশ, পশ্চিম-পোমারেনিয়া এবং রাইন প্রদেশগুলি। অস্ট্রিয়ার অংশে পড়িল লম্বার্ডি-ভেনেশিয়া, টাইরল এবং আড্রিয়াট্রিক সাগরের উপকূলে ইলিরিয়ান প্রদেশগুলি।

ক্ষতিপূরণ

ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্যাবলীর সমালোচনা (Criticism of the Vienna Congress) :

ভিয়েনা কংগ্রেসের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ইহা নামে মাত্র সম্মেলন ছিল। প্রকৃত পক্ষে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংলণ্ড এই চারিটি শক্তিই এক গোপন বৈঠকে সম্মেলনের কার্যসূচী স্থির করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা সম্মেলন গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল। ইটালীর উত্তরে লম্বার্ডি-ভেনিশিয়া অস্ট্রিয়াকে দিয়া, জার্মানীতে এক অসংবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া ও হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামকে যুক্ত করিয়া তাহারা জাতীয়তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল। যে সব রাজা ন্যায়-অধিকার নীতি অনুসারে সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন তাঁহারা গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৃতীয়ত, এই সম্মেলন অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিত্যক্ত ভারসাম্য (Balance of Power) নীতির উপর জোর দিয়া যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়াছিল। চতুর্থত, এই সম্মেলন ন্যায্য-অধিকার নীতিও সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করে নাই। জেনোয়া, ভেনিস এবং বেলজিয়াম

বিপক্ষে : গোপন বৈঠকে কার্যসূচী নির্ধারণ

জাতীয়তাবাদ উপেক্ষিত

স্বৈরাচারিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। এই সকল দেশের অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকনিরাপত্তা ও স্বার্থের খাতিরে অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত অবশেষে করা হইয়াছিল। ইহা বলা যায় যে, ভিয়েনা সম্মেলনে উপস্থিত রাজন্যবর্গ তাঁহাদের গতানুগতিক কূটনৈতিক জ্ঞান ও স্বার্থপরতার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইওরোপের জনসাধারণের মধ্যে যে নূতন ভাবধারা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

যুগধর্মের অস্বীকার

ন্যায্য-অধিকার নীতি অগ্রাহ্য

তথাপি ভিয়েনা সম্মেলনের সপক্ষে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথমত, ইহা জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করিয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনই আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত করিয়াছিল। এই সম্মেলন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পরস্পারের মধ্যে যে সকল চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল সেগুলি প্রতিনিধিগণের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তৃতীয়ত, পরবর্তী অন্তত চল্লিশ বৎসর ভিয়েনার প্রতিনিধিগণ ইওরোপের শান্তি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।* চল্লিশ বৎসর টিকিয়াছে এরকম আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নজির ইতিহাসে আর নাই বলিলেই চলে। অতএব সর্বশেষে David Thomson-এর কথায় বলা যায় যে, ইহা মোটামুটি একটি যুক্তিসম্মত দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা, কেবল জাতীয়তার শক্তিকে অস্বীকার করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল।†

কূটনীতি ও স্বার্থপরতার জয় পক্ষে : আন্তর্জাতিকতার সূত্রপাত

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থিরীকৃত

কিছুকালের জন্য শান্তি

"মেটারনিক-ব্যবস্থা" (Metternich System) :

ভিয়েনা সম্মেলনের পর অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী **মেটারনিক** কর্তৃক গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দমনের নীতিকেই **মেটারনিক-ব্যবস্থা** (Metternich System) বলা হয়। ১৮১৫ হইতে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ইওরোপে আন্তর্জাতিক পুলিশের ন্যায়

* "Vienna can at least claim to have inaugurated forty years of peace."

—Ketelby P. 147

† "It was on the whole a reasonable and statesmanlike arrangement, of which the chief defect was that it underestimated the dynamism of nationalism"—David Thomson. "Europe since Napoleon"—P. 75

কাজ করিয়াছিল। গণতন্ত্র বা জাতীয়তাবাদের প্রভাব অস্ট্রিয়ায় বিস্তৃত হইলে বিভিন্ন জাতি লইয়া গঠিত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবে এই আশঙ্কা অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মেটারনিকের নীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। কাজেই অস্ট্রিয়ার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এক প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

মেটারনিক

আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই মেটারনিক স্বৈরাচারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়াতে যাহাতে কোন প্রকার গণআন্দোলন না হইতে পারে সেজন্য তিনি কঠোরভাবে পুলিশী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রোধ করেন। জার্মানীতেও তিনি **কার্লসবাড আদেশসমূহ** (**Carlsbad Decrees**) দ্বারা সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়া দেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুপ্তচর রাখেন। **ট্রপো প্রোটোকোল** (**Troppau Protocal**)-এর দমন নীতির প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি ইটালীতে হ্যাপসবার্গ বংশীয় যে সব রাজা পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের মারফত গণআন্দোলন উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন। ভিয়েনা সম্মেলনের পর ইটালীর রাজ্যগুলিতে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই স্বৈরতান্ত্রিক রাজাদের মধ্যে যাহাতে ঐক্যভাব না গড়িয়া উঠিতে পারে সেজন্য মেটারনিক আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ লইয়া গুপ্ত পুলিশ সংস্থা মারফত সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং গুপ্ত সমিতি নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পুলিশী ব্যবস্থা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

কার্লসবাড আদেশ

ট্রপো প্রোটোকোল

আন্দোলন দমন

গুপ্ত সমিতি নিষিদ্ধ

এত চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু মেটারনিকের ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। যে বিপ্লব তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা ১৮৪৮-এ পুনরায় দেখা দেয়।

এই বিপ্লব তাঁহার ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। তিনি নিজে অস্ট্রিয়া হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান।

ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়; ইহার কার্যাবলী এবং ব্যর্থতার কারণ (The Concert of Europe ; its activities and causes of its failure) :

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলি যেন কার্যকরী হয় সেজন্য সম্মেলনে সমবেত রাজনীতিকগণ ইওরোপীয় **শক্তি সমবায়** (Concert of Europe) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই চুক্তিগুলিকে কার্যকরী করিবার জন্য আরও দু'টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; একটি হইল **'পবিত্র চুক্তি'** (Holy Alliance) ও অপরটি হইল **'চতুঃশক্তি চুক্তি'** (Quadruple Alliance)।

পবিত্র চুক্তি (Holly Alliance) : পবিত্র চুক্তিতে বলা হইল যে খ্রীষ্ট ধর্মের তিনটি মূল নীতি ন্যায়, দয়া ও শান্তির উপর ভিত্তি করিয়া ইওরোপীয় রাজগণ তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত করিবেন এবং একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় বিবেচনা করিবেন। জার আলেকজাণ্ডারের পরিকল্পিত 'পবিত্র চুক্তি' রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। ইহা অবাস্তব বলিয়া ইংলণ্ড স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করে। প্রকৃত পক্ষে পবিত্র চুক্তিকে একটি 'চুক্তি' না বলিয়া একটি 'ঘোষণা' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তাহার কারণ পবিত্র চুক্তিতে নির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা ছিল না। কতকগুলি অবাস্তব আদর্শপূর্ণ উচ্ছ্বাস এই চুক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল; ফলে ইহা বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

ইহার শর্ত

চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance) : পবিত্র চুক্তির অবাস্তবতার জন্য ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি রক্ষার জন্য অপর একটি চুক্তি ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। ইহা **'চতুঃশক্তি চুক্তি'** (Quadruple Alliance) **নামে** পরিচিত। এই চুক্তির ষষ্ঠ শর্তে বলা হয় যে চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিগণ পরস্পর সৌহার্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন এবং ইওরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহার সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছুকাল পর পর সম্মেলনে সমবেত হইবেন। চতুঃশক্তি চুক্তিকেই ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের প্রকৃত ভিত্তি বলা যায়।

ইহার শর্ত

চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর যথাক্রমে আইলা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইবাক্, ভেরোনায় চতুঃশক্তির বৈঠক বসে।

আইলা-স্যাপেলে প্রথম কংগ্রেস, ১৮১৮ (Congress of Ai-la-Chapelle, 1818) :

চতুঃশক্তি-চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণ ১৮১৮ খৃস্টাব্দে আইলা-স্যাপেল নামক স্থানে সমবেত হইলেন। ইহাই ইওরোপীয় কনসার্টের প্রথম সম্মেলন। এই কংগ্রেসে চতুঃশক্তি চুক্তির রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তার করে; ফলে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পরিচালনায় শক্তি-সমবায় ইওরোপের ভাগ্য-নিয়ন্তায় রূপান্তরিত হয়। সুইডেনরাজ **বার্ণাডোট** (Bernadotte)-এর কাছে কৈফিয়ত তলব করা হয় কেন তিনি নরওয়ে ও ডেনমার্কের সঙ্গে সন্ধির শর্তানুযায়ী আচরণ করেন না। **মোনাকো** (Monaco)-র রাজাকে ভালভাবে দেশ-শাসন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং হেসের ইলেক্টরকে রাজা উপাধি ধারণ করিতে বাধা দেওয়া হয়। এই সকল ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি একজোটে কাজ করিতে পারিয়াছিল।

ঐক্যের ক্রিয়া

কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণের ব্যাপারে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একমত হইলেও ইংলণ্ড এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে। ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগরে অপর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অধিপত্য একেবারেই পছন্দ করিত না। স্পেনের উপনিবেশসমূহে ইংলণ্ডের বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া সে এবিষয়ে কনসার্টের হস্তক্ষেপ পছন্দ করিল না। ইংলণ্ডের বিরোধিতার ফলে এগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। দাস ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড যখন সমুদ্রবাহী জাহাজ তল্লাস করিবার প্রস্তাব করিল তখন প্রত্যুত্তর স্বরূপ রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া তাহার বিরোধিতা করিয়াছিল; সুতরাং আইলা-স্যাপেল কংগ্রেসে কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য দেখা দিলেও উহার মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের বীজও রোপিত হয়; ফলে শক্তি-সমবায়ের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে।

পরস্পরবিরোধী স্বার্থ

ট্রপো'রে দ্বিতীয় কংগ্রেস, ১৮২০ (Congress of Troppau, 1820) :

১৮২০ খৃস্টাব্দে ট্রপো (Troppau) নামক স্থানে ইওরোপীয় শক্তি-সমবায়ের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ট্রপো'র কংগ্রেসে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ্য বিরোধিতায় পরিণত হয়। স্পেন, পিডমণ্ট ও নেপলসে গণঅভ্যুত্থানের ফলে এসব দেশের রাজারা উদারপন্থী শাসন প্রবর্তন করিতে বাধ্য হন। স্পেনের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাশিয়ার জার

বিরোধিতার প্রকাশ

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া রুশ সৈন্য পাঠাইতে চান। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স রুশ প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। এদিকে নেপলসের বিদ্রোহে মেটারনিক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে তাহা হইলে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব চলিয়া যাইতে পারে। এইজন্য মেটারনিক এবং কনসার্টের বিপ্লব-বিরোধী সদস্যরা এই সকল বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ট্রপো নামক স্থানে এক সম্মেলন ডাকেন।

এই কংগ্রেসে একটি ঘোষণাপত্র জারী করা হয়। ইহাকে **ট্রপো ঘোষণা পত্র (Troppau Protocal)** বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় রাজার স্বেচ্ছাকৃত দান ভিন্ন কোন সাংবিধানিক পরিবর্তন স্বীকার করা হইবে না। যদি কোন রাষ্ট্রে বিপ্লবের দ্বারা কোন শাসন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রটিকে ইওরোপের রাষ্ট্র সম্মেলনের সদস্যপদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে এবং কনসার্টের সদস্যরা ইচ্ছা করিলে এক জোটে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ দ্বারা পূর্বেকার শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইংলণ্ড এই ঘোষণাটিকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি পত্র বিবেচনা করিয়া বিরোধিতা করে। অতএব ট্রপোর কংগ্রেসে সদস্যবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ বিশেষভাবে দেখা দেয় বলিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য কংগ্রেসের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। ১৮২১ খৃস্টাব্দে লাইবাক নামক স্থানে মুলতুবী অধিবেশন বসিয়াছিল।

বাধ্যতামূলক সাংবিধানিক পরিবর্তন অগ্রাহ্য

কনসার্টের সদস্যরা

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

লাইবাকে তৃতীয় কংগ্রেস, ১৮২১ (3rd Congress of Laibach, 1821) ঃ

১৮২০ খৃস্টাব্দে ট্রপোতে যে পশ্চাদ্গামী নীতি উচ্চারণ করা হইয়াছিল ১৮২১ খৃস্টাব্দে লাইবাক অধিবেশনে তাহার পূর্ণোদ্যমে কার্যকারিতা দেখা দিয়াছিল। সে সময় ইটালীর নেপলসে যে ভীষণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য অস্ট্রিয়াকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। সে অতি সহজেই তথাকার বিদ্রোহীদের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা দমন করিতে পারিয়াছিল। অস্ট্রিয়ার শক্তিশালী সামরিক বাহিনী অতি সহজেই নেপলসের বিদ্রোহীদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছিল। উহা রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে পুনরায় তাঁহার হৃত সিংহাসনে বসাইয়া স্বৈরাচারী ক্ষমতা ব্যবহারে সাহায্য করিয়াছিল। দেশে ফিরিবার পথে অস্ট্রিয়ার সৈন্যেরা স্যাভয়রাজকে উত্তর ইটালীর পিডমণ্টের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

ভেরোনাতে চতুর্থ কংগ্রেস, ১৮২২ (Congress of Verona, 1822) :

ভেরোনার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় ছিল, স্পেনের বিপ্লব ও গ্রীক বিদ্রোহ। এই কংগ্রেস ফ্রান্সকে স্পেনের বিদ্রোহ দমনের ভার দিলে ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলি মাতৃভূমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কনসার্ট কর্তৃক স্পেনকে সাহায্য দানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিলেন যে ইংল্যাণ্ড এরূপ কাজে বাধা দিবে। ইহার পর ইংলণ্ড এককভাবে স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিল। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি **মনরো** বিখ্যাত **"মনরো নীতি"** ঘোষণা করায় ইংলণ্ডের সুবিধা হইয়াছিল। এই নীতিতে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোন মতেই সহ্য করিবে না। গ্রীক বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই কংগ্রেসে কোন সিদ্ধান্ত লওয়া সম্ভব হয় নাই। রাশিয়া গ্রীসে তুরস্কের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়ার বিরোধিতার জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই।

ইংলণ্ডের বিরোধিতা

মনরো নীতি

ভেরোনা কংগ্রেসেই শক্তি-সমবায় (Concert)-এর কার্যত অবসান হইয়াছে বলা যায়। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার সেণ্টপিটার্সবার্গে তুরস্ক ও গ্রীসের সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি সভা ডাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড এগুলি বর্জন করে। অপর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যেও মতানৈক্যের জন্য এই সভাগুলি ব্যর্থ হয়। ফলে ইওরোপীয় কনসার্টের মাধ্যমে রাজনীতিক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শক্তি-সমবায়ের ব্যর্থতা

শক্তি-সমবায়ের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Concert) : বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই শক্তি-সমবায়ই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু ইহা স্থায়ী না হইবার কারণ প্রথমত, ইহা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির প্রতিষ্ঠান। ইংলণ্ড ভিন্ন রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ছিল স্বৈরাচারী রাষ্ট্র। ইওরোপের জনসাধারণের মনে এইরূপ শক্তি-সমবায়ের প্রতি ঘৃণা হওয়া ছিল স্বাভাবিক।

প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান

দ্বিতীয়ত, সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের বিভিন্নতা তাহাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি

করিয়াছিল। বিপ্লবের বিরোধিতা এবং গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন ব্যতীত ইহাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল তিনটি রাষ্ট্র সঙ্কীর্ণ জোটে পরিণত হয়।

স্বার্থ প্রণোদিত অনৈক্য ও সঙ্কীর্ণ জোট

তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের বিরোধিতা এই শক্তি-সমবায়ের পতনের অন্যতম কারণ। অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নীতি ইংলণ্ড সমর্থন করে নাই এবং ট্রপোর ঘোষণার বিরোধিতা করে। ভেরোনা কংগ্রেসে ইংলণ্ডের মতামত গৃহীত না হওয়ায় ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং শক্তি-সমবায়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। ইংলণ্ডের এই সম্পর্ক ছেদ শক্তি সমবায়কে দুর্বল করিয়া ইহার পতন অনিবার্য করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডের বিরোধিতা

মনরো নীতি

'মনরো নীতি'র মাধ্যমে ব্যক্ত আমেরিকার মনোভাবও এই শক্তি-সমবায়ের মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

1. What was Vienna Congress ? What principles were formed at the Congress ? Attempt a critical review of the same.
   (ভিয়েনা কংগ্রেস বলিতে কি বোঝ? এই কংগ্রেসে কি কি নীতি গৃহীত হইয়াছিল? ঐগুলির সমালোচনা কর।)

উঃ ৩২ পৃঃ হইতে ৩৩ পৃঃ দেখ।

2. What do you mean by Metternich System ? Describe how it was saught to be worked-out.
   (মেটারনিক ব্যবস্থা কি? কেমন করিয়া উহাকে কার্যকরী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।)
   উঃ ৩৪ পৃঃ হইতে ৩৫ পৃঃ দেখ।

3. What was Holy Alliance ? What was Quadernple Allince ?
   (পবিত্র চুক্তি কি? চতুঃশক্তি চুক্তি বলিতে কি বুঝায়?)
   উঃ ৩৬ পৃঃ দেখ।

4. Why did the Concert of Europe fail ? Examine in this context the role played by England.
   (শক্তি-সমবায় কেন অকৃতকার্য হইয়াছিল? এই সম্পর্কে ইংলণ্ড কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল?)

উঃ ৩৯ পৃঃ হইতে ৪০ পৃঃ দেখ।

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

জুলাই বিপ্লবের কারণ এবং ফলাফল
(July Revolution, Causes and Consequences)

নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর মিত্ররাষ্ট্রগুলি বুরবঁ বংশের **অষ্টাদশ লুইকে** ফ্রান্সের সিংহাসনে বসায় কিন্তু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পুনঃস্থাপন ফরাসীজাতির মনঃপূত হয় নাই। অষ্টাদশ লুই একটি শাসনতান্ত্রিক সনদ দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই সনদে তিনি সাম্য, সরকারী পদ লাভের সমান অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নির্বাচনমূলক আইনসভা প্রভৃতি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শগুলি স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উগ্র রাজতান্ত্রিকগণ বা বামপন্থীরা কেহই তাঁহার শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে নাই। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে **অষ্টাদশ লুই**-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা উগ্র রাজতান্ত্রিক দলের নেতা **দশম চার্লস** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রাক্‌বিপ্লব যুগের ফ্রান্সকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি অভিজাত এবং যাজকদের যে সকল অস্বাভাবিক অধিকারগুলি ছিল তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; ফলে তাঁহার শাসনে ফ্রান্সের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে **দশম চার্লস** প্রতিক্রিয়াশীল **পলিগন্যাককে (Polignac)** প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। **আইনসভা (Chamber of Deputies)** তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিলে চার্লস আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি চারিটি বিশেষ ঘোষণা বা অর্ডিনান্স জারী করিলেন: (১) সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ, (২) আইনসভা ভঙ্গ, (৩) ভোটারদের সংখ্যা হ্রাস এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে নূতন ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং (৪) নূতন ভোটার তালিকা অনুযায়ী নূতন আইনসভা নির্বাচনের আদেশ।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

চার্লসের বিশেষ ঘোষণা

এইসকল অর্ডিনান্স জারীর ফলে চার্লসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ দেখা দেয়। থিয়ার্সের নেতৃত্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকরা তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং চার্লসের সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করে। প্যারিসের জনসাধারণ মন্ত্রিসভা নিপাত যাক, সনদ দীর্ঘজীবী হউক ইত্যাদি ধ্বনি দ্বারা প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখরিত করে; ফলে ২৮শে জুলাই প্যারিসে অন্তর্যুদ্ধ শুরু হয়। এই অন্তর্যুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী ছিল। প্রাক্তন

গণ বিক্ষোভ

সৈনিকরা, প্রজাতন্ত্রিগণ, শ্রমিকশ্রেণী ও ছাত্রদল এই জুলাই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমাবদ্ধ ছিল। চার্লসের সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে রাজী না হওয়ায় চার্লস দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। **আইনসভা (Chamber of Deputies)**-র সদস্যরা অর্লিয়েন্স বংশের **লুই ফিলিপ্পিকে** সিংহাসনে বসাইল। ইনি বুর্বঁ বংশের হইলেও ফরাসী বিপ্লবে বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

চার্লসের দেশত্যাগ

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল : ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে এবং ইওরোপের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। প্রথমত, জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেও ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লব ইংলণ্ডের ১৬৮৮ সালের **গৌরবময় বিপ্লবের** ন্যায় ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থায় রাজার **ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা নীতি (Divine Right of Kingship)** চিরতরে লুপ্ত করিল। রাজার ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা নীতির স্থলে জনসাধারণের সার্বভৌম ভগবানপ্রদত্ত এই নীতি গৃহীত হইল।*

রাজার ভগবানপ্রদত্ত ক্ষমতা নীতির লোপ

দ্বিতীয়ত এই বিপ্লবের ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত 'সাম্য-অধিকার' নীতি ফ্রান্স কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল।

ন্যায্য অধিকার নীতি পরিত্যাগ

তৃতীয়ত, রাজতন্ত্রের অবসান না হইলেও গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা হইল। জরুরী পরিস্থিতিতে রাজার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লোপ করা হইল। সর্বপ্রকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আইনসভার হাতে ন্যস্ত করা হইল। ইহা ছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকার করা হইল। উগ্র-রাজতান্ত্রিক ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং প্রাক্-বিপ্লবযুগের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হইল। সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা —এই গণতান্ত্রিক নীতিগুলি স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই, জুলাই বিপ্লবকে ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের পরিপূরক বলা যায়।**

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা

গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিষ্ঠা

* "The Divine Right of the Nation was henceforth substituted for the divine right of Kings." —*Lipson* P. 17

** "In short, the Revolution of 1830 was the complement of the Revolution of 1789; for the future, the achievements of the revolutionary spirit—the principles of equality, secularism constitutional liberty—rested on secure foundations" —*Lipson*, P. 18.

ইওরোপে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ঃ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইওরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকামীরা পুনরায় জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের আন্দোলন শুরু করিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতা

ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের পরই অক্টোবর মাসে বেলজিয়ামে বিপ্লব শুরু হয়। বেলজিয়ামবাসীরা ভিয়েনা সম্মেলনের অন্যায়মূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং হল্যাণ্ডের অধিকার হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বিদ্রোহ হয়। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড বেলজিয়ামবাসীদের সমর্থন করিয়াছিল। অবশেষে ১৮৩১ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

পোলণ্ড

রাশিয়ার শাসনাধীন পোলাণ্ডের অধিবাসিগণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তাহারা বেলজিয়ামবাসীদের মত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের কোন সাহায্য করে নাই; অনুরূপভাবে প্রাশিয়া বা অস্ট্রিয়াও তাহাদের কোন সাহায্য করে নাই; ফলে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কঠোর হস্তে পোল্যাণ্ডের আন্দোলন দমন করেন।

ইতালি

ইতালির পার্মা, মোডেনা, পোপের রাজ্যে গণ আন্দোলন দেখা দিলে মেটারনিক তাহা কঠোর হস্তে দমন করেন।

জার্মানী

জার্মানীর হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ব্রান্সউইক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া শাসকদের নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিতে বাধ্য করে। এসকল গণঅভ্যুত্থানে মেটারনিক ভীত হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৩২ খৃস্টাব্দে জার্মান কনফেডারেশনের এক অধিবেশন ডাকিলেন এবং ফেডারেল ডায়েটকে বিপ্লব বিরোধী প্রস্তাব পাস করিতে বাধ্য করিলেন। যে সব শাসকরা নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা এই সুযোগে নূতন শাসনতন্ত্র বাতিল করিলেন। ফলে জার্মানীর গণআন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

মোটামুটি ফলের দিক হইতে বিবেচনা করিলে জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে প্রত্যক্ষ সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিল। জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি স্থানে এই বিপ্লবের প্রভাবে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এমনকি ফ্রান্সেও জুলাই বিপ্লব কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই ক্ষমতা দান করিয়াছিল।

প্রজাতান্ত্রিকগণ (Republicans), নেপোলিয়নের সমর্থকরা (Bonapartists) এবং সমাজতান্ত্রিকদল (Socialists) এই বিপ্লবের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হয় নাই। ফলে ১৮৪৮ সালে পুনরায় বিপ্লব হইয়াছিল। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে, এই জুলাই বিপ্লব ভগবানদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী স্বৈরাচারী শাসনের অবসান করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং সাম্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা

জুলাই রাজতন্ত্র ও ফেব্রুয়ারী বিপ্লব (July Monarchy and February Revolution) ঃ ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের ফলে অরলিয়েন্স বংশীয় **লুই ফিলিপ** ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। জুলাই মাসে তিনি সিংহাসনে বসেন বলিয়া তাঁর শাসনকালকে **জুলাই রাজতন্ত্র** (**July Monarchy**) বলা হয়। লুই ফিলিপ বলিয়াছিলেন তিনি ভগবানের অনুগ্রহ ও জাতির ইচ্ছানুসারে ফরাসী জাতির রাজা হইয়াছেন। * বিপ্লবের মূলনীতিগুলির প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন এবং বুরবোঁ বংশের জাতীয় পতাকা পরিত্যাগ করিয়া বিপ্লবযুগের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পুনরায় গ্রহণ করেন। লুই ফিলিপ ভালভাবেই জানিতেন তাঁহার সিংহাসন লাভ বংশগত কোন নীতির ভিত্তিতে হয় নাই। জনসাধারণের সমর্থনের উপরেই তাঁহার শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সেজন্য সুচতুর লুই ফিলিপ নিজেকে **নাগরিক রাজা** বা **Citizen King** বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু লুই ফিলিপের বাহ্যিক উদারতার পিছনে এক স্বৈরাচারী মন ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদাই উদগ্রীব হইয়া ছিল।

লুই ফিলিপের কার্য পদ্ধতি

যে **আইনসভা** (**Chamber of Deputies**) লুই ফিলিপকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল তাহাই অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চার্টারের কিছু পরিবর্তন আনিয়াছিল। ভোটদানের বয়সগত ও ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমাইয়া দিয়া ভোটারের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল কিন্তু ইহা স্পষ্ট ছিল যে আইন সভার সমর্থনের উপরই লুই ফিলিপের শাসন নির্ভর করিত। আইনসভায় **মধ্যবিত্ত** (**bourgeoisie**)-দেরই আধিপত্য ছিল। কোন গণভোট না নেওয়ার জন্য এই রাজতন্ত্রের পিছনে গণসমর্থন ছিল না। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ

***"King by the grace of God and will of the nation."**

—*Louis Philippe.*

বংশের ন্যায্যাধিকার স্বত্বের উপরও ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ফলে সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের শাসনকালে লুই ফিলিপ কোন শক্তিশালী দলের সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। **ন্যায্যাধিকার নীতিতে বিশ্বাসীদল** (**legitimists**) দশম চার্লসের বংশধরকে সিংহাসন দানের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং লুই ফিলিপের প্রতি তাহাদের কোন সমর্থন ছিল না। প্রজাতান্ত্রিকরা প্রথমে লুই ফিলিপের সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে লুই ফিলিপের শাসনকালে ফরাসী জাতির উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ক্রমেই তাহারা দেখিতে পাইল যে লুই ফিলিপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া এক মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতেছেন; ফলে প্রজাতান্ত্রিকগণ লুই ফিলিপের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য সক্রিয় হইয়াছিল। সমাজতন্ত্রীরা **লুই ব্লাঙ্ক** (**Louis Blanc**) ও সেণ্ট সাইমন (**Saint Simon**)-এর নেতৃত্বে লুই ফিলিপের মধ্যবিত্তের স্বার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থার চরম বিরোধী ছিল। বোনাপার্টিস্ট দলও লুই ফিলিপের পররাষ্ট্রনীতিকে দুর্বল ও দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর মনে করিয়া তাহার পতনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে বিপক্ষতা

তাঁহার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি কিরূপ দুর্বল ছিল। রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিবার জন্য লুই ফিলিপ কোন গৌরবোজ্জ্বল বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন নাই। তিনি একটি শান্তিপূর্ণ উত্তেজনাহীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। নেপোলিয়নের সময়ের বৈদেশিক নীতির তুলনায় তাঁহার বৈদেশিক নীতিকে জনসাধারণ জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লুই ফিলিপের শাসনে ফরাসী জাতির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু বিরোধী দলগুলি লুই ফিলিপের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। ১৮৩২ সালে মূল বুরবোঁ পরিবারের সমর্থনে **লাভেণ্ডি** (**La Vendee**) ও **প্রভেন্স** (**Provence**) নামক স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। **স্ট্রাসবার্গ** ও **বোলন** নামক দুটি স্থানে ১৮৩৬ ও ১৮৪০ সালে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই বোনাপার্টির সমর্থকরা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৩১ ও ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে শ্রমিকরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনসাধারণের অসন্তোষ যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল লুই ফিলিপের শাসন ততই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। আইন সভার

মন্ত্রিসভার দ্রুত পতন

উত্তেজনাহীন বৈদেশিক নীতি

জাতীয় বিক্ষোভ

অধিকাংশ সভ্য ছিলেন **গিজো** (**Guizot**) নামক নেতার সমর্থক। কিন্তু ক্রমে আইনসভায় **থিয়ার্স** (**Thiers**) নামক নেতার অধীনে এক সংস্কারপন্থী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা ভোটদানের ক্ষমতার প্রসার দাবি করিয়াছিলেন। তাহাদের দাবি লুই ফিলিপ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ক্রমে থিয়ার্স দলের প্রচারের

সংস্কার দাবি

ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র সংস্কারের দাবি করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের আন্দোলন দমন করিবার জন্য গিজো সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করার জন্য **সংস্কার ভোটসভা** (**reform banquets**) ডাকিলেন। এইসব সভায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা হইত। গিজো সরকার ভীত হইয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং এই প্রকার সভা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা ভীত না হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী এক বিরাট সংস্কার ভোট সভার আয়োজন করে। গিজো সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জনসাধারণ দলে দলে এই সভায় যোগদান করে। রাস্তায় রাস্তায় **অবরোধ প্রাচীর** (**barricades**) তৈয়ারী করা হয়। সরকার ইহাদের বিরুদ্ধে **'জাতীয় বাহিনী'** প্রেরণ করিলেন কিন্তু তাহারা আন্দোলনকারীদের পক্ষ অবলম্বন করিল। লুই ফিলিপ ভীত হইয়া গিজোকে পদচ্যুত করিলেন কিন্তু ইহাতে কোন কাজ হইল না। প্রজাতান্ত্রিকরা প্যারিসের জনতাকে লুই ফিলিপের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ইহার ফলে গিজোর বাড়ীর সম্মুখে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা উপস্থিত হইয়া বিক্ষোভ দেখাইলে গিজোর গৃহরক্ষীদল গুলি

লুই ফিলিপের পতন

বর্ষণ করে। ফলে জনতার কয়েকজন হতাহত হয়। ইহার ফলে প্যারিসের সর্বত্র বিপ্লব দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। লুই ফিলিপ বাধ্য হইয়া নিজের পৌত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইভাবে জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান হইয়া ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ (Greek War of Independence)ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে **তুরস্ক সাম্রাজ্য** (**Ottoman Empire**) এর দুর্বলতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তুরস্ক সুলতানের অধীন অধিকাংশ প্রজা খৃস্টান; ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য কোন প্রকার স্বাভাবিক আনুগত্যের বন্ধন বা কৃষ্টিমূলক সংহতি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা, ভাষা ও আচারগত পার্থক্য, ধর্মনৈতিক বিভেদ দিনদিনই তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল

করিতেছিল। এই কারণে এই সময় তুরস্ককে ইউরোপের **'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি'** **(Sickman of Europe)** বলা হইত।

তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে **দ্বিতীয় ক্যাথারিনের** আমল হইতে রাশিয়া কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে বিস্তারনীতি গ্রহণ করে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া রাজধানী কনস্টানটিনোপল দখল করা এবং বস্‌ফোরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করা।

রাশিয়ার বিস্তার নীতি

তুরস্কের দুর্বলতা ও রাশিয়ার বিস্তার নীতি নিকট প্রাচ্যের সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বারবার বাধাদান করে।

প্রাচ্য সমস্যা

তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তুরস্কের অধীন বলকান দেশগুলি স্বাধীন হইতে সচেষ্ট হইলে রাশিয়া ঐ সকল দেশগুলিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। বলকান অঞ্চলের ঐ সকল দেশগুলির মধ্যে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রীসে এক নবজাগরণের সূচনা হয়। এই নবজাগরণের সূচনা করেন গ্রীক মনীষি **কোরায়েস (Koraes)**। ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্যের এক পুনরুজ্জীবন গ্রীসে আরম্ভ হয় এবং প্রাচীন গৌরবে গ্রীসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক আগ্রহ গ্রীকদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

বলকান অঞ্চলের স্বাধীনতা প্রয়াস

গ্রীসের প্রচেষ্টা

হিটারিয়া ফিলিকি (Hetairia Philike) নামে এক গোপন সমিতি ১৮১৪ হইতে ১৮২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীসের সর্বত্র স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে। **আলেকজাণ্ডার ইপ্‌সিলান্টি (Alexander Ypsilanti)**-র নেতৃত্বে **ওয়ালেচিয়া (Wallachia)** এবং **মোলডাভিয়া (Moldavia)** নামক দু'টি জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইপসিলান্টি রাশিয়ার সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলেন কিন্তু মেটারনিকের বিরোধিতায় কোন সাহায্য পাইলেন না। ফলে ওয়ালেচিয়া এবং মোলডাভিয়ার বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে **মোরিয়া (Morea)** নামক গ্রীক দ্বীপে এক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ ক্রমে এক বিরাট স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সমস্ত দক্ষিণ গ্রীসের দেশগুলিতে বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তর গ্রীসে **থেসালি** এবং **ম্যাসিডোনিয়াতেও** বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অসংখ্য মুসলমান এই বিদ্রোহে নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ তুরস্কের সুলতান কনস্টানটিনোপলের চার্চের অধিকর্তা **পেট্রিয়ার্ক (Patriarch)**-কে হত্যা

সুলতানের প্রতিশোধ

করেন। খৃস্টান প্রজাদের উপরও প্রচুর অত্যাচার করা হয়। দীর্ঘ চারি বৎসর (১৮২১-২৪ খৃস্টাব্দ) গ্রীকরা এই স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাইয়া যায়। কিন্তু ১৮২৪ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান গ্রীকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্য মিশর প্রদেশের শাসনকর্তা মহম্মদ আলীর সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ১৮২৪ হইতে ১৮২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মহম্মদ আলীর সৈন্যদল গ্রীকদের পরাজিত করিয়া অধিকৃত অঞ্চলে সন্ত্রাস-মূলক শাসন শুরু করিয়াছিল। হাজার হাজার গ্রীক প্রত্যহ নিহত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জনসাধারণ গ্রীকদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরেজ কবি বায়রন গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মনোযোগ গ্রীসদেশের উপর পড়ে। রাশিয়া অত্যাচারিত গ্রীকদের সাহায্যার্থে যুদ্ধে যোগদান করিবে স্থির করিল। বলকান দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া এক বিস্তৃত স্লাভ সাম্রাজ্য গঠনের ইচ্ছা রাশিয়ার ছিল। মহম্মদ আলীর অত্যাচার ও পেট্রিয়ার্ককে হত্যায় রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। কিন্তু এককভাবে রাশিয়া যাহাতে গ্রীসের উপর আধিপত্য স্থাপন না করিতে পারে সেজন্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যানিং রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে তুরস্ককে যুদ্ধ বিরতির জন্য চাপ দেওয়া স্থির করিলেন। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া গ্রীসে অবিলম্বে সায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য তুর্কী সুলতানকে অনুরোধ জানায়। তুর্কী সুলতান এই অনুরোধ গ্রাহ্য করেন নাই; ফলে ১৮২৭ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে লণ্ডনের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া গ্রীসের সঙ্গে অবিলম্বে শান্তি স্থাপনের কথাবার্তা বলিতে তুরস্কের সুলতানকে নির্দেশ দেয় এবং তুরস্কের সুলতান এই নির্দেশ না মানিলে সামরিক শক্তির সাহায্যে বাধ্য করা হইবে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হয়। তুরস্কের সুলতান এই তিনটি শক্তির নির্দেশ অগ্রাহ্য করিলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্মিলিত নৌবাহিনী **ন্যাভারিনো (Navarino)**-এর জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের নৌবাহিনী ধ্বংস করে (১৮২৭ খৃস্টাব্দ)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পরও তুরস্কের সুলতান গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অবসান করিতে রাজী হইলেন না। ফলে রাশিয়া এককভাবে পর-বৎসর (১৮২৮ খৃস্টাব্দে) তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তুরস্ককে পরাজিত করে। তুরস্ক **আড্রিয়ানোপল (Adrianople)**-এর **সন্ধি** (১৮২৯ খৃস্টাব্দ) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী, প্রথমত, বসফোরাস ও দার্দানেলিজ প্রণালীতে অবাধ

মহম্মদ আলীর সন্ত্রাস

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দৃষ্টি

ইংলণ্ড ও রাশিয়ার যৌথ প্রচেষ্টা

লণ্ডন চুক্তি

রাশিয়ার একক অভিযান

ব্যবহারের অধিকার রাশিয়াকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে **বেভেরিয়ার রাজকুমার অটো** গ্রীসের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভিয়েনা কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করিয়াছিল সেই জাতীয়তাবাদের সাফল্য গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম দ্বারা সূচিত হইয়াছিল।

রাশিয়া (১৮১৫-১৮৫৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়া (Russia at the beginning of the Nineteenth Century) : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়া ছিল একটি অনুন্নত দেশ।* রাশিয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়।

রাশিয়ার তদানীন্তন সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—জমিদার শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী। কৃষক সম্প্রদায় ভূমিদাস হিসাবে জমিদারগণের জমি চাষ করিতে বাধ্য ছিল। জমিদারগণের অর্থশোষণ এবং বেগার খাটানোর ফলে ভূমিদাসদিগের দুর্দশার সীমা ছিল না। জমিদারগণ ভূমিদাসদিগকে গরু ভেড়ার ন্যায় বিক্রয় করিতেও পারিতেন। **জার (Tsar)**-এর জমিতে যে সকল ভূমিদাস বাস করিত তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। তাহারা 'মির' নামক গ্রাম্য সমিতি গঠন করিয়া নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করিত। কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং তাহাদের নানাপ্রকার কর দিতে হইত। তাহাদের উপর অনেক সময় শারীরিক নির্যাতন করা হইত। এমন কি শাস্তিস্বরূপ সাইবেরিয়ার নির্জন প্রান্তেও নির্বাসিত করা হইত।

দেশের সামাজিক অবস্থা

রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি সর্বত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকীয় কর্মচারীর পদগুলি তখন নিলামে বিক্রয় করা হইত। যে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিত তাহাকেই বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করা হইত। কর্মচারিগণ উৎকোচও গ্রহণ করিত। মধ্যবিত্তশ্রেণী বলিয়া রাশিয়ায় কিছু ছিল না, কিন্তু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব দেখা গিয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায় সরকারী কর্মচারীদের

* "Russia is the last born child of European civilisation",

ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা জন্মাইয়াছিল। গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া তাহারা বৈপ্লবিক প্রচারকার্য চালাইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে **"Union of Public Good"** নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি পরে দু'টি অংশে ভাগ হইয়া যায়, **উত্তর অংশের সমিতি** (**Society of the North**) এবং **দক্ষিণ অংশের সমিতি** (**Society of the South**)। উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এই সকল সমিতি আন্দোলন চালাইয়াছিল, কিন্তু **জার** (**Tsar**)-দের স্বৈরাচারী শাসনে আন্দোলন বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

আন্দোলন

জার প্রথম আলেকজাণ্ডার, ১৮০১-২৫ (Tsar Alexander I) :

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন **প্রথম আলেকজাণ্ডার**। তিনি বাল্যকালে **লা হার্পি** (**La Harpe**) নামে একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করেন। লা হার্পির প্রভাবে তিনি উদার নীতিতে বিশ্বাসী হন। ফলে ১৮২০ সাল পর্যন্ত তিনি আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে উদার নীতি গ্রহণ করেন কিন্তু মেটারনিকের প্রভাবে ১৮২০-২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেন।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি দমন করিয়া শাসনকার্যে দক্ষতা আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি এত বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে এ বিষয়ে তিনি সামান্যই সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। রাশিয়ার অগণিত ভূমিদাসদের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন কিন্তু **ভূমিদাস প্রথা** এত জটিল ছিল যে, তিনি ইহাদের দুর্গতির অবসান করিবার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তথাপি ভূমিদাস প্রথা তুলিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এই মনোভাব তিনি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন। তিনি হাসপাতাল, পরিবহণ ব্যবস্থা, জেলখানা ও কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য তিনি প্রতি জেলায় সরকারী শস্যভাণ্ডার গড়িয়া তোলার আদেশ দেন। রাশিয়া যাহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্যও তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

জারের শুভেচ্ছা

কার্যকর ব্যবস্থা

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জার আলেকজাণ্ডার ১৮১৪-১৫ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর ইওরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেন। তাঁহারই

ষ্টায় ভিয়েনায় সম্মিলিত শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পরাজিত ফ্রান্সের উপর কঠোর সন্ধি চাপাইয়া দিতে পারেন নাই। পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও জার আলেকজাণ্ডার উদারনীতির পরিচয় দেন। ভিয়েনা সম্মেলনের শর্তানুযায়ী জার আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডের যে অংশ পাইয়াছিলেন (**গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারসো**) (**Grand duchy of Warsaw**) সেই অংশটিকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া **"পোল্যাণ্ড রাজ্য"** নামে একটি রাজ্যে পরিণত করেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে জারের প্রতি আনুগত্য ছাড়া পোল্যাণ্ডবাসীদের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। এমন কি পোল্যাণ্ডে তিনি একটি সংবিধানও প্রবর্তিত করেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডকে যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয় নাই, সে কারণে পোল্যাণ্ডের জনসাধারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইয়া যায়। সেজন্য আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের প্রতি বিরক্ত হনএবং তাঁহার রাজত্বের শেষ দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেন। তাহার ফলে তিনি মেটারনিকের প্রভাবে **প্রোটোকোল অব ট্রপো** (**Protocal of Troppau**) স্বাক্ষর করেন। ১৮২০ সালের পর পিডমণ্ট ও নেপলসে যখন বিদ্রোহ হয় তখন সেই বিদ্রোহ দমনে তিনি মেটারনিককে সমর্থন করেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের শাসনের অবসান হয়।

পোল্যাণ্ডের বৈপ্লবিক বন্দোবস্ত

জার প্রথম নিকোলাস, ১৮২৫-৫৫ (Tsar Nicholas I (1825-55):

জার আলেকজাণ্ডারের কোন পুত্র ছিল না। অতএব তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু অগ্রজ কনস্টেনটাইনের দাবি উপেক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া সামরিক কর্মচারিগণ এবং গুপ্ত সমিতিগুলি এক বিদ্রোহ ঘোষণা করিল (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দ)। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ হইয়াছিল বলিয়া বিদ্রোহীদের **'ডেকাব্রিস্ট বা ডিসেম্ব্রিস্ট'** (**Dekabriests or Decembrists**) বলা হয়। এই বিদ্রোহীদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উপযুক্ত সংগঠন তেমন কিছু ছিল না; ফলে নিকোলাসের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা খুব সহজ হইয়াছিল। নিকোলাস বিদ্রোহী নেতাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করিলেন। ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ আপাত দৃষ্টিতে বিফল হইলেও রাশিয়ার মুক্তির ইতিহাসে তাহাদের আত্মত্যাগের আদর্শ পরবর্তিকালে বহু স্বাধীনতাকামী রাশিয়াবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।*

নিকোলাসের বিদ্রোহ দমন

*"The Decembrists had shown that the sufferings of the Russian people......were capable of raising up patriots willing to pour out their blood for the regeneration of their conntry"—Vide Lipson. "Europe in the Nineteenth and Twentieth centuries"—PP 86-87.

ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ প্রথম নিকোলাসকে সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত করে ; তিনি **গুপ্তচরবাহিনী (Third Section)** এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা রাশিয়াতে এক স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। **থার্ড সেকসন (Third Section)** ইচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ, নির্বাসন এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিত। কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা হয়। কোন পুস্তক যদি সরকারের সমালোচনা করিত তাহা হইলে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত। এমন কি সঙ্গীতের মাধ্যমে যেন কোন প্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা প্রকাশ না পাইতে পারে সেজন্য সঙ্গীত রচনাও সরকার কর্তৃক কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

স্বৈরাচারী ও সন্ত্রাসের রাজ্য

বিদেশ হইতে কোন প্রকার উদারনৈতিক ভাবধারা যেন রাশিয়ায় প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য নিকোলাস রাশিয়ার প্রজাদিগের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইত। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। প্রজারা যাহাতে কোন প্রকার উদারনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত না হইতে পারে সেজন্য নিকোলাস বিদেশী গ্রন্থাদি রাশিয়ায় আমদানী করা নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু দেশের সাহিত্য ও শিক্ষায় উৎসাহ দান করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ঔপন্যাসিক **ডস্টোইয়েভস্কি (Dosteievski), গগোল (Gogol),** এবং **তুর্গেনিভ (Turgeniev)** ও **কবি পুস্কিন (Pushkin)** তাঁহাদের রচনা দ্বারা এ যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। সেজন্য প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালকে "রাশিয়ার **অগাস্টিয়ান যুগ**" (**Augustan Age of Russia**) বলা হইয়া থাকে।

কঠোর নিয়ন্ত্রণ

ধর্ম বিষয়েও নিকোলাস কোন প্রকার স্বাধীনতা স্বীকার করেন নাই। কেহ ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইত। এমন কি তাহাকে দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদেশের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে রাশিয়া অধিকৃত পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দিলে নিকোলাস ঐ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নাকচ করিয়া ঐ অংশটিকে রাশিয়ার সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রেও প্রথম নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইওরোপে উদারনৈতিক আন্দোলন দমনে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য নিকোলাস অস্ট্রিয়া

ও প্রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৮৪৮-৪৯ খ্রীস্টাব্দে হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অস্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠান এবং বিদ্রোহ দমন করা হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্র নীতি

কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। এই পরাজয়ের ফলে নিকোলাসের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার ত্রুটি এবং দুর্বলতা সকলের নিকট ধরা পড়ে। ফলে রাশিয়ায় উদারনৈতিক আন্দোলন সক্রিয় হয় এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষ ভাগে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে নিকোলাসের মৃত্যু হয়।

অনুশীলনী

1. Why the July Revolution is so called ? Where did it originate ? What was its effect in the country of its origin ? How far did it affect other countries and what were its results ?

[কেন জুলাই বিদ্রোহ এই নামকরণটি হইয়াছিল ? এই বিদ্রোহ প্রথম কোথায় সংঘটিত হইয়াছিল ? সেখানে ইহার কি প্রভাব পড়িয়াছিল ? এই বিদ্রোহের প্রভাব অপর দেশগুলিতে কতখানি পড়িয়াছিল এবং তাহাতে কি ফল হইয়াছিল ?]

উ: পৃ: ৪১ হইতে ৪৪ পৃ: লিখ।

2. Why was it that Greece had to wage war for securing her independence ? Describe her course of action and how did the Ottoman Sultan try to check its progress and with what ultimate result.

[কেন গ্রীসকে আপনার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিতে হইয়াছিল ? ইহার অগ্রগতি বর্ণনা করিতে যাইয়া দেখাও কেমন করিয়া তুরস্কের সুলতান ইহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহার শেষ ফল কি হইয়াছিল ?]

উ: পৃ: ৪৬ হইতে ৪৯ পৃ: লিখ।

3. What was the condition of Russia in the beginning of the 19th century ? What type of man Tsar Alexander I was ? How did he try to deal with Poland ?

[উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাশিয়ার অবস্থা কিরূপ ছিল ? জার প্রথম আলেকজাণ্ডার কি রকমের লোক ছিলেন ? পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে তিনি কিরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ?]

উ: পৃ: ৪৯ হইতে ৫১ পৃ: লিখ।

4. What was it that led Tsar Nicholas I to take stern measures in his kingdom ? What price did he pay for that ?

[কেন জার প্রথম নিকোলাসকে রাজ্য মধ্যে কঠোর ব্যবস্থা-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ? ইহার ফলে তাঁহাকে কি মূল্য দিতে হইয়াছিল ?]

উ: পৃ: ৫১ হইতে ৫৩ পৃ: লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বিপ্লব
(The Midcentury upheaval)

১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবের ঘটনাবলী (The sequence of the Revolutions of 1848-50) : ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনা সম্মেলন দ্বারা যে প্রতিক্রিয়াশীল যুগের শুরু হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব। কিন্তু সেই বিপ্লব ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী আঠারো বছর মেটারনিকের দমন নীতির ফলে সমস্ত ইওরোপে কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব আরম্ভ হইলে সমস্ত ইওরোপে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই বিপ্লব জার্মানী, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইতালী প্রভৃতি পনেরটি রাষ্ট্রের জনসাধারণকে অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ফলে ১৮৪৮-৫০-এর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইওরোপে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং পনেরটি দেশের সরকারের সাময়িক পরাজয় ঘটে।

জার্মানী

জার্মানীর প্রাশিয়া, স্যাক্সনি, বেডেন, বেভেরিয়া, হ্যানোভার প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা গিয়াছিল। প্রাশিয়ার রাজা **চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম** সংবিধান তৈয়ারী করিবার জন্য **প্রতিনিধি সভা** (Jnited **Landtag**) আহ্বান করিতে বাধ্য হন। বেভেরিয়া, বেডেন, উরটেমবার্গ, স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যেও রাজারা বিপ্লবীদের চাপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজী হইয়াছিলেন। এদিকে

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট

জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য সমগ্র জার্মানী হইতে নির্বাচিত দুই শত প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে মিলিত হন। এই বিপ্লবী সভা ইতিহাসে **ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট** নামে পরিচিত। সদস্যদের মধ্যে বহু আলোচনার পর এই পার্লামেণ্ট এক শাসনতন্ত্র রচনা করিয়াছিল। রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়িবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের সম্রাট হইবার জন্য প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান জানান হয়। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা অস্ট্রিয়ার চাপে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের দ্বারা প্রাশিয়ার অধীন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, যথা—ভিয়েনা, মিলান, বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরীতে বিপ্লব প্রবল আকার ধারণ করে। মেটারনিক দেশ হইতে পলায়ন করেন। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে **মেটারনিক ব্যবস্থারও** (**Metternich System**) অবসান ঘটিয়াছিল। হাঙ্গেরীতে **লুই কসুথ** (**Louis Kosuth**)-এর নেতৃত্বে বিপ্লব স্বরু হইয়াছিল। হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং মার্চ মাসের আইনের দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে চেতনা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট বিপ্লবের প্রথম আঘাত সহ্য করিয়া প্রত্যাঘাত করিবার মত ক্ষমতাবান হইয়াছিলেন।

অস্ট্রিয়া

হাঙ্গেরী

ইতালীর পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া, পার্মা, মোডেনা, পোপের রাজ্য, নেপল্‌স্ এবং সিসিলিতে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেক স্থানের শাসকই উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মেটারনিকের পতনের সংবাদ ইতালীতে পৌছান মাত্র মিলান এবং ভেনিসে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল মিলান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভেনিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডমণ্টের রাজা **চার্লস্ আলবার্ট** জাতীয় সংগ্রামের নেতা হইলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু **কাস্টোজা** (**Custozza**) ও **নোভারা** (**Novara**)-র যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়ার সেনাপতি **রেডেৎস্কি** (**Radetzky**)-র হাতে পরাজিত হন। ফলে সাময়িকভাবে পিডমণ্টের নেতৃত্বে ইতালীর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে **ম্যাৎসিনি** (**Mazzini**) ও **গ্যারিবল্ডি** (**Garibaldi**) পোপকে বিতাড়িত করিয়া রোমে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট **লুই নেপোলিয়ন** এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া রোমের প্রজাতন্ত্র ধ্বংস করেন। একে একে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইতালীর সর্বত্র বিপ্লব দমিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইওরোপের অন্যান্য দেশেও বিপ্লবীরা পরাজিত হয়।

ইতালী

১৮৪৮-৫০ এর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য (Character of the Revolutions of 1848-50): ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটিলে উহার প্রভাব সমস্ত ইওরোপের দেশগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়া গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সংঘটিত করে। বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী এই আন্দোলনের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু এই আন্দোলনের ধারার মধ্যে মোটামুটি ঐক্যসূত্র দেখা যায়।

প্রথমত, এই বিপ্লব প্রায় সর্বত্রই ভিয়েনা চুক্তির প্রতিবাদে ঘটিয়াছিল। ভিয়েনা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য

জনসাধারণ জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাজতন্ত্রের সঙ্গে সকলপ্রকার মীমাংসার মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল।

ইতালীতে এবং জার্মানীতেও ভিয়েনা চুক্তি অনুসারে স্থাপিত অস্ট্রিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব দেখা গিয়াছিল। বিচ্ছিন্নীকৃত ইতালী ও জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সাধন ও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে, যেমন—হাঙ্গেরীতে ম্যাগিয়ার, অন্যান্য অঞ্চলে চেক, স্লাভ প্রভৃতি জাতি জাতীয় স্বাধীনতা এবং ঐক্যের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এইভাবে ইওরোপের বিভিন্ন অংশে বিপ্লবের স্বরূপের পার্থক্য থাকিলেও এগুলির মধ্যে ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও জাতীয়তা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরোধিতা

জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

দ্বিতীয়ত, ১৮৪৮-এর বিপ্লব শহর-ভিত্তিক ছিল।* শহরের অসন্তুষ্ট জনসাধারণ এই বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তবে এই বিপ্লবে নেতৃত্ব করিয়াছিল শহরের বুদ্ধিজীবীরা যেমন—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রসমাজ, সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকবৃন্দ। কৃষক সম্প্রদায় এই বিপ্লবের সমর্থন করা দূরের কথা, এই বিপ্লবের বিরোধিতা করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, উহা বিপ্লবের প্রেরণা যোগাইতে সক্ষম হইলেও বিপ্লবকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারে নাই।

শহর-ভিত্তিক বিপ্লব

তৃতীয়ত, ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর বিপ্লব অর্থের ভিত্তিতে ভোটাধিকারকে লোপ করিয়া প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। ইহার প্রভাব ক্রমে সমস্ত ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। অতএব গণতন্ত্রের ইতিহাসে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার

চতুর্থত, অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা ফেব্রুয়ারী বিপ্লব হইতেই প্রথম আরম্ভ হয়। পরবর্তী যুগে এই সমাজতান্ত্রিক প্রভাব সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক ভিত্তি

সর্বশেষে, যুগধর্মের বিরুদ্ধে কোন পূর্বতন ব্যবস্থাকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না—এই সত্যই ফেব্রুয়ারী বিপ্লব প্রমাণিত করিয়াছিল।

পূর্বতন ব্যবস্থা অচল

* "The Revolution of 1848 were, in origin and impetus. The work of towns"
—Europe since Napoleon by David Thomson. P-206

১৮৪৮-৫০-এর বিপ্লবের ফলাফল (Sequel of the Revolutions of 1848-50)—

ফ্রান্স ঃ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সাফল্য ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল। ফ্রান্সে **লামার্টিন (Lamartine)**-এর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের যুক্ত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। দশজনকে লইয়া এই অস্থায়ী সরকারের এক **কার্যনির্বাহক (Executive) সমিতি** গঠিত হয়। এই সরকার প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ঘোষিত হয়। জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিবার সকলের সমান অধিকার ঘোষিত হয়।

প্রজাতান্ত্রিক দেশ

সমাজতন্ত্রবাদ বা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা এই সরকারের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। সকলের জন্য আয়ের ব্যবস্থা এবং মজুর শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘোষণা করিলেন।

সমাজতন্ত্রবাদ

অস্থায়ী সরকার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ৭৫০ জন সদস্যের এক কক্ষযুক্ত একটি আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করে। জনগণের ভোটের দ্বারা একজন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা স্থির হইল। এই রাষ্ট্রপতি চারি বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার

এইভাবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য অবসান করিয়া ফ্রান্সের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য স্থাপন করিয়াছিল।

গণমুখিতা

ইওরোপ ঃ ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ইওরোপে এমন ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দকে **"বিপ্লবের বৎসর"** বলিয়া অভিহিত করা হয়। যদিও গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের মোট সাফল্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে বলা যায় না, তথাপি বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত, এই বিপ্লবের ফলে ইওরোপীয় কনসার্ট **প্রাকবিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Old Regime)-কে** পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং ভিয়েনা চুক্তিকে কার্যকরী

করিবার যে চেষ্টা ১৮১৫ সাল হইতে করিতেছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল। যুগধর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব নহে এই সত্যই ফেব্রুয়ারী বিপ্লব প্রমাণিত করিয়াছিল।

যুগধর্মের প্রাধান্য

দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লব জার্মানী ও ইতালীতে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে। এই জাতীয়তাবোধের ফলেই পরবর্তিকালে জার্মানী ও ইতালীর ঐক্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। তৃতীয়ত এই বিপ্লবের ফলে "মেটারনিক ব্যবস্থা" (Metternic System) বা মেটারনিক কর্তৃক ইওরোপে জাতীয়তাবাদে এবং গণতন্ত্র দমনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার পতন ঘটে।

জাতীয়তাবোধ

অবশেষে বলা যায় এই বিপ্লবের ফলে রাজা ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী এই ধারণা ইওরোপের জনসাধারণের মন হইতে দূরীভূত হইয়াছিল।

অনুশীলনী

1. Discuss the character and effects of the National Revolutions of 1848 50

[১৮৪৮ ৫০ খ্রীস্টাব্দের জাতীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং ফলাফল আলোচনা কর]

উ: জাতীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং ফলাফল ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অষ্টম অধ্যায়

বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক (১৮৫০-'৭১)

পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (The Eastern Question and the Crimean War):

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য (Ottoman Empire)-এর পতন লক্ষ্য করা যায়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কৃষ্ণসাগর, বসফোরাস ও দাদানেলিস প্রণালীর উপর রাশিয়ার বিস্তার নীতিকে পূর্বাঞ্চল বা নিকট প্রাচ্য সমস্যা বলা হয়।

পূর্বাঞ্চল সমস্যা কাহাকে বলে

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এই সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তুরস্কের অধীন বলকান দেশগুলি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল। বলকান দেশগুলির জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল গ্রীক-ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী অথচ তুরস্ক ছিল মুসলমান রাষ্ট্র। এই ধর্মবৈষম্যের জন্য বলকান দেশগুলির মধ্যে তুরস্কের প্রতি এক বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত জাতীয়তাভাবও বলকান দেশগুলিকে স্বাধীন হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

পূর্বাঞ্চল সমস্যার জটিলতার কারণ

রাশিয়ার অগ্রগতিকে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি—বিশেষত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া—বাধা দেওয়ার ফলে পূর্বাঞ্চল সমস্যা ইওরোপীয় রাজনীতিতে একটি কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তার নীতিতে বাধা দিতে না পারিলে ইংলণ্ডের ভারতীয় সাম্রাজ্য বিপন্ন হইতে পারে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডের নীতি ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখা। ফ্রান্সেরও বাণিজ্যিক ও ধর্মগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধাদান করা প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রিয়া দানিউব অঞ্চলে রাশিয়ার অধিকার বিস্তারে আশঙ্কিত ছিল, কারণ দানিউব নদী ছিল অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি।

অতএব রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা ইওরোপের এক অন্যতম জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছিল। রাশিয়ার জার পিটারের আমল (১৬৮৯-১৭২৫) হইতেই তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি শুরু করে। দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্বকালে এই নীতি সাফল্য লাভ করে। যথা:

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের কুচুক্-কাইনারজি (Kutchuk-Kainardji)-এর সন্ধি দ্বারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর তীরে আজভ (Azov) বন্দর দখল করিয়াছিল। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে এবং দানিউব নদীতে বাণিজ্যেপোত চালনার অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার পর দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলেই জাসির সন্ধি (Treaty of Jassy) দ্বারা রাশিয়া ক্রিমিয়া (Crimea) দখল করিয়া লইয়াছিল।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া) মনঃপূত হয় নাই। ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার সাথে যোগদান করিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে এবং আড্রিয়ানোপলের সন্ধি দ্বারা তুরস্ককে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

ইহারপর রাশিয়া যখন তুরস্কের সাথে উনকিয়ার স্কেলেসি (Unkiar Skelessi) নামক সন্ধি (১৮৩৩) স্বাক্ষর করিয়া তুরস্কের অধীন মিশরের (Egypt) শাসনকর্তা মেহেমেৎ আলীর আক্রমণ হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার বিস্তার নীতি বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পামারস্টোনের চেষ্টায় ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি (London Convention) দ্বারা রাশিয়ার অগ্রগতিতে ইংলণ্ড পুনরায় বাধাদান করিয়াছিল।

পরবর্তী কয়েক বৎসর (১৮৪১-৫৩) পূর্বাঞ্চলের সমস্যায়, নূতন কোন জটিলতা দেখা দেয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্য গ্রাস করার নীতি গ্রহণ করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) (The Crimean War)

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব (১৮৫৩)

যুদ্ধের কারণ—ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট প্রাচ্য সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস ইংলণ্ডের সহিত যুগ্মভাবে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করেন। তিনি তুরস্ককে 'রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sickman) বলিয়া বর্ণনা করেন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য পতনের পূর্বেই উহা ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্য বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে জার নিকোলাসের প্রস্তাব ইংলণ্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না।

এদিকে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যালেস্টাইনে অবস্থিত খ্রীস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থানের আধিপত্য লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের কুচুক-কাইনারজি (Kutchuk-Kainardji)-র সন্ধির শর্তানুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত গ্রীক খ্রীস্টানদের* তীর্থস্থানগুলির এবং গ্রীক খ্রীস্টান যাজকদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল; অন্য দিকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের এক চুক্তিদ্বারা ল্যাটিন খ্রীস্টানদের তীর্থস্থান এবং ল্যাটিন খ্রীস্টানদের অভিভাবকত্ব ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন এই সকল অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ কোন পক্ষই পায় নাই। কিন্তু ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পুনরায় তুরস্কের নিকট হইতে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের শর্তানুযায়ী পূর্বেকার অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। জার নিকোলাস কালক্ষেপ না করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধীন গ্রীক খ্রীস্টানদের এবং তাহাদের ধর্মস্থানের উপর অভিভাবকত্ব দাবি করিলেন। তুরস্কের সুলতান ধর্মস্থানগুলির উপর রাশিয়ার অভিভাবকত্ব মানিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রজাবর্গের উপর রাশিয়ার কোন প্রকার অধিকার স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। ফলে জার নিকোলাস মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করিয়া লইলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথ রাশিয়ার বিস্তার নীতিতে বাধা পাইতে পারে এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন রাশিয়াকে বাধা দিতে চাহিলেন। অপর দিকে তৃতীয় নেপোলিয়নও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। নেপোলিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে চাহিলেন। উপরন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন জারের ব্যক্তিগত ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফরাসী জাতি যাহাতে চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতির উন্মাদনায় মাতিয়া থাকে এবং তাহাদের যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তিনি বিন্যাস করিয়াছেন সেদিকে মনোযোগ দিতে না পারে সেজন্য নেপোলিয়নের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন ছিল। রাশিয়া মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করায় অস্ট্রিয়াও আশঙ্কিত হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ভিয়েনা নগরীতে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবর্গ এক বৈঠকে বসিয়া 'ভিয়েনা প্রস্তাবপত্র' (Vienna Note) নামে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। এই প্রস্তাবে কুচুক-

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের শর্তানুসারে ফ্রান্স কর্তৃক ল্যাটিন খ্রীস্টানদের ধর্মস্থানের অভিভাবকত্ব দাবি: রাশিয়া কর্তৃক গ্রীক খ্রীস্টান যাজক ও ধর্মস্থানের উপর অভিভাবকত্ব দাবি

রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল

* গ্রীক খ্রীস্টান বলিতে রোমের পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের ধর্মাধিষ্ঠান হইতে প্রচারিত খ্রীস্টানদের বুঝাইত এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হইতে প্রচারিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের ল্যাটিন খ্রীস্টান বলা হইত।

কেইনারজি এবং আড্রিয়ানোপলের সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রীক খ্রীস্টানদের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করা হইল, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু রাশিয়া দাবি করিতে পারে না বলিয়া জানান হইল। রাশিয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিল। ফলে ২৩শে অক্টোবর, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে যদিও যোগদান করে নাই কিন্তু সর্বদা রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। প্রাশিয়া ও বিসমার্কের পরামর্শে এই যুদ্ধ হইতে বিরত ছিল। পিডমণ্ট সার্ডিনিয়া পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় কোন প্রকার জড়িত না থাকা সত্ত্বেও পনের হাজার সৈন্যসহ মিত্রপক্ষে যোগদান করে।

তুরস্ক কর্তৃক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে (মার্চ হইতে জুলাই, ১৮৫৪) রাশিয়া সিলিস্ট্রিয়া (Silistria) নামক স্থানটি আক্রমণ করে। কিন্তু সিলিস্ট্রিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এমন সময় অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিবার জন্য এক চরমপত্র দিল। সিলিস্ট্রিয়া দখল করিতে না পারিয়া এবং অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া নিকোলাস মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাশিয়ার এই দুইটি স্থানের ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যে কারণে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তখন যুদ্ধ অবসানের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা রাশিয়াকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এইভাবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। এই পর্যায়ে মিত্রপক্ষের ক্রিমিয়া (Crimea) ও সিবাস্তোপল (Sebasatopol) অধিকার হইল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রশক্তির আল্মা (Alme)-এর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রিমিয়া দখল করে। বালাক্লাভা (Balaclava) এবং ইঙ্কারম্যান (Inerkman) এই দুইটি যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইলে সিবাস্তোপলের পতন ঘটে। ইহার পর জার নিকোলাসের মৃত্যু হইলে তাহার পরবর্তী জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন কিন্তু বেশীদিন যুদ্ধ করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও তিনি কার্স্ (Kars) নামক স্থানটি দখল করিয়াছিলেন কিন্তু অস্ট্রিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য তাহাকে এক চরমপত্র দিলে তিনি

যুদ্ধের ঘটনা

যুদ্ধের প্রথম পর্যায় রাশিয়া কর্তৃক সিলিস্ট্রিয়া আক্রমণ অস্ট্রিয়ার চরম পত্র: রাশিয়া কর্তৃক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ত্যাগ

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়: আলমা, বালাক্লাভা এবং ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়

নিকোলাসের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সিংহাসন লাভ: যুদ্ধাবসান

তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে প্যারিসের সন্ধি (Treaty of Paris) দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়।

প্যারিসের সন্ধি (মার্চ ১৮৫৬)

প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসান হয়। এই সন্ধির শর্তগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত, কৃষ্ণসাগরকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহাতে সকল দেশের বাণিজ্য-পোত চলাচলের সমান অধিকার পাইল। কিন্তু ইহার উপকূলে রাশিয়া বা তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইল। দানিউব নদীতে সকল দেশকেই সমানভাবে নৌ চালানার অধিকার দেওয়া হইল।

প্যারিসের সন্ধির শর্তাবলী : তিনটি ভাগ

দ্বিতীয়ত, (১) রাশিয়াকে তুরস্কের গোঁড়া খ্রীস্টানদের উপর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিতে হইল। (২) রাশিয়াকে দক্ষিণ বেসারাবিয়া তুরস্ককে ফিরাইয়া দিতে হইল। ফলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা দানিউব অঞ্চল হইতে সরিয়া গেল।

তৃতীয়ত, ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

যুদ্ধের ফলাফল (Effects of the Crimean War)

ফলাফলের দিক হইতে আলোচনা করিলে ক্রিমিয়ার যুদ্ধকে ইওরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যায়। ইহা মেটারনিক যুগের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া জাতীয়তা এবং গণতন্ত্র যুগের সূচনা করে। সেই জন্যই বলা হয় 'The Crimean War marks a watershed in European History."

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলাফল

ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইল—প্রথমত, কৃষ্ণসাগর তীরে রাশিয়ার অগ্রগতিকে বাধাদান করিয়া রাশিয়াকে অপমানিত করিয়াছিল।*

দ্বিতীয়ত, তুরস্ক আরও কিছুকাল একটি সাম্রাজ্য হিসাবে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ লাভ করিল। তৃতীয়ত, ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন কর্তৃক বোনাপার্টি আমলের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করিল। চতুর্থত, ইংলণ্ড এই যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সর্বশেষে, এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার শত্রুতা অর্জন করিল।

* "The Crimean war checked and humiliated Russia."—Ketelby 'A Short HistoRoy of Modern Times' P. 221

কিন্তু পরোক্ষ ফলের দিক দিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশী।

যুদ্ধের পরোক্ষ ফল

প্রথমত, ইতালীর রাজনৈতিক ঐক্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল হিসাবে গণ্য করা হয়। * এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াই পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাভুর ইতালির ঐক্যের প্রশ্নকে এক আন্তর্জাতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি লাভ করিলেন। ইহা ছাড়া ইতালীর ঐক্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জার্মানীও ঐক্যবদ্ধ হইল। দ্বিতীয়ত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার দোষত্রুটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পশ্চাতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী উপলব্ধি করিয়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক ব্যাপক সংস্কার নীতি গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পররাষ্ট্র নীতিতেও রাশিয়া এক নূতন পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় পারস্য এবং আফগানিস্থানের দিকে রাশিয়া বিস্তার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সর্বশেষে বলা যায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের শান্তিভঙ্গ করিয়া পরবর্তিকালের কয়েকটি যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের অধীনে ফ্রান্স (France under Napoleon III)

প্রথম জীবন (Early Career)

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হল্যাণ্ডরাজ লুই বোনাপার্টির পুত্র। তিনি ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা কথিত আছে যে, ওয়াটারলুর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে নেপোলিয়ন সাত বৎসরের বালক লুই নেপোলিয়নকে নাকি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "কে বলিতে পারে এই শিশুর মধ্যেই হয়ত আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।" ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বোনাপার্টি পরিবার নির্বাসিত হইলে লুই নেপোলিয়ন ভাগ্যের অন্বেষণে নানাদেশে ভ্রমণ করেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি চার্টিস্ট আন্দোলন (Chartist Movement)-এর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে স্পেশ্যাল কনস্টেবল (Special Constable) হিসাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সুযোগসন্ধানী এবং ক্ষমতা লাভ

লুই নেপোলিয়নের জন্ম

নির্বাসিত জীবন

* "Out of mud of the Crimea a new Italy was mada"—Ketelby, "Historoy o: Modern Times". P-221

করিবার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্ট্রাসবার্গ নামক স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্য যোগাড় করিয়া ক্ষমতালাভের চেষ্টা করিতে গিয়া ব্যর্থ হন এবং ধৃত হন। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় তিনি বোলন্ (Boulogne) নামক স্থানে সামরিক শক্তির সাহায্যে লুই ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থ হন এবং হ্যাম (Ham) হ্যাম নামক দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এখান হইতে তিনি ছদ্মবেশে পলায়ন করেন।

ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ব্যর্থ

ইহার পর ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে লুই নেপোলিয়নের উত্থান আরম্ভ হয়। লুই ফিলিপের পতনের পর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ফরাসী প্রজাতন্ত্রের আইন সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় 'নেপোলিয়ন' নামের মোহে জনসাধারণকে পাইয়া বসিয়াছিল, যাহার জন্য তিনি ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চারি বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

লুই নেপোলিয়নের উত্থান

রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত

লুই নেপোলিয়ান খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইলেও মনে প্রাণে তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। নতুন আইনসভায় রাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিল। নেপোলিয়ন খুব সতর্কভাবে নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন এবং নিজেই সেই সুযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রথমত, তিনি সামরিক এবং বেসামরিক বাহিনীর উচ্চপদগুলিতে নিজের সমর্থকদের নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি রোমে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। তৃতীয়ত, রাজতন্ত্রীদের দ্বারা প্রভাবিত আইনসভা সমাজতন্ত্রীদের প্রতি বিরূপ ছিল। তাহাদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য, আইনসভার সমাজতন্ত্রী সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় তিরিশ লক্ষ ব্যক্তির ভোটাধিকার আইনের সাহায্যে হরণ করা হয়। সংবাদপত্র, সভাসমিতি এবং নাগরিকদের অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলিও একে একে হরণ করা হইয়াছিল। আইনসভা যখন এই সকল অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে তখন লুই নেপোলিয়ন

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল

আইনসভাকে সমর্থন জানান। ইহার পর লুই নেপোলিয়নের কার্যকাল শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও তিনি সংবিধান অনুযায়ী আর রাষ্ট্রপতি পদে থাকিতে পারিবেন না। তিনি আইনসভার মতিগতি বুঝিলেন যে সদস্যরা সংবিধানে পরিবর্তন আনিতে ইচ্ছুক নন। অন্য উপায় না দেখিয়া নেপোলিয়ন ক্ষমতা দখল করিবার পরিকল্পনা নিয়াছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন। ভোটাধিকার সংকোচন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলি বাতিল করিয়া দিবার জন্য তিনি আইনসভার নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। আইনসভা তাঁহার প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিলে তিনি তাঁহার অনুগত সৈন্যদলের সাহায্যে হঠাৎ আইনসভা আক্রমণ করেন এবং রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী সদস্যদের বন্দী করেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ)। জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন যে, প্রজাতন্ত্র ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার পুনরায় চালু করেন। ইহার পর তিনি জনসাধারণকে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকিবার মেয়াদ দশ বৎসর করিতে বলিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁহাকে ফ্রান্সের রক্ষাকর্তা মনে করিয়া দশ বৎসরের জন্য তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করতে দ্বিধা করে নাই। ইহার পর ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য এক নতুন শাসনতন্ত্র চালু করেন। এই শাসনতন্ত্রে লুই নেপোলিয়ন নিজের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার সাথে সাথে দেশের সর্বত্র দমন নীতি চালান হয় এবং লুই নেপোলিয়নের বিরোধী পক্ষদের শক্তি চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর লুই নেপোলিয়ন ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনেক ভোটের জোরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী রূপে নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র এইভাবে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নীতি

তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার জীবনের আদর্শ প্রথম নেপোলিয়নের জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার বহুপূর্বে তিনি "নেপোলিয়নের আদর্শ" (Napoleonic Ideas) এই নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি নেপোলিয়নের আদর্শ সম্বন্ধে বলেন যে, প্রথম নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য সাময়িকভাবে একনায়কতান্ত্রিক

শাসন ফ্রান্সে প্রবর্তন করা, কিন্তু তাঁহার আসল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র স্থাপন করা। জ্যেষ্ঠতাতের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার আভ্যন্তরীণ নীতিতে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার এবং সংস্কার নীতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য চেষ্টা করেন।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর পশ্চাতে একক ক্ষমতা রাখা

প্রথমে তিনি গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখিয়া শাসনব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষমতা নিজের হাতে রাখিলেন। সিনেট ও কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং বিচারপতিগণ সকলেই সম্রাট কর্তৃক মনোনীত হইলেন। আইনসভার সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে যদিও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হইল, কিন্তু তবুও স্বাধীন নির্বাচনকে ব্যাহত করার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল। যাহাতে বিরোধী শক্তিগুলি মাথা তুলিতে না পারে সেজন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং সংবাদপত্রগুলির উপর কড়া নজর রাখা হয়। বাক্-স্বাধীনতা এবং সভাসমিতি করার স্বাধীনতা লোপ করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার

কিন্তু অন্যদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রজাহিতৈষী সম্রাটরূপে দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সকে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কৃষকরা যাহাতে অল্প সুদে অর্থ পাইতে পারে তাহার জন্য দেশব্যাপী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। 'ক্রেডিট মেবিলিয়ার' (Credit mabilier) নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের শাখা খুলিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া 'ক্রেডিট ফাঁসয়ার' (Credit 1oucier) হইতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নেপোলিয়ন আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর তুলিয়া দিলেন এবং সমগ্র দেশে রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বড় বড় বাষ্পীয় জাহাজ তৈয়ারির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের সাথে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

কৃষিকার্যের উন্নতি

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার

সামাজিক সংস্কার

সামাজিক সংস্কারক হিসাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত, তিনি দেশময় হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং হাসপাতালে যাহাতে গরীবদের বিনা খরচে সুচিকিৎসা হয় সেদিকে নজর রাখিয়াছিলেন। দেশের বেকার সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সরকারি কারখানা স্থাপন করেন।

শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থা

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন কয়েকটি শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কারখানায় নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে শিল্পবীমা প্রবর্তন করেন। শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়ন গঠন ও নায্যকারণে ধর্মঘট করাকে তিনি আইনসঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

প্যারিস নগরীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

প্যারিস নগরীকে ইওরোপের সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি নূতন নূতন প্রাসাদ, প্রেক্ষাগৃহ, প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রখ্যাত স্থপতি Baron Haussman -এর পরিচালানায় প্যারিসকে সৌন্দর্যময়ী করিবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ হইতে পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার স্বৈরাচারী শাসন কতক-পরিমাণে হ্রাস করিয়া উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। এজন্য ১৮৬০-৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দশবৎসর কাল তাঁহার শাসনকালকে উদারনৈতিক সাম্রাজ্য বলা হয়। তিনি সিনেট (Senate) ও এসেম্বলীকে (Assembly) সরকারী নীতি সমালোচনা করিবার অধিকার দিলেন। বাজেট পাশ করিবার অধিকারও এসেম্বলীকে দেওয়া হইল। ক্রমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে সমবেত হইবার অধিকার এবং দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সম্রাটবিরোধী জনমত দিনদিন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নাতিতে নেপোলিয়ন শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন —'The Empire is Peace' কিন্তু এই নীতি তিনি কার্যকরী করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ তৃতীয় নেপোলিয়ন জানিতেন যে লুই ফিলিপের পতনের কারণ তাঁহার দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি। এই কারণে নিজের সম্রাট পদ রক্ষার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিতে

হইয়াছিল। নিজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ এবং জনসাধারণকে চমকিত করিয়া নেপোলিয়নীয় গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। তাঁহার রাজত্বের প্রথম আটবৎসর তিনি পররাষ্ট্রনীতিতে সাফল্য অর্জন করেন কিন্তু ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ হইতে পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৫) খ্রীস্টাব্দ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে যোগদান করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা আন্তর্জাতিক গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এই যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া প্রথম নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করাও তৃতীয় নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের জার প্রথম নিকোলাসের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল। নিকোলাস তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয় এবং প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৫) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের ফলে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁহার আত্মগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং ফ্রান্স পুনরায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে সহায়তা দান

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের দ্বিতীয় কাজ হইল ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে সাহায্য করা। প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় তিনিও জাতীয়তাবাদের দাবি স্বীকার করিতেন। প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর নির্বাসিত অবস্থায় তিনি যখন ইতালীতে গিয়াছিলেন তখন হইতেই তিনি ইতালীর অধিবাসীদের জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই সাহায্যের পুরস্কার সরূপ প্যারিসের চুক্তির অল্পকাল পরেই প্লোমবিয়ারস্-এর চুক্তি (Pact of Plombiers) স্বাক্ষর করিয়া তিনি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে ইতালীর স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যসাধনের যুদ্ধে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যখন পিডমণ্ট সার্ডিনিয়া ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য অবসান যুদ্ধ ঘোষণা করিল তখন নেপোলিয়ন নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগদান করেন। ফরাসী সাহায্যে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ম্যাজেণ্টা (Magenta) ও সোলফেরিনো (Solferino)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিল। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া অস্ট্রিয়ার সহিত ভিলাফ্রাঙ্কা (Villafraca)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করেন। ইতালীর অধিবাসীরা নেপোলিয়নের এই কাজকে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ বলিয়া মনে করিয়াছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সীমান্তে ঐক্যবদ্ধ ইতালী রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ফ্রান্সের

নিরাপত্তার পরিপন্থী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।' তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে জুরিক (Zurich)-এর সন্ধি দ্বারা লোম্বার্ডি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হইয়াছিল।

ইহার পর তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাষ্ট্র নীতিতে বিফলতার যুগ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কার্যকালে তিনি সাহায্য পাঠান নাই। ইহার ফলে একদিকে যেমন জাতিয়তাবাদীরা অসন্তুষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমন রাশিয়ার জার ভবিষ্যতে ফ্রান্স বিরোধী আচরণ করিতে ভুলিলেন না।

পোলিশ নীতি

ইওরোপে তাঁহার বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত মেক্সিকোতে এক ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে মেক্সিকোতে এক ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁহার প্রতি আরও আনুগত্য দেখাইবে। মেক্সিকোতে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দিলে সেই সুযোগে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকোর প্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্থলে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ভ্রাতা আর্কডিউক মেক্সিমিলিয়নকে (Arckdue Masimilian) মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়নের সৈন্য প্রথম দিকে জয়লাভ করিল কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (American Civil War) অবসান হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকার চাপে তৃতীয় নেপোলিয়ন মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইলেন (১৮৬৭)। এই অভিযানে ব্যর্থতার ফলে তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসী জাতির বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর পতনের পথ সুগম করে।

মেক্সিকো অভিযানে ব্যর্থতা

মেক্সিকোতে ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, যাহার ফলে ১৮৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার সাথে ডেনমার্কের যুদ্ধে এবং ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে তাঁহাকে নিরপেক্ষ থাকিতে হয়। তিনি ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া পড়িলে তিনি মধ্যস্থতা করিবেন। কিন্তু স্যাডোয়ার (Sadowa) যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে তাঁহার ভ্রম দূর হইয়াছিল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াল। স্যাডোয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলিয়া মনে করিয়াছিল; তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার

নেপোলিয়নের জার্মান নীতি

স্যাডোয়ার যুদ্ধ

জন্য বিসমার্ককে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না হয় এবং ফ্রান্সের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের এই সকল দাবিতে বিসমার্ক-এর ধারণা জন্মিয়াছিল যে ফ্রান্সের সাথে প্রাশিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তি অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী।* তিনি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতা স্থাপনে তৎপর হন নাই। ফলে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়া দক্ষিণ-জার্মানীর রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নির্বান্ধব ফ্রান্সকে সেডান (Sedan)-এর যুদ্ধে সহজেই পরাজিত করে।** এই যুদ্ধে পরাজয়ের সাথে সাথে দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফরাসীজাতি তৃতীয়বার প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করে।

সেডানের যুদ্ধ : নেপোলিয়নের পতন

ইতালীর ঐক্য আন্দোলন (Italian Unification)

ভিয়েনা কংগ্রেসের পূর্বে এবং পরে ইতালীর অবস্থা (Condition of Italy before and after Congress of Vienna)

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইতালী বহুসংখ্যক পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের আত্মকলহে প্রায়ই বিদেশী রাষ্ট্র যেমন স্পেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। ফলে ইতালীতে কোন প্রকার জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ইতালী পরস্পর বিবদমান রাজ্যে বিভক্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপোলিয়নের অধীন সাম্রাজ্যভুক্ত অবস্থায় ইতালীর অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার, আইনের চক্ষুতে সকলেই সমান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস 'ন্যায্য অধিকার নীতি' প্রয়োগ করিয়া এই আশা আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করে। 'ইতালী' নামক দেশটি একটি ভৌগোলিক নামে (Geographical expression) পর্যবসিত হয়। লোম্বার্ডি-ভেনেশিয়া, পিডমণ্ট, পার্মা, মোডেনা, টাস্কেনি,

নেপোলিয়নের অধীনে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

*"That a war with France would succeed the war with Austria lay in the logic of history"—Bismarck's "Reminiscences."

**"Sedan was the greatest military debacle since Waterloo"
—Ketelby, (History of Modern Times' P291)

লুক্কা, পোপের রাজ্য, সিসিলি-ন্যাপলস্, মনাকে এবং সেন মেরিনো—এই দশটি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে ইতালীকে বিভক্ত করা হয়। লোম্বার্ডি-ভেনেলিয়া অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন রাখা হয় এবং টাস্কোনি, পার্মা ও মোডেনায় অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশীয় শাসকদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দক্ষিণ-ইতালীর সিসিলি ও ন্যাপল্স্ রাজ্য বুরবোঁ রাজবংশের অধীন রাখা হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক যোগাযোগ বা অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ ছিল না। ফলে সমগ্র ইতালীর ঐক্যের আশা সুদূরপরাহত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের সরকারই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল।

ভিয়েনা কংগ্রেস দ্বারা ইতালী একটি ভৌগোলিক নামে পরিণত

কার্বোনারি'র আন্দোলন (Carbonari Movement)

এই অবস্থায় দেশপ্রেমিক ইতালীর অধিবাসীদের পক্ষে কোন প্রকার প্রকাশ্য আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। তাহারা ইতালীর নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। এই গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে নেপল্সের 'কার্বোনারি' সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ দেখা দিলে নেপল্সে ইহার প্রভাব পড়ে এবং কার্বোনারি সমিতি নেপল্স ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ শুরু করে। নেপল্সের রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিনাণ্ডের নিকট হইতে বিদ্রোহীরা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র আদায় করে কিন্তু অচিরেই ফার্ডিনাণ্ড অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন। পিডমণ্টের বিদ্রোহীরা তাহাদের রাজা প্রথম ভিক্টর ইমান্যুয়েলের নিকট হইতে শাসনতন্ত্র আদায় করে কিন্তু এখানেও অস্ট্রিয়ার সাহায্যে স্বৈরাচারী শাসন পুনরায় স্থাপিত হয়।

নেপল্স্ ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ, ১৮২০

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব : পার্মা মোডেনা বাজেট বিদ্রোহ অস্ট্রিয়া কর্তৃক দমন

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব মধ্য ইতালীর পার্মা, মোডেনা ও পোপের রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। বিপ্লবীরা ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ হইতে সাহায্যের আশা করিয়াছিল। কিন্তু মেটারনিকের ভয়ে লুই ফিলিপ কোন সাহায্য পাঠান নাই। ফলে অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপে ইতালীর বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব ব্যর্থ হইলেও এই দুই বিপ্লবের ফলে ইতালীর অধিবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ করিতে না পারিলে ইতালীর জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়।

যোসেফ ম্যাৎসিনির অবদান (Contribution of Joseph Mazzini)

যে মহান নেতা সমগ্র ইতালীর অধিবাসীদের অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য

প্রথম আহ্বান জানাইলেন তাঁহার নাম যোসেফ ম্যাৎসিনি (Joseph Mazzini)।

ম্যাৎসিনি

তিনি ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ছিলেন চিকিৎসক। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। যাহার ফলে তিনি ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে কার্বোনারী সমিতিতে যোগদান করেন এবং বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'ইয়ং ইতালী' (Young Italy) নামে এক নূতন সমিতি স্থাপন করেন।

'ইয়ং ইতালী' আন্দোলন

ম্যাৎসিনির মতে কার্বোনারী সমিতির ব্যর্থতার কারণ তাহারা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে ইতালীর স্বাধীনতার বাণী পৌছাইয়া দিতে চেষ্টা করে নাই। তিনি বলিয়াছিলেন বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে জনসাধারণকে অংশ নিতে হইবে এবং বিপ্লব জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই দরকার।* এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আত্মত্যাগ, দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবোধের আদর্শে তিনি ইতালীর যুবসমাজকে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিলেন। চল্লিশ বৎসরের অনূর্ধ্ব ব্যক্তিরাই শুধু 'ইয়ং ইতালী' সমিতির সভ্য হইতে পারিত। ম্যাৎসিনির আহ্বানে দলে দলে যুবকরা সমিতির সভ্য হয় এবং ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬০,০০০ যুবক এই সমিতির সভ্য হইয়াছিল। তিনি যুবকদের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার যেন গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এবং শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ইতালীর স্বাধীনতা এবং ঐক্যের আদর্শের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করে। ম্যাৎসিনি 'ইয়ং ইতালী'র কর্মপন্থা সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন: প্রথমত, ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য দূর করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য দূর করিতে হইলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধে ইতালীর অধিবাসীরা একত্রিত হইয়া একমাত্র নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিলেই তবে জয়লাভ করিতে পারিবে। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ বা কূট-কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না। দুই কোটি ইতালীবাসী যদি তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করার জন্য অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহা হইলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে ইতালীর উপর অধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে না—ইহাই ছিল ম্যাৎসিনির দৃঢ়বিশ্বাস।**

ম্যাৎসিনির ইয়ং ইতালীর কর্মপন্থা

* "Revolutions must be made by the people and for the people"—Mazzini, Hazen "Europe Since 1815"—P135

**"Austria could not stand against a nation of twenty millions fighting for their rights"

"Europe since 1815"—Hazen P136

শতধাবিভক্ত ইতালীতে যখন জাতীয় ঐক্যের আশা সুদূরপরাহত মনে হইয়াছিল সেই সময় ম্যাৎসিনির বাণী জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ইতালীর স্বাধীনতা এবং ঐক্য অর্জন যে সম্ভব এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চার করিতে ম্যাৎসিনি সাফল্য লাভ করেন। ইতালীর ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালী' সমিতির জন্যই সম্ভব হইয়াছিল।*

ইতালীর ঐক্যের মানসিক প্রস্তুতি

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র ইতালীতে যে গণবিপ্লব হয় সেগুলিও ম্যাৎসিনির পরিচালিত যুবশক্তির চেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংগঠনের অভাব হেতু অস্ট্রিয়া সহজেই এই বিপ্লব দমন করিতে সমর্থ হয়। এই বিপ্লবের ব্যর্থতার ফলেই ইতালীর অধিবাসীরা এই সত্যটি উপলব্ধি করিল যে বিদেশী সাহায্য ভিন্ন ইতালী হইতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য দূর করা সম্ভব নহে। কাউণ্ট কাভুর (Count Cavour) ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হইয়া বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করিলেন।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ইতালীর বিপ্লব ব্যর্থ

বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন—এই শিক্ষালাভ

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ইতালীর বিদ্রোহের অপর একটি গুরুত্ব দেখা যায়। এই বিদ্রোহে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার স্যাভয় বংশীয় রাজা চার্লস এলবার্ট বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি কাস্টোজ্জা (Custtozza) এবং নোভারা (Novara)'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হন। তিনি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় এক উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থাও স্থাপন করেন। ইতালীর ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে স্যাভয় রাজপরিবার ভবিষ্যতে ইতালীয় ঐক্যের নেতৃত্ব লাভ করে। নোভারার যুদ্ধের পর চার্লস এলবার্ট সিংহাসন ত্যাগ করিলে অস্ট্রিয়া চার্লস এলবার্টের পুত্র ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে চার্লস এলবার্ট কর্তৃক ঘোষিত উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা নাকচ করিতে জানায়। কিন্তু ভিক্টর ইমান্যুয়েল এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার এই দৃঢ়তা এবং জাতীয়তাবোধ তাঁহাকে ইতালীর অধিবাসীদের নিকট জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পিডমণ্টের রাজা চার্লস এলবার্টের নেতৃত্ব গ্রহণ

কাস্টোজ্জা এবং নোভারার যুদ্ধে এলবার্টের পরাজয়

পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল

*"He and the society which he founded constituted a leavening, quickening force in the realm of i 'eas"—Ibid.

ফলে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ইতালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল।

ইতালী ঐক্য আন্দোলনে কাভুরের ভূমিকা (Role of Cavour in the Unification of Italy):

কাউণ্ট কাভুর ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে পিডমণ্টের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে সামরিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু উদার মতবাদের প্রতি তাঁহার অনুরাগের জন্য তাঁহাকে সামরিক চাকুরি ত্যাগ করিতে হয়। সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি কৃষিকার্যে মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করিবার জন্য তিনি বারবার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যান। রাত্রির পর রাত্রি ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে শ্রোতা হিসাবে বসিয়া থাকিয়া তিনি তথাকার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার এক উচ্চ ধারণা জন্মে এবং পিডমণ্টে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপন বাঞ্ছনীয় বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন।

কাউণ্ট কাভুরের প্রথম জীবন

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর পিডমণ্টে একটি পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইলে এবং একটি শাসনতন্ত্র ঘোষিত হইলে তিনি আনন্দিত হন এবং এই বৎসরই তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পর (১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে) তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য হন এবং ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কাভুর প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত

ম্যাৎসিনির ন্যায় কাভুরের উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করিয়া ইতালীর স্বাধীনতা অর্জন ও ঐক্যসাধন। কাভুর ছিলেন বাস্তববাদী, কাজেই তিনি বুঝিলেন যে একমাত্র বিদেশী শক্তির সাহায্যেই ইতালীর স্বাধীনতা ও ঐক্যসাধন সম্ভব। ম্যাৎসিনির ন্যায় তিনি অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন না। ইতালী নিজের চেষ্টায়ই অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করিবে এই ধারণা সম্ভব নয় বলিয়া তিনি মনে করিলেন।* বিদেশী শক্তির সাহায্য লাভের জন্য তিনি ইতালীর সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করিতে

কাভুরের উদ্দেশ্য ও নীতি

---

* "Cavour had become convinced that the old slogan 'Italy will do it alone' (Italia fara da se) was wrong"—Vide David Thomson "Europ since Napoleon" P. 275.

চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি পিডমণ্টের আভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনযোগ দিলেন। তিনি নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি কাজে হাত দিয়াছিলেন। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করেন। সমগ্র দেশে দ্রুত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সামরিক বাহিনীকেও তিনি নতুনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কাভুরের প্রচারকার্য

ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্রচারকার্য শুরু করিয়াছিলেন। বিদেশী সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে তিনি ইওরোপীয় দেশগুলির উদারনৈতিক চেতনাকে ইতালীর পক্ষে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের 'দি টাইমস্' (The Times), মর্নিং পোস্ট' (Morning Post) এবং ফ্রান্সের "লা ম্যাটিন' (La Matin) এবং 'লং ইণ্ডিপেন্দেন্স বেলেগ' (La Indepedence Belge) নামক সংবাদপত্রে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া ইতালীর সমস্যাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) আরম্ভ হইলে বিদেশী শক্তির সাহায্য গ্রহণের স্বর্ণ সুযোগ আসিল এবং কাভুর ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি লা মারমোরা (La Marmora)-র নেতৃত্বে ১৫,০০০ সৈন্য সাহায্যের জন্য পাঠান। যুদ্ধশেষে পুরস্কারস্বরূপ

প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে আসনলাভ

প্যারিসের সন্ধির আন্তর্জাতিক বৈঠকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশগুলির সহিত পিডমণ্টকে সমমর্যাদাপূর্ণ আসন দেওয়া হয়। এই বৈঠকেই ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন লাভ

ইংলণ্ড যদিও ইতালীকে কোন সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাহার কারণ পামারস্টোনের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিয়া ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তিসাম্য বজায় রাখা, তথাপি ইংলণ্ড ইতালীর জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইল।

ইহার কিছুকাল পরে (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে) কাভুর ফরাসীরাজ তৃতীয় নেপোলিয়নের সহিত প্লোম্বিয়ারসের চুক্তি (Pact of Plombiers) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্যাভয় ও নিস নামক দুইটি স্থান লাভের পরিবর্তে তৃতীয়

নেপোলিয়ন আল্পস্ হইতে আড্রিয়াটিক সাগর পর্যন্ত ইতালীর দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনে সামরিক সাহায্য করিবেন। পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া লোম্বার্ডি, ভেনিসিয়া ও পোপের রাজ্যের কতকাংশ অধিকার করিবে। এই চুক্তিতে ইহাও ঠিক হয় যে অস্ট্রিয়া যদি কোন কারণে পিডমণ্টকে আক্রমণ করে তবেই নেপোলিয়ন পিডমণ্টকে সামরিক সাহায্য দিবেন।

তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে প্লোম্বিয়ার্সের চুক্তি

ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর কাভুর পিডমণ্টের সামরিক প্রস্তুতির দিকে মনযোগ দিয়াছিলেন। তিনি কেবল সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন কি করিয়া অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘটান যায়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে এই সুযোগ দেখা দিল। অস্ট্রিয়া পিডমণ্টের সৈন্যবাহিনীকে তিনদিনের মধ্যে ভাঙিয়া দিবার দাবি জানায় এবং পিডমণ্টের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। কাভুর যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সম্ভব হইতে দেখিয়া তিনি সানন্দে বলিয়াছিলেন, "অক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছি।"* নেপোলিয়নের সামরিক সাহায্য দিবার আর কোন বাধা রহিল না। ফলে পিডমণ্টের সাথে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ শুরু হইল। ফ্রান্স পিডমণ্টের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের সামরিক সাহায্যে পিডমণ্ট ম্যাজেন্টা (Magenta) ও সলফেরিনো (Solferino)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। ফলে লোম্বার্ডি পিডমণ্ট ও ফ্রান্সের যুগ্ম বাহিনীর অধিকারে আসিয়াছিল। মিত্রশক্তি যখন এইভাবে জয়লাভ করিতেছিল তখন হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন আকস্মিকভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ার সাথে ভিল্লাফ্রাঙ্কা (Villafranca) নামক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের ইতালীয় নীতি ফ্রান্সের ক্যাথলিক যাজকদের মনঃপূত হয় নাই। ইহা ভিন্ন ফ্রান্সের নিকটে ঐক্যবদ্ধ ইতালী ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও প্রাধান্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই সকল বিবেচনা করিয়াই তৃতীয় নেপোলিয়ন হঠাৎ সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতায় কাভুর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কাভুর ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি বর্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু ইমান্যুয়েল কাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধি স্বাক্ষর করেন এবং এই বিষয়ে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন আপাতত যাহা পাওয়া যায় তাহা ছাড়া উচিত নয়। ভিক্টর ইমান্যুয়েল ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধির পর জুরিক-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া লোম্বার্ডি লাভ করিলে কাভুর পদত্যাগ করেন।

কাভুরের পদত্যাগ

*'The die is cast, and we have made history"—Ketelby, P 226

এদিকে মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলি: পার্মা, মোডেনা, টাসকেনী এবং পোপের রাজ্য রোমানাতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করিয়া সেখানকার শাসকদের বিতাড়িত করে এবং গণ-ভোটের দ্বারা পিডমণ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাভুর এই সকল স্থানের জনসাধারণকে গোপনে উৎসাহ দিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বুঝিয়াছিলেন যে জনগণের মত উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি স্থানের স্বৈরাচারী শাসকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত হইবে না। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষও ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার সৈন্যের সাহায্যে পার্মা, মোডেনা প্রভৃতি স্থানে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের বিরোধিতা করিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় কাভুর প্রধানমন্ত্রী পদে ফিরিয়া আসেন (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি স্যাভয় ও নিস্ এই দুইটি স্থান নেপোলিয়নকে দান করিয়া মধ্য ইতালীর রাজ্যগুলিকে পিডমণ্টের সাথে যুক্ত করিবার নীতি গ্রহণ করেন। পার্মা, মোডেনা, টাসকেনী এবং রোমানাতে গণভোট নেওয়া হয় এবং সেখানকার জনসাধারণ পিডমণ্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিডমণ্ট তখন এই সকল স্থানগুলি অধিকার করিলে ইতালীর ঐক্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

কাভুরের পুনরায় প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ

মধ্য ইতালীর পার্মা, মোডেনা, টাসকেনী রোমানা পিডমণ্টের সাথে যুক্ত

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিসিলিতে তথাকার স্বৈরাচারী রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে এক গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ জাতীয় সমিতি (National Society) নামে একটি সংস্থা দ্বারা সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীরা গ্যারিবল্ডি (Gariboldi) নামে এক বীরের সাহায্যপ্রার্থী হয়। ইতালীর রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসের এই অধ্যায়ের নায়ক হইলেন গ্যারিবল্ডি। গ্যারিবল্ডি বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা' বাহিনী নিয়া সিসিলী জয় করিতে যান। গ্যারিবল্ডি সিসিলী দ্বীপের মার্সেলা (Marsala) বন্দরে সৈন্যবাহিনী লইয়া অবতরণ করেন এবং তিনমাসের মধ্যে সমগ্র সিসিলী অধিকার করেন এবং নিজেকে সমস্ত সিসিলীর সর্বাধিনায়ক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সিসিলী হইতে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তিনি নেপল্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছা মাত্রই নেপলসের জনসাধারণ অত্যাচারী বুরবোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস প্রাণের ভয়ে গেটা (Geata) নামক দুর্গে আশ্রয় নিয়াছিলেন। গ্যারিবল্ডি যুদ্ধ জানিতেন কিন্তু রাজনীতি বুঝিতেন না। তিনি নেপলস্ জয় করিয়া রোম ও ভেনিস জয় করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। কাভুর দুশ্চিন্তায় পড়িলেন কারণ গ্যারিবল্ডি

গ্যারিবল্ডি কর্তৃক সিসিলি ও নেপলস্ জয়

রোম আক্রমণ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং অস্ট্রিয়া একসাথে পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। কাভুর গ্যারিবল্ডিকে রোম আক্রমণ না করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু গ্যারিবল্ডি উহা ভীরুতার নামান্তর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কাভুর এই সময় বলিয়াছিলেন, "ইতালীকে বিদেশী দুর্নীতি এবং উন্মাদ ব্যক্তিদের কবল হইতে অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে।" * তিনি এই সঙ্কটময় অবস্থায় এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। তিনি গ্যারিবল্ডির আক্রমণ হইতে রোম ও পোপকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তর দিক হইতে পোপের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং সহজেই পোপের রাজ্য জয় করিয়া রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে নেপলসে পাঠাইয়াছিলেন। কাভুরের কূটনৈতিক বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়া গ্যারিবল্ডি ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে "ইতালীর রাজা" বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজের সৈন্যবাহিনীকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া পদত্যাগ করেন। রাজা ইমান্যুয়েল তাঁকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু এই নির্লোভ শক্তিশালী ব্যক্তি শুধু একবস্তা শস্যবীজ নিয়া নিজের কৃষিক্ষেত্র কেপরেরা (Caprera) চলিয়া যান। গ্যারিবল্ডি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলিয়া গণ্য হন। ** এরূপ আত্মত্যাগের উদাহরণ ইতিহাসে অল্পই আছে

নেপলস্, সিসিলি ও পোপের রাজ্যগুলিতে গণভোট নেওয়া হয় এবং বিপুল ভোটাধিক্যে ঐ স্থানগুলি পিডমণ্টের সাথে যোগ দান করে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পিডমণ্টের রাজধানী তুরিন (Turin)-এ সংযুক্ত ইতালীর পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিল। ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে ভেনিস ও রোম ভিন্ন সমগ্র ইতালীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহার কিছুদিন পর (১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুন) কর্মক্লান্ত কাভুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বাধীন ইতালী গঠনের মূলে কাভুরের আজীবন চেষ্টা স্মরণীয়।***

নেপলস্, সিসিলি ও পোপের রাজ্যগুলিতে গণভোট এবং পিডমণ্টের সাথে যুক্ত

কাভুরের মৃত্যু

---

* "Italy must be saved from foreigners, evil principles, and madmen" —Ketelby,

("A history of Modern Times" P238.)

**"Like a Norse god, with his giant strength and golden shining hair...... his magnetic power and adventurous sword, the heroic figure of Garibaldi appears and reappears in the Italian history, the strongest personality of the Nineteenth Century"—Ketelby, P. 232.

*** "Italy as a nation is the legacy, the life-work of Cavour"—Quoted by Alison Phillips, Modern Europe, P389

পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক ঘটনায় ভেনিশিয়া ও রোম পিডমণ্টের সাথে যুক্ত হয়। ভেনিশিয়ায় অস্ট্রিয়ার সামরিক বাহিনী মোতায়েন ছিল আর রোমে ছিল ফরাসী বাহিনী। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধে ইতালী প্রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। স্যাডোয়া (Sadowa)-র যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হইলে যুদ্ধশেষে প্রাগের সন্ধি অনুসারে অস্ট্রিয়া ইতালীকে ভেনিশিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

স্যাডোয়ার যুদ্ধে ভেনিশিয়া লাভ

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ঐ যুদ্ধচলাকালীন ফ্রান্স তাহার সৈন্যদল রোম হইতে অপসারণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে ইতালীর সৈন্যবাহিনী রোম দখল করে। ইতালীর রাজধানী রোমে স্থাপন করা হয়। ইতালীর অধিবাসীদের বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এবং জাতীয় ঐক্য এইভাবে সম্পূর্ণ হয়।

সেডানের যুদ্ধে রোম নগরী লাভ

ইতালীর স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ

জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন (German Unification)

ইতালীর ন্যায় জার্মানীও ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে একটি ভৌগোলিক নাম (geographical expression)-এ পরিচিত ছিল। প্রায় দুই শতেরও অধিক ক্ষুদ্র রাজ্যে জার্মানী বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলি পবিত্র রোমান সম্রাটের (Holy Roman Emperor) অধীনে ছিল। নেপোলিয়ন যখন জার্মানী জয় করেন তখন তিনি এই অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পরিবর্তে ঊনচল্লিশটি বৃহৎ রাজ্য গঠন করেন। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিলোপ করিয়া এই ঊনচল্লিশটি রাজ্য লইয়া 'কনফেডারেশন অব-দি-রাইন' (Confederation of the Rhine) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাপন করেন। নেপোলিয়নের অধীন থাকাকালীন জার্মানীর অধিবাসীরা নিজেদের এক জাতি হিসাবে ভাবিতে শিখিয়াছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামেও (War of Liberation) জার্মানীর জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিবার ফলে সমগ্র জার্মানীর অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ভিয়েনা কংগ্রেসের পূর্বে জার্মানীর অবস্থা

কিন্তু ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মান জাতির ঐক্যের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া জার্মানীতে ঊনচল্লিশটি রাষ্ট্রের একটি শিথিল রাষ্ট্রসংঘ (loose Confederation) গঠন করে এবং এই রাষ্ট্রসংঘকে অস্ট্রিয়ার অধীনে স্থাপন করে। এই

রাষ্ট্রগুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ডায়েট (Diet) বা কেন্দ্রীয় সভা স্থাপিত হয়। অস্ট্রিয়া এই কেন্দ্রীয় সভার সভাপতি এবং প্রাশিয়া সহ-সভাপতি হয়। এই কেন্দ্রীয় সভার দুইটি কক্ষ ছিল— ক্ষুদ্র সভা ('narrower' assembly) এবং সাধারণ সভা (general assembly)। ক্ষুদ্রসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭ জন, উহার মধ্যে ১১টি বৃহৎ রাষ্ট্র হইতে ১১জন এবং বাকি ২৮টি রাষ্ট্র হইতে মোট ৬জন সভ্য গ্রহণ করা হইত। সাধারণ সভায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির চারিটি করিয়া ভোট, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির একটি করিয়া এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি দুই অথবা তিনটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। সাধারণ সভায়ই জরুরী বিষয় নিয়া আলোচনা করিত এবং সর্বসম্মত না হইলে কোন মৌলিক আইনের পরিবর্তন, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ধর্ম বিষয়ে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইত না। ফলে শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব ছিল না। মেটারনিক কর্তৃক পরিচালিত অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলেই জার্মানীর ঐক্য সম্পাদনের কোন চেষ্টার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না। ইহা ভিন্ন জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষভাব থাকায় কোনপ্রকার ঐক্য আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব ছিল না। কয়েকটি রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিলোপ করিয়া প্রাশিয়ার অধীনে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিল। অপর কয়েকটি রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার অধীনে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী ছিল।

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জার্মানীর ব্যবস্থা: উনচল্লিশটি রাষ্ট্রের শিথিল রাষ্ট্রসংঘ

এই অবস্থায় কোন প্রকাশ্য আন্দোলন সম্ভব না হওয়ায় জার্মানীর নানাস্থানে গুপ্তসমিতি স্থাপিত হয়। এই গুপ্তসমিতিগুলির মধ্যে বুরচেনচেফট (Buoschenschaft) সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে লিপ্‌জিগ (Leipzig)-এর যুদ্ধজয়ের চতুর্থ বার্ষিক যুব উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়াশীলদের লিখিত পুস্তক পোড়াইয়াছিল। এই ঘটনার দুই বৎসর পর (১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ) ফন্ কট্‌জেবু (Von Kotzebue) নামে একজন প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যকারকে হত্যা করা হইলে মেটারনিক জার্মানীতে উদার নৈতিক আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 'কার্লস্‌বাড্ ডিক্রি' (Carlsbad Decrees) নামে কতকগুলি কঠোর আইন পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখা, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, গুপ্তসমিতিগুলি নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কার্লসবাড্ আদেশসমূহ প্রায় দশ বৎসর ব্যাপী জার্মানীতে দমননীতি অব্যাহত রাখে। এমন অবস্থায় জার্মানীর জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে শুধু জার্মানীর হেসি,

গুপ্তসমিতি স্থাপন: বুরচেনচেফট সমিতি

কট্‌জেবু হত্যা

কার্লসবাড্ ডিক্রি

জুলাই বিপ্লবের প্রভাব

ইওরোপ-

হেনোভার স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যে উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থা চালু করা হয় কিন্তু মেটারনিকের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এই শাসনতন্ত্রগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

(পরবর্তী আঠার বৎসর (১৮৩০-৪৮) জার্মানীর কোন স্থানেই প্রগতিশীল আন্দোলন সাফল্য লাভ না করিলেও পরোক্ষভাবে জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের পথ প্রস্তত হইতেছিল। ভবিষ্যতে জার্মানীর ব্যাপক আন্দোলনের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল।*) দুইটি ভিন্নমুখী প্রবাহ জার্মান জাতিকে ঐক্যের পথে লইয়া যাইতেছিল; একটি হইল প্রাশিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জোলভারেন্ (Zollverin) নামক শুল্ক-সংঘ; অপরটি প্যান-জার্মানিজম্ (Pan-Germanisum) বা জার্মান জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐক্য চেতনার সঞ্চার।

পরোক্ষভাবে জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংস্কারক মাসেন (Maassen)-এর উদ্যোগে প্রাশিয়া প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সহিত এক শুল্ক-সংঘ (Customs' Union) স্থাপন করে। এই সংঘের সদস্য-রাজ্যগুলির মধ্যে এক অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করা হয়। এই সংঘে জার্মানীর অপরাপর রাজ্যগুলি যেমন বেভেরিয়া, উরটেমবার্গ, স্যাক্সনি ক্রমে ক্রমে যোগদান করে। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অস্ট্রিয়া ভিন্ন জার্মানীর প্রায় সকল রাজ্যগুলিই এই সংঘের সদস্য হয়।

জোলভারেন (Zollverein)

জার্মানীর ইতিহাসে জোলভারেনের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত, এই শুল্ক-সংঘের মাধ্যমে জার্মানীর রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান ও ঐক্যের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, শুল্ক-সংঘের অর্থনৈতিক একতা জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভব হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া ছাড়া যে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভব তাহা জোলভারেনই প্রমাণ করে এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব সম্বন্ধে জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছিল।

জোলভারেনের গুরুত্ব

জার্মান মনীষীরা তাঁহাদের লেখনীর মাধ্যমে ঐক্যের জন্য যে ভাব মানস তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহাকেই প্যান-জার্মানিজম বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

* The attentive listener might have heard the hum of mighty workings."
—Ketelby, P. 180-181.

জার্মান জাতির মধ্যে এক মানসিক পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। এই সময় জার্মানীতে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ও কাব্যের অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ফিক্টে (Fichte), হেগেল (Hegel), স্টাইন (Stein), ডাহ্‌লম্যান (Dahlmann), হসার (Hausser) এবং বোহ্‌মার (Bohmer) প্রভৃতি মনীষিগণ জার্মানীতে এক নব জাগরণের সৃষ্টি করেন। জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেমন মিউনিক্, লিপজিগ, বন ও বার্লিন এই নব জাগৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল। এই জার্মান মনীষীরা জার্মান জাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পান-জার্মানিজম (Pan-Germanism)

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব জার্মানীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এক গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তামূলক অন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বেভেরিয়া, স্যাক্সনি, ব্যাডেন, হেনোভার, শ্লেজভিগ্ হল্‌স্টেন প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শাসকদের শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিতে বাধ্য করে। প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মও এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জার্মানিতে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাব

জার্মানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারিগণ এই সময় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এক প্রতিনিধি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই প্রতিনিধিসভাকে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট (Frankfurt Parliament) বলা হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জার্মানীর জন্য একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রচনা করা।* কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের আইনজীবী ও অধ্যাপক সদস্যগণের জার্মান জাতির মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) এবং জার্মানীর রাজ্যসীমার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দীর্ঘ এক বৎসর সময় নষ্ট করেন। এই বিলম্ব করার ফলে পার্লামেণ্টের সদস্যরা যখন প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সম্রাট হইবার জন্য আহ্বান করে তখন অস্ট্রিয়ার দ্বারা প্ররোচিত হইয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট

চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও জার্মান

* অস্ট্রিয়া যখন আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দমনে ব্যস্ত, প্রাশিয়া এবং জার্মান রাজ্যের অপর স্বৈরাচারী শাসকগণ যখন বিপ্লবীদের ভয়ে ভীত, তখন শতধা-বিচ্ছিন্ন জার্মানীর শাসনতান্ত্রিক ঐক্য-সাধন সহজ ছিল।

ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি স্যাক্সনি, হ্যানোভার, ওয়ার্টেমবার্গ ও বেভেরিয়া এই কয়েকটি রাজ্যের সহায়তায় ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়া এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়া এককভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহস পায় না। ফলে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে ওলমুজের চুক্তি (Convention of Olmutz) দ্বারা প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

ওলমুজের চুক্তি

ওলমুজের চুক্তি প্রাশিয়ার পক্ষে এক অপমানজনক চুক্তি। এই অপমানের জন্য দায়ী ছিল প্রাশিয়ার সামরিক শক্তির দুর্বলতা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্ভব নয় বলিয়া পরবর্তিকালে বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে জার্মানীর ঐক্য সম্পন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়মের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতা প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে প্রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তিনি প্রাশিয়াকে জার্মানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে প্রাশিয়ার সৈন্য-বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার পার্লামেণ্ট ব্যয়াধিক্যের অজুহাতে তাঁহার এই কাজে বাধা দিয়াছিল। ফলে প্রাশিয়ায় এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় উইলিয়ম বিরক্ত শেষ চেষ্টা হিসাবে হইয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সামরিক মন্ত্রী ফন রুন (Von Roon) ও প্রধান সেনাপতি ফনমলটকের (Von Moltke) পরামর্শে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে অটো ফন বিসমার্ককে (Otto Von Bismarck) প্রধানমন্ত্রী (Minister-President) পদে নিযুক্ত করেন।

ঐক্য আন্দোলনের নতুন পর্যায়

প্রথম উইলিয়মের সিংহাসনে আরোহণ

বিসমার্ক

বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত

রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে বিসমার্কের ধারণা ছিল স্পষ্ট এবং দৃঢ়। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন জার্মানীর ঐক্য সম্পাদন বক্তৃতা দ্বারা বা আইনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা সম্ভব নয়। ইহা সম্ভব একমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারাই।* বিসমার্ক বিশ্বাস করিতেন রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি সম্ভব। রাজতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রাশিয়ার উন্নতি এতদিন সম্ভব হইয়াছে। অতএব প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অধীনে সমগ্র জার্মানীকে একতাবদ্ধ করাই ছিল বিসমার্কের উদ্দেশ্য। এইজন্য জার্মানী হইতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য বিলোপ করা প্রয়োজন। বিসমার্ক উপলব্ধি করিলেন অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর নেতৃত্ব হইতে সরাইতে হইলে যুদ্ধ প্রয়োজন। সুতরাং সামরিক শক্তি সঞ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিসমার্ক প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভার বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাশিয়ার প্রতিনিধি সভার নিম্নকক্ষ প্রতি বৎসরই বাজেট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আইনবহির্ভূত উপায়ে অর্থ আদায়ের দ্বারা প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী বিসমার্ক পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। সামরিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে বিসমার্ক তাঁহার "Blood and iron" নীতি প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ছয় বৎসর মধ্যে (১৮৬৪-৭০) তিনি ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া জার্মানীর ঐক্যসাধন করিয়াছিলেন।

বিসমার্কের নীতি ও উদ্দেশ্য

ডেনমার্কের সহিত যুদ্ধ (১৮৬৪)—শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যা (Schlesuvig-Holstein Question):

শ্লেজ্‌ভিগ্‌-হল্‌স্টাইন্‌ সমস্যার মাধ্যমে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্য সাধনের প্রথম সুযোগ পাইলেন। এই দুইটি স্থান ছিল ডেনমার্কের অধীন কিন্তু হল্‌স্টাইন্‌ ছিল জার্মান কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের লণ্ডন প্রোটোকোল (London Protocal) দ্বারা স্থির হয় যে এই দুইটি স্থান ডেনমার্কের শাসনাধীন থাকিলেও তাহাদের ডেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্কের পার্লামেন্ট এক নূতন শাসনতন্ত্র দ্বারা এই দুই স্থানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিল এবং এই দুই স্থানকে ডেনমার্কের সহিত যুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করিল। এই ঘোষণার ফলে সমগ্র জার্মানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল; কারণ এই দুইটি

* "The great questions of the day will not be decided by speeches and majority resolutions (that was the blunder of 1848 and 1849) but by blood and iron"—Ketelby, 'History of Modern Times', p 252.

অঞ্চলে বহুসংখ্যক জার্মান বাস করিত। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া যৌথভাবে এই দুইটি অঞ্চল সংযুক্ত করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য ডেনমার্ককে নির্দেশ দিয়াছিল। ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিল তখন অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত বাহিনী ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ)। ডেনমার্ক পরাজিত হইল এবং ঐ বৎসরই ভিয়েনার চুক্তি দ্বারা শ্লেজ্উইগ্-হল্স্টাইনের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের গেস্টাইনের চুক্তি (Convention of Gastein) দ্বারা ঠিক হয় যে শ্লেজউইগ ও হলস্টাইনে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম অধিকার থাকিবে কিন্তু হলস্টাইন থাকিবে অস্ট্রিয়ার শাসনে এবং শ্লেজউইগ থাকিবে প্রাশিয়ার অধীনে। প্রাশিয়ার এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত হলস্টাইনের শাসনভার দেওয়া হয় অস্ট্রিয়াকে। ভবিষ্যতে যাহাতে অস্ট্রিয়ার সাথে বিবাদ করা যায় সেদিকে নজর রাখিয়াই বিস্মার্ক এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন সাময়িকভাবে কাগজ দিয়া অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সম্পর্কের ফাটল বন্ধ করা হইয়াছে।*

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬) (Anstro-Prussian War) :

গেস্টাইনের চুক্তি স্থায়ী হইবে না মনে করিয়া লইয়া বিসমার্ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিসমার্ক মনে করিতেন যে জার্মানী হইতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত না করিলে জার্মানীর ঐক্য সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পূর্বে তিনি অস্ট্রিয়াকে নিবান্ধব করিলেন। প্রথমে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে বিয়ারিজ (Biarritz) নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ইতালীকে ভেনিশিয়া প্রাপ্তির লোভ দেখাইয়া নিজপক্ষে আনিয়াছিলেন। রাশিয়ার সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এইভাবে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিবান্ধব করিয়া বিস্মার্ক যুদ্ধ করিবার সুযোগ খুঁজেন। ইতিমধ্যে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়া শ্লেজউইগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি জার্মান প্রতিনিধি সভার (Diet) নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। বিস্মার্ক অস্ট্রিয়ার এই আচরণকে গেস্টাইন চুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে হলস্টাইনে সৈন্য পাঠাইয়া স্থানটি দখল করিয়া নিয়াছিলেন। ইহাতে অস্ট্রিয়া প্রতিনিধি সভায় প্রস্তাব করে যে সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলির সৈন্যবাহিনী প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাঠান হউক। ইহার উত্তরে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রাশিয়ার সেনানায়ক মোল্টক (Moltke)-এর সমর কৌশলে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রিয়া স্যাডোয়া বা কনিগ্র্যাৎস্ (Sadowa

* "We have papered over the cracks" said Bismark. Ketelby p 263.

or Koniggratz) নামক যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধকে এই জন্য 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' (Seven Weeks' War) বলা হয়। প্রাগের

প্রাগের সন্ধি (Treaty of Prague)

সন্ধি (Treaty of Prague) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। অস্ট্রিয়াকে কোন স্থান হারাইতে হয় নাই বা তাঁহার নিকট হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় নাই। তাহার কারণ বিস্মার্কের নীতি ছিল আস্ট্রিয়াকে বন্ধুভাবাপন্ন রাখা যাহাতে ভবিষ্যতে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাহায্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু অস্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হয় এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিয়া নিতে হইয়াছিল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি 'উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রিয়া ইতালীকে ভেনিসিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এমন কি ইওরোপের ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রথমত, অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে মধ্য ইওরোপের শক্তিসাম্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল। প্রাশিয়া ইওরোপের ইতিহাসে এক নতুন মর্যাদা পাইয়াছিল। প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। মধ্য ইওরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েনা হইতে বার্লিনে সরিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া প্রাশিয়াকে জার্মানীর ঐক্যপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। ফলে তাহার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহু পরিমাণ কমিয়া যায়। ফরাসী জাতি স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় বলিয়া মনে করিয়াছিল। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে ইতালির

স্যাডোয়া যুদ্ধের গুরুত্ব

ঐক্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র রোম ও ট্রেনটিনো (Trentino) ইতালির বাহিরে ছিল। তৃতীয়ত, প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসেও এই যুদ্ধের গুরুত্ব নেহাত কম নয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ বিসমার্কের নীতির সাফল্যের এক চমকপ্রদ নিদর্শন হিসাবে ধরা হয়। ফলে বিসমার্কের প্রতি জার্মান জাতির আনুগত্য ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। সর্বশেষে এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয় এবং ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দ্বৈতরাজ্য (Dual Monarchy) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল কারণের জন্য স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইওরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বলা হইয়া থাকে।

ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ, ১৮৭০ (Franco-Prussian War): ফ্রান্স ও

প্রাশিয়ার যুদ্ধের প্রকৃত কারণ আমরা ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিজয়ের মধ্যেই দেখিতে পাই। অস্ট্রিয়ার পরাজয় এবং প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিবৃদ্ধি মধ্য ইওরোপের শক্তিসাম্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ইহাতে এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসী জাতির নিকট ফ্রান্সের পরাজয়ের সামিল বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। * ফলে পরবর্তী চারিবৎসর (১৮৬৬-৭০ খ্রীস্টাব্দ) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবেই।

যুদ্ধের কারণ

বিসমার্কও এবিষয়ে তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে জার্মানীর ঐক্য সাধনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।** কারণ প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সহিত দক্ষিণ জার্মানীর অংশগুলির সংযুক্তি ফ্রান্স কখনও ঘটিতে দিবে না। সুতরাং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধের বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া বিসমার্ক এমন অবস্থায় সৃষ্টি করিতে চাহিলেন যাহাতে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইরূপ করিতে পারিলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মনে প্রাশিয়া আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইয়াছে এই ধারণা সৃষ্টি হইবে। ইহা ছাড়াও দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর-জার্মানীর সহিত যুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় জাতীয়তাবোধ জাগাইবার জন্য ফ্রান্স কর্তৃক প্রাশিয়া আক্রান্ত হইয়াছে এই অবস্থা সৃষ্টি করা বিস্‌মার্ক উচিত মনে করিয়াছিলেন। এই সময়ে (১৮৭০) খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন গ্রামোণ্টের ডিউক (Duke of Gramont)। তিনি প্রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। রাজনৈতিক হিসাবেও তাহার দূরদৃষ্টি বা বিচক্ষণতা বেশী ছিল না। ফলে বিস্‌মার্ক এবং গ্রামোণ্টের মধ্যে যুদ্ধের কারণ খুঁজিতে বেশী দেরী হইল না।

যে ঘটনা উপলক্ষ করিয়া প্রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহা হইল স্পেনের উত্তরাধিকারের সমস্যা। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের ফলে স্পেনের রাণী ইসাবেলাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়। স্পেনের সাময়িক সরকার (Provisional Government) প্রাশিয়ার রাজবংশোদ্ভূত যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে স্থাপন করিতে চাহিল।

* "It was France who was defeated at Sadowa"—Thiers Vide Ketellby P. 2·1

** "That a war with France would succeed the war with Austria lay in the logic of history" —Bismark, Vide Hazen. P.226.

কিন্তু ফ্রান্স ইহার বিরোধিতা করিয়াছিল। গ্রামোণ্ট ফ্রান্সের আইন সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে লিওপোল্ডের সিংহাসনে আরোহণ ফ্রান্সের স্বার্থের পরিপন্থী এবং ফ্রান্স ইহা কখনও মানিয়া লইবে না। এইরূপ অবস্থায় লিওপোল্ড নিজ দাবি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ফলে সাময়িকভাবে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার বিবাদের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। কিন্তু বিসমার্ক এই পরিস্থিতি পছন্দ করিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিয়া জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ করা। বিসমার্কের অনুরোধে স্পেন সরকার পুনরায় লিওপোল্ডকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ জানাইল। বিসমার্কের কূটকৌশলে লিওপোল্ড এইবার স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু ফরাসী জাতির মধ্যে এই বিষয় লইয়া এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। গ্রামোণ্ট লিওপোল্ডের স্পেনের সিংহাসন লাভে বাধাদান করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ফরাসী সরকার বার্লিনে অবস্থিত ফরাসী দূত কাউণ্ট বেনিদিত্তিকে (Count Beneditti) রাজা উইলিয়মের নিকট এই দাবি উত্থাপন করিতে বলিল যে তিনি যেন লিওপোল্ডের স্পেনের সিংহাসন আরোহণ সমর্থন না করেন। বেনিদিত্তি এমস্ (Ems) নামক স্থানে রাজা প্রথম উইলিমের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং লিওপোল্ডের সিংহাসন আরোহণ প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রথম উইলিয়ম তাহার আত্মীয় লিওপোল্ডের সিংহাসন আরোহণে বাধা দিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি ফরাসী দূতকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৩ই জুলাই ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী রাজদূতের সাথে প্রাশিয়ার রাজার এই সাক্ষাৎকার টেলিগ্রামে বিসমার্ককে জানান হয় এবং তাঁহাকে ইহা সংবাদপত্রে ছাপাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঐদিন রাত্রিতে বিসমার্ক যখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুন (Roon) ও জেনারেল মোল্টক (Moltke) এর সাথে সান্ধ্যভোজনে বসিয়াছেন তখন রাজা উইলিয়মের টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট পৌঁছে। বিস্মার্ক মোল্টক ও রুনের সাথে পরামর্শ করিয়া এমস্ টেলিগ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবেন স্থির করিলেন। এইভাবে বাদ দিয়া এমস্ টেলিগ্রাম প্রকাশ করিলে ফ্রান্সের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিবে এবং যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে বিস্মার্কের এইরূপ আশা ছিল। পরের দিন পরিবর্তিত এমস্ টেলিগ্রাম প্রাশিয়ার এবং ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইল। মূল টেলিগ্রামের কতক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশ করিবার ফলে উহার অর্থ এইরূপ হইল যে, বেনিদিত্তি প্রাশিয়ার রাজার নিকট হইতে হোহেঞ্জলার্ণ পরিবার কোনকালেই স্পেনের সিংহাসন দাবি করিতে পারিবে না এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে গিয়া অপমানিত হইয়াছেন।

স্পেনের উত্তরাধিকারের সমস্যা

এমস্ টেলিগ্রাম

এই টেলিগ্রাম প্রকাশের ফলে ফ্রান্সের সর্বত্র প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি উঠিল। ইহাই বিস্‌মার্কের অভিপ্রেত ছিল। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকিলেও জনসাধারণের যুদ্ধের দাবি এবং গ্রামোণ্টের যুদ্ধ ঘোষণার আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ১৫ই জুলাই, ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানীতে এই যুদ্ধ ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। দক্ষিণ জার্মানীর রাজ্যগুলিও ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রাশিয়ার রাজার নিকট লিওপোল্ডের স্পেনীয় উত্তরাধিকার সমর্থন না করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের চেষ্টাকে অন্যায় আচরণ বলিয়া মনে করিয়াছিল। বিসমার্কের কূটনৈতিক চালে তৃতীয় নেপোলিয়নের ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। উপরন্তু বিসমার্ক এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফ্রান্স বেলজিয়াম দখল করিতে চায় এরকম প্রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক সন্ধির খসড়া বিস্‌মার্ক প্রকাশ করেন যাহার ফলে ইংলণ্ড অসন্তুষ্ট হয় এবং নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করে। ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার মিত্রতা আশা করিয়াছিল কিন্তু বিস্‌মার্ক পূর্বেই রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন ফলে রাশিয়া অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিবে ভয় দেখাইলে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিল। ইটালীও রোম লাভ করিবার আশায় একই নীতি অবলম্বন করিয়াছিল।

এইভাবে ইওরোপে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়া ফ্রান্স একটি অতি উত্তম প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। উপরন্তু ফরাসী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুতও ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হইতে লাগিল। ওয়ার্থ (Worth), স্পিকেরেন্ (Spicheren), গ্রাভেলোৎ (Gravelothe) এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যবাহিনী প্রাশিয়ার হস্তে উপর্যুপরি পরাজিত হয়। প্রাশিয়ার সেনাপতি মোল্টকের সমরকৌশলে ফ্রান্সের সেনাপতি ম্যাক্‌মেহন (Mac Mahon) বারবার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং অবশেষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের (Sedan) যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।* পরদিন ফরাসী সৈন্যবাহিনী জার্মান বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বয়ং বন্দী হন। এই সংবাদ ফ্রান্সে পৌছিবার সাথে সাথে এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। প্যারিসের জনতা গেম্বেটা

সেডানের যুদ্ধ

*"Sedan was the greatest military debacle since Waterloo". Ketelby P 291.

(Gambetta), জুলে ফেবার (Jules Fabre) এবং জুলেফেরীর (Jules Ferry) নেতৃত্বে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়া পুনরায় ফ্রান্সকে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করে; এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভার্সাই-এর সন্ধি নামে এক প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধির শর্ত

অবশেষে ঐ বৎসর মে মাসে ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি (Treaty of Frankfurt) দ্বারা দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স প্রাশিয়াকে আলসেস্ ও লোরেন এবং ইহাদের অন্তর্গত মেৎস (Metz) দুর্গটি ও স্টাস্‌বার্গ (Strasburg) হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনবৎসরের মধ্যে পাঁচশত কোটি ফ্রাঁ দিতে স্বীকৃত হয়। যতদিন না ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ততদিন প্রাশিয়ার এক সামরিক বাহিনী ফ্রান্সের খরচে ফ্রান্সে অবস্থান করিবে এই ব্যবস্থা করা হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল ইওরোপের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। প্রথমত, এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সে শুধু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল না, ফ্রান্স হইতে রাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য বিদায় নিল এবং প্রজাতন্ত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ফ্রান্স হইতে আলসেস-লোরেন কাড়িয়া নিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ফ্রান্সের অধিবাসীরা জার্মান বিদ্বেষী হয়। ফ্রান্স তাহার পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারিল না যাহার ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে জার্মানীর ঐক্য সাধন সম্পূর্ণ হয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে নূতন জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী জার্মানীর রাজন্যবর্গ ও সেনানায়কদের সম্মুখে ভার্সাই রাজপ্রাসাদে প্রথম উইলিয়াম জার্মানীর সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হন।

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্স রোম হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ করিলে ইতালি রোম দখল করে। ফলে ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।

চতুর্থত, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সুযোগ নিয়া রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের প্যারিস সন্ধির শর্তগুলি ভাঙ্গিতে সাহসী হন। তিনি কৃষ্ণসাগরে পুনরায় রাশিয়ার নৌশক্তি বৃদ্ধি করেন এবং সিবাস্টোপোলের (Sebostopol) দুর্গ সুরক্ষিত করেন। ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যা (Near Easern Question) পুনরায় জটিল হইয়াছিল।

এইভাবে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ইওরোপের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা

করে। এই যুদ্ধ ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য। ইহার ফলে ইওরোপের রাজনীতি ভবিষ্যতে অনেকটা যুদ্ধভীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতির ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল এবং কূটনীতিকে ইওরোপের শান্তি রক্ষার জন্য ব্যবহার না করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়াছিল।*

* "The governments of great powers were dedicated to war as an effective instrument of natoinal policy ; and to diplomacy as a means not of keeping the peace······but of preparing and timing hostilities so as to yield the maximum advantages"—David Thomson, "Europe since Napoleon", P 298

অনুশীলনী

1. Discuss the nature of the Eastern Question at the time of the outbreak of the Crimean War.

(ক্রিমিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে নিকট প্রাচ্য সমস্যাটি কি রকম ছিল আলোচনা কর।) (পৃঃ ৫৯-৬০)

2. What were the causes of the Crimean War and what were its effects ?

(ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল কি কি?) (পৃঃ ৬০-৬৫)

3. Discuss the circumstance in which the Second Empire came into existence.

(কি পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়া ছল আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬৫-৬৬)

4. Describe the home policy of Napoleon III.

(তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতি বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৬৬-৬৮)

5. Give an account of the foreign policy of Napoleon III.

(তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬৮-৭১)

6. Estimate the services of Mazzini and Cavour to the cause of Italian Unification.

(ইতালীর ঐক্য আন্দোলনে ম্যাৎসিনি এবং কাভুরের অবদানের মূল্যায়ন কর।) (পৃঃ ৭২-৭৯)

7. "Cavour was the maker of modern Italy"—Explain.

("কাভুরকে বর্তমান ইতালীর নির্মাতা বলা যায়"—ব্যাখ্যা কর।) (পৃঃ ৭৫-৭৯)

8. What part did Garibaldi play in the struggle for Italian Liberation ?

(ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্যারিবল্ডির কি ভূমিকা ছিল?) (পৃঃ ৭৮-৮০)

9. Discuss in brief the history of the German Unification.

(সংক্ষেপে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা কর।) (পৃঃ ৮০-৯১)

10. How did Bismark bring about the unification of Germany ?

(কিভাবে বিসমার্ক জার্মানীর ঐক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৮৪-৯১)

নবম অধ্যায়

ইওরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ ও মৈত্রী নীতি

(Major European States and the System of Alliances)

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধের অবসানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের ঘটনাবলী ইওরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করিয়াছে উহারা হইল জার্মানী ফ্রান্স এবং রাশিয়া।

বিসমার্ক এবং দ্বিতীয় উইলিয়ামের শাসনাধীনে জার্মানী (Germany under Bismarck and William II)

বিসমার্কের অধীনে জার্মানী (১৮৭১-১৮৯০): ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীই ইওরোপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল।* ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাজ্য সংগঠন করিয়া বিসমার্ক ১৮৭১-১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসর তিনি পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ইওরোপের রাজনীতির নিয়ামক স্বরূপ ছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী নীতি গ্রহণ করেন। জার্মানীর ঐক্য সম্পাদন করিবার জন্য সেডানের যুদ্ধ পর্যন্ত বিসমার্কের যুদ্ধনীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু জার্মানীর ঐক্যসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা এবং জার্মান সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য

(ক) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ হইতে বিসমার্কের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সকে নির্বান্ধব অবস্থায় রাখা এবং অপরদিকে জার্মানীর মিত্রশক্তি বৃদ্ধি করা। ফ্রান্সের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াই জার্মানীর ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব ফ্রান্স এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ খুঁজিবে এই আশঙ্কা করিয়া বিসমার্ক কূটনৈতিক নীতিদ্বারা ফ্রান্সকে ইওরোপে মিত্রহীন

(খ) ফ্রান্সকে নির্বান্ধব রাখা

*"Germany was accounted a dominant state of Europe from 1871 to the 1914 War." —Ketelby, "History of Modern Times," P358

করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিস্মার্ক জার্মানী একটি "পরিতৃপ্ত দেশ" (Satiated Country) অর্থাৎ জার্মানীর পক্ষে আর রাজ্যবৃদ্ধি প্রয়োজন নাই ইহা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সাথে সাথে ফ্রান্স যেন যুদ্ধ সৃষ্টি না করিতে পারে সেইজন্য ইওরোপীয় প্রধান রাষ্ট্রগুলির সাথে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। স্যাডোয়ার যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার প্রতি তিনি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে অস্ট্রিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ছিল। অপর দিকে রাশিয়াও তাঁহার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। ফলে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বার্লিনে জার্মানী, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার এক বৈঠক ডাকিলেন এবং কূটনীতিদ্বারা অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই দুই পরস্পরবিরোধী দেশকে জার্মানীর সহিত এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করাইলেন। এই চুক্তিকে 'ড্রেইকাইজারবুণ্ড' (Dreikaiserbund) বা 'তিন সম্রাটের চুক্তি' বলা হয়। এই চুক্তি বার্লিন কংগ্রেস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসে বিস্মার্কের সভাপতিত্বে ইউরোপীয় শক্তিগুলি রাশিয়াকে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্যান স্টিফানো (Treaty of San Stephano) সন্ধির দ্বারা লব্ধ সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ইহার ফলে রাশিয়া বিস্মার্কের উপর অসন্তুষ্ট হইল এবং তিন সম্রাটের চুক্তি পরিত্যাগ করিল।

জার্মানী পরিতৃপ্তদেশ বলিয়া ঘোষণা

Dreikaiserbund বা তিন সম্রাটের চুক্তি

কিন্তু কূটনৈতিক বিস্মার্ক ইহাতে ভীত না হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর শক্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার সহিত একটি দ্বি-শক্তি চুক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯)। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

Dual Alliance বা দ্বি-শক্তি চুক্তি

তিন বৎসর পর বিস্মার্ক ফ্রান্সকে টিউনিস্ (Tunis) নামক স্থানটি দখল করিতে উৎসাহিত করিলে ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধিতার সুযোগ লইয়া বিস্মার্ক ইতালীকে বহুদিনের শত্রু অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Dual Alliance)-তে যোগদান করিতে স্বীকার করাইলেন। ফলে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি ত্রি-শক্তি চুক্তিতে (Triple Alliance)-এ পরিণত হইল। এই চুক্তির দ্বারা জার্মানী, ইতালি ও অস্ট্রিয়া এই তিনটি দেশ ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে পরস্পরকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

Triple Alliance ত্রিশক্তি চুক্তি

ইংলণ্ডের সাথেও বিসমার্ক বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের

মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জার্মানী উপনিবেশ চায় না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহাতে একদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে জার্মানীর সাথে ইংলণ্ডের সম্পর্ক মধুর হয়।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে সাময়িকভাবে বিসমার্ক তিন সম্রাটের চুক্তি (Dreikaiserbund) পুনঃস্থাপন করিতে সক্ষম হন কিন্তু ১৮৮৪-৮৫ খ্রীস্টাব্দে উহা ভাঙ্গিয়া যায়। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। বিসমার্ক দেখিলেন যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অস্ট্রিয়ার মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানীর বিরুদ্ধেও রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ছাড়া রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। এইসব বিবেচনা করিয়া বিসমার্ক কূটকৌশল দ্বারা রাশিয়াকে জার্মানীর সহিত রি-ইনসিওরেন্স (Reinsurance Treaty) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করাইতে সক্ষম হইলেন। এই চুক্তি দ্বারা তৃতীয় কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে রাশিয়া বা জার্মানী পরস্পর সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা (Benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল।

Reinsurance Treaty বা রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি

এইভাবে বিসমার্ক বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে প্রথমত, অস্ট্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতা; দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নিরপেক্ষতা তৃতীয়ত, ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ইতালির সহায়তা; এবং চতুর্থত, রাশিয়া ও ফ্রান্সের যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও ইতালির সাহায্যলাভের ব্যবস্থা করিলেন।

কূটকৌশল নীতিকে বিসমার্ক শিল্পে পরিণত করেন

দীর্ঘ কুড়ি বৎসর (১৮৭১-৯০ খ্রীস্টাব্দে) জার্মানীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইওরোপীয় শক্তিগুলিকে এমন এক জটিল চুক্তির জালে তিনি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন যাহার ফলে ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের কোন সুযোগ পাইল না। ইওরোপের শান্তিও নষ্ট হইল না। রাজনীতি এবং কূটকৌশলকে তিনি শিল্পে পরিণত করিয়াছিলেন যাহার প্রধান শিল্পী তিনি নিজে ছিলেন। একমাত্র বিসমার্কই যাদুকরের মত চাতুরি দ্বারা অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই পাঁচটি দেশের তিনটিকে নিজপক্ষে রাখিতে এবং অপর দুটিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।* তাঁহার সময়ে বার্লিন

বার্লিন ইউরোপের রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত

---

*"He was the only man who could juggle with five balls of which at least two were always in the air" —Vide Ketelby P.362

ইওরোপের রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং জার্মানী তখন ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দেশরূপে স্বীকৃত হয়।

ইহা মনে রাখিতে হইবে বিস্মার্ক যতদিন জার্মানীর চ্যান্সেলার-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিনই তিনি মিত্রতামূলক চুক্তির দ্বারা ইওরোপের শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পদত্যাগের পরেই তাঁহার স্থাপিত মৈত্রী-নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। তাহার কারণ প্রথমত, তাঁহার জটিলতাপূর্ণ মিত্রতাচুক্তি বিসমার্কের ন্যায় কূটকৌশলী যাদুকরভিন্ন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। বিসমার্কের পদত্যাগের পরবর্তী চব্বিশ বৎসরের (১৮৯০-১৯১৪) চারিজন চ্যান্সেলারের মধ্যে কেহই বিস্মার্কের ন্যায় কূটকৌশলী ছিলেন না। ফলে বিসমার্ক স্থাপিত মৈত্রী চুক্তি লোপ পাইল।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিস্মার্ক দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি জার্মান সাম্রাজ্যকে সুসংহত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত করিতে সর্বদা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। সাম্রাজ্যের কার্যনির্বাহক বিভাগ সম্রাট ও তাঁহার চ্যান্সেলারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল। চ্যান্সেলার তাঁহার কার্যাবলীর জন্য সম্রাটের নিকট দায়ী ছিলেন। কেন্দ্রীয় দুইটি আইনসভা ছিল। একটির নাম 'বুণ্ডেসরাথ্' (Bundesrath) অপরটির নাম 'রাইক্স্টাগ্ (Reichstag)। 'বুণ্ডেসরাথ্' ছিল জার্মানীর বিভিন্ন অংশের রাজগণের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিদের সভা। 'রাইক্স্টাগ্ (Reichstag) ছিল সমগ্র জার্মানীর জনসাধারণের প্রতিনিধিসভা। এই প্রতিনিধিসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল; কিন্তু চ্যান্সেলারকে তাঁহার কার্যাদির জন্য জবাবদিহি করিতে পারিত না।

বিস্মার্কের অভ্যন্তরীণ-নীতি

অভ্যন্তরীণ নীতির উদ্দেশ্য :

জার্মান সাম্রাজ্যকে সুসংহত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি

কেন্দ্রীয় শাসন

সাম্রাজ্যকে সুসংহত করিবার জন্য বিস্মার্ক সমগ্র দেশে রেলপথের প্রসার করিলেন এবং একই ধাতুর মুদ্রা সর্বত্র প্রচলিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে একই আইন ব্যবস্থা প্রচলন করা হইয়াছিল। জার্মান সাম্রাজ্যের শিল্পকে উন্নত করিবার জন্য বিস্মার্ক সংরক্ষণ-নীতি (Policy of Protection) গ্রহণ করেন। পূর্বে জার্মানীতে বিদেশী জিনিসের উপর অতি সামান্যই শুল্ক স্থাপন করা হইত। বিস্মার্ক এই শুল্কের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেশীয়

শিল্প-সংরক্ষণ নীতি

শিল্পকে সংরক্ষণ দান করেন। ইহার ফলে শুল্কলব্ধ অর্থ হইতে সরকারী আয় যেমন বৃদ্ধি পাইল, দেশীয় শিল্প তেমন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যে জার্মান শিল্পের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয় তাহা বিস্মার্কের সংরক্ষণ নীতির সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছিল।

জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ও জার্মানীর ক্যাথলিকদের মধ্যে এক তীব্র ধর্মদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই ধর্মদ্বন্দ্বকে কুলটুরক্যাম্ফ বা সভ্যতার সংগ্রাম বলা যায়। প্রোটেস্টাণ্ট প্রাশিয়ার হস্তে ক্যাথলিক রাষ্ট্র অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পরাজয় জার্মানীর ক্যাথলিকগণ মানিয়া লইতে পারে নাই। ফলে ক্যাথালিকগণ 'সেণ্টার' (Centre) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া প্রথম নির্বাচনেই রাইস্টাগে ৬৩টি আসন দখল করে। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের উপর চার্চের প্রাধান্য স্থাপন করা।

কুলটুরক্যাম্ফ বা সভ্যতার সংগ্রাম (Kulturkampf)

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে পোপ নবম পায়াস (Pius IX) ঘোষণা করিলেন যে পোপের ক্ষমতা রাষ্ট্রের শাসকগণের অপেক্ষা অধিক। এই ঘোষণার ফলে জার্মানিতে রাষ্ট্র ও ধর্মাধিষ্ঠানের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিক (Old Catholics) ও প্রোটেস্টাণ্টগণ পোপের এই ঘোষণার প্রতিবাদ করার ফলে পোপের আদেশে ধর্মাধিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হয়। যাহারা ক্যাথলিক ধর্মানুষ্ঠানে শিক্ষকতা বা যাজকের কাজ করিতে তাহারা পদচ্যুত হইল। ফলে প্রাচীনপন্থী ক্যাথলিকগণ সরকারের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্য আবেদন করিল। এই ধর্মদ্বন্দ্বের পশ্চাতে রাজনৈতিক মতলব আছে মনে করিয়া জার্মানীর ঐক্যের যাহারা বিরোধী তাহারা এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতেছে বিবেচনা করিয়া বিস্মার্ক ১৮৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে (May laws of 1873-74) কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। এই সকল আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়। শাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে চার্চকে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করা হইল।

ক্যাথলিক বিরোধী আইন

ক্যাথলিক চার্চের বিদ্যালয়গুলির সরকারি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইল। যাজকদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার স্থাপিত হয়। ক্যাথলিক যাজকগণ পূর্বে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাহ স্বীকার করিত না। ক্যাথলিক যাজকদের এই ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য রেজেস্ট্রি দ্বারা বিবাহ-প্রথা বাধ্যতামূলক করেন। ইহা ভিন্ন জেস্যুইট যাজকদের জোর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে ক্যাথলিক চার্চের উপর এক কঠোর নিয়ন্ত্রণবিধি স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে নবম পায়াস (Pius IX)-এর মৃত্যু হইলে ত্রয়োদশ লিও (Leo XIII) পোপ

হন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সাথে আলোচনার ফলে জার্মান সরকার রেজিস্ট্রেশন দ্বারা বিবাহপ্রথা, জেসুইটদের দেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি কয়েকটি আইন ভিন্ন অপরাপর আইনগুলি বাতিল করিয়া দেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব হইতে জার্মানীকে রক্ষা করিবার জন্য বিসমার্ক ব্যস্ত হইয়া পড়িলে কুলটুর ক্যাম্ফের অবসান ঘটে।

বিসমার্ক ও সমাজতান্ত্রিক দল

জার্মানীতে লাইবনেক্ট (Liebknecht) ও বেবেল (Bebel)-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দল (Social Democratic Party) স্থাপিত হয়। ইহারা ছিল জার্মানীর সর্বাপেক্ষা সুগঠিত রাজনৈতিক দল। তাহারা রাজতন্ত্রের এবং যুদ্ধনীতির বিরোধী ছিল। লাইবনেক্ট ও বেবেল উত্তর জার্মান কনফেডারেশন স্থাপন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং জার্মানীর আলসাস-লোরেন নামক স্থানের সংযুক্তির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সমাজতান্ত্রিকগণ গণতন্ত্রের ও সমর্থক ছিলেন। ফলে বিসমার্কের সাথে তাঁহাদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইল। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে পরপর দুইবার সম্রাট প্রথম উইলিয়মের প্রাণনাশের চেষ্টা হইলে বিসমার্ক সমাজতান্ত্রিকদের দমন করিবেন স্থির করিলেন। তিনি দুইটি নীতি অবলম্বন করিলেন। একদিকে সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে তিনি দমননীতি অবলম্বন করিলেন, অপর দিকে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতির জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের নীতি (ক) দমন (খ) উন্নয়ন

দমননীতি গ্রহণ করিয়া বিসমার্ক কতকগুলি কঠোর আইন চালু করিলেন। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হইল। প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ সম্পর্কিত আলোচনা অথবা সমাজতন্ত্রের আলোচনা সম্বলিত কোন পুস্তক প্রকাশ বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। পুলিশের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা কেবলমাত্র সন্দেহের বলে গ্রেপ্তার করিতে পারিত। ফলে বহু সমাজতান্ত্রিক নেতা পুলিশের হাতে নির্যাতিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রবাদকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই। দমননীতি দ্বারা কোন আদর্শ বা ভাবধারাকে রোধ করা সম্ভব নয়। গোপন সমিতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চলিতে লাগিল।

শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থার মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রকৃত কারণ নিহিত মনে করিয়া বিসমার্ক কতকগুলি শ্রমিককল্যাণ আইন পাশ করিলেন। শ্রমিকদের অসুস্থতা, দুর্ঘটনা শারীরিক অকর্মণ্যতা এবং বৃদ্ধ বয়স জনিত বেকারত্বের সময় আর্থিক

সাহায্যের জন্য তিনি বীমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল আইন পাশ করিতে গিয়া তিনি প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তথাপি এই আইনগুলি প্রণয়ন করিতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে স্টেট্ সোসিয়ালিজম্ (State Socialism) বলা হয়।

বিসমার্কের এই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ কিন্তু সমাজতান্ত্রিকদের মনঃপূত হয় নাই। ফলে তাহাদের আন্দোলন পুরাদমেই চলিয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে রাইক্স্টাগের নির্বাচনে পয়ত্রিশ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়াছিল। সুতরাং, সমাজতন্ত্রীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিস্‌মার্ক জয়ী হতে পারেন নাই।

প্রথম উইলিয়মের মৃত্যুর পর ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক সম্রাট হন। কিন্তু মাত্র তিন মাসের মধ্যেই ক্যানসার রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে ফ্রেডারিকের পুত্র দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট হন। বিস্‌মার্কের সহিত তাঁহার তীব্র মতভেদ হয়। বিস্‌মার্ক পদত্যাগ করেন এবং নিজের গ্রামে চলিয়া যান।* ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে এই মহান্ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ দেহত্যাগ করেন।

বিসমার্কের পদত্যাগ এবং মৃত্যু

উপসংহারে বলা যায় যে, বিস্‌মার্ক ছিলেন উনিশ শতকের ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ। তাঁর কূটকৌশল, বিচক্ষণতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা জার্মানী তথা ইওরোপের ইতিহাসে অনন্য। তাঁর চেষ্টায়ই জার্মানী ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম (১৮৮৮-১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ)

দ্বিতীয় উইলিয়মের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে জার্মান পররাষ্ট্রনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তাহার চরিত্রে ভাবপ্রবণতা, অস্থিরচিত্ততা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় দেখা গিয়াছিল। ফলে তিনি বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন করেন। যেখানে বিস্‌মার্কের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক গোলযোগ এড়াইয়া চলা, ফ্রান্সকে

উইলিয়মের চরিত্র

*"The pilot who had so long guided the ship of the state, who knew better than any man the shoals and rocks on which she might founder, had been dropped"—Ketelby, Vide p 367.

নির্বান্ধব রাখা এবং ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা, সেখানে উইলিয়ম সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতিক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন (Weltpolitik or World Policy) এই নীতি ঘোষণা করিলেন। এই নীতি জার্মানীকে শক্তির দ্বন্দ্বে আগাইয়া নিয়া চলিল এবং বিস্মার্কের চেষ্টায় স্থাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতার অবসান ঘটাইয়াছিল।

উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য :
(১) Weltpolitik
(২) উপনিবেশ
(৩) নৌ-বাহিনী

বিস্মার্ক উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আগ্রহী ছিলেন না কিন্তু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় জার্মানী শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ফলে শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য জার্মানীর যেমন বাজারের প্রয়োজন ছিল তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচামালেরও প্রয়োজনীয়তা ছিল।

উইলিয়ম মনে করিয়াছিলেন যে উপনিবেশ লাভ করিতে হইলে সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন বিশেষ প্রয়োজন এবং এজন্য জার্মানীর নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা দরকার। এই নীতির ফলে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর দ্বন্দ্ব ঘটিতে বেশীদিন লাগিল না।

রাশিয়ার সঙ্গেও মিত্রতা চুক্তি উইলিয়াম পরিত্যাগ করিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে বিস্মার্ক ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে যে গোপন Reinsurance চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছিলেন তাহা আর নূতন ভাবে স্বাক্ষরিত করেন নাই। ফলে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বহুদিনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। ইহার ফলে রাশিয়া ফ্রান্সের সাথে একটি দ্বিশক্তি চুক্তি (১৮৯৫) স্বাক্ষর করে। ইহা ফ্রান্সের নির্বান্ধব অবস্থার অবসান করিল। অন্যদিকে ইহা জার্মানীতে ভীতি সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাশিয়ার সহিত 'রিইনসুওরেন্স চুক্তি' পরিত্যক্ত

রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর উইলিয়ম ইংলণ্ডের সাথে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এক চুক্তির দ্বারা জার্মানী আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে ইংলণ্ড জার্মানীকে হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland) প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরে (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ) ইংলণ্ড আফ্রিকায় ফরাসী প্রাধান্য বাধা দেবার জন্য মধ্য-আফ্রিকা জার্মানীর প্রাধান্যাধীন (sphere of influence) বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে কাইজার উইলিয়ম মধ্য-আফ্রিকায় আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি তাহার বিনিময়ে ফ্রান্স হইতে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করার প্রয়োজন বুঝিলেন না।

ইংলণ্ডের সাথে সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা

এদিকে কিন্তু ক্রমেই ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে বুওয়র যুদ্ধ (Boer War) আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী গোপনে বুওয়রদের উৎসাহিত করে, ফলে ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী বিনষ্ট হইয়াছিল।

ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট

জার্মানীর "Drang nach osten" বা পূর্বদিকে অগ্রসর হও নীতিও ইংলণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যের উপর জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপন করা। এজন্য জার্মানীর সামরিক কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার এবং জার্মান পুঁজি তুরস্ক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন উপায়ে প্রবেশ করিতে লাগিল। জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও জার্মান অর্থের সাহায্যে তুরস্কের রেলপথ নির্মিত হয়। বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম জেরুজালেম এবং তুরস্কের রাজধানী কনস্টানটিনোপল ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং নিজেকে মুসলিম ধর্মের রক্ষকরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কাইজারের এই নীতিতে ইংলণ্ড ভীত হয়, কারণ ইহাকে ইংলণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদের কারণ মনে করিয়াছিল।

Drang nach osten নীতি

বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের পরিকল্পনা

সুদূর প্রাচ্যেও ইংলণ্ড ও জার্মানীর স্বার্থ সংঘাত দেখা দিয়াছিল। এই অঞ্চলে উইলিয়ম ইংরেজ-বিরোধী-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ভীত হইয়া জাপানের সাথে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯০২)। ইতিমধ্যে জার্মানী তাহার সপ্তবর্ষ নৌবৃদ্ধি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে জার্মানী এক শক্তিশালী নৌবাহিনী তৈয়ারী করিয়াছিল এবং কিয়েল খাল খননের ফলে জার্মান নৌবাহিনী সরাসরি বাল্টিক সাগর হইতে উত্তর সাগরে যাইতে সক্ষম হয়।

ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি (১৯০২)

জার্মানীর সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সামুদ্রিক আধিপত্য স্থাপন নীতির ফলে একদিকে যেমন ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের তীব্রতা কমিয়া আসিয়াছিল। ইংলণ্ড লক্ষ্য করিল যে সামুদ্রিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া বা ফ্রান্স অপেক্ষা জার্মানীই ঘোরতর শত্রু। এই কারণে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের চেষ্টায় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে পূর্বেকার বিরোধ ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্সের সাথে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী যুদ্ধ জাহাজ (Cruisers) এবং নৌবাহিনী সংখ্যা বৃদ্ধি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফলে ইংলণ্ড রাশিয়ার সাথেও

মিত্রতা করিবার চেষ্টা করে। অতি অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সাথে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে "ত্রয়ী শক্তিচুক্তি" বা "ট্রিপল আঁতাত" (Triple Entente) গঠিত হয়। বিস্মার্ক স্থাপিত "ত্রি-শক্তি চুক্তি"র (Triple Alliance) (জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালি) প্রত্যুত্তর হিসাবে "ট্রিপল আঁতাত" স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতির ফলে বিস্মার্ককৃত জার্মানীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। ইওরোপ দুই সামরিক শিবিরে বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধ আসন্ন হয়।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে Triple Entente স্থাপন

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে ফ্রান্স

১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের রণক্ষেত্রে জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। সেডানের পরাজয়ের পর সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণের সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছিবামাত্র প্যারিসের জনতা ফ্রান্সকে এক প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। এই প্রজাতন্ত্রকে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বলা হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ প্রাক্তন আইন সভার সদস্যগণ হোটেল ভিলিতে (Hotel de Ville) সমবেত হইয়া "জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার" (Government of National Defence) নামে এক অস্থায়ী সরকার স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্য প্যারিস অবরোধ করিয়াছিল। পাঁচমাস অবরোধ থাকার পর প্যারিস আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১ সালে "জাতীয় সভা" (National Assembly) নামে একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি সভা জার্মানীর সহিত চুক্তির শর্তাদি অনুমোদনের জন্য বর্দো (Bordeausi) নামক শহরে এক অধিবেশনে সম্মিলিত হয়। জাতীয় সভা বর্দো শহরে প্রথম অধিবেশনে সমবেত হইয়া থিয়ার্সকে (Thiers) শাসন ব্যবস্থার প্রধান (Chief of tne Executive) নির্বাচিত করিয়াছিল। অল্পকালের মধ্যেই এই উপাধি পরিবর্তন করিয়া থিয়ার্সকে "ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট" উপাধি দেওয়া হয়। প্রেসিডেণ্ট জাতীয় সভার নিকট তাঁহার কার্যাদির জন্য দায়ী থাকিলেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সভার উপর ন্যস্ত হইল।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিভাবে হইয়াছিল

থিয়ার্স সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া নানা সমস্যার সম্মুখীন হইল—যেমন :

(১) জার্মানীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান; (২) প্যারিসে 'কম্যুন' বিদ্রোহ দমন; এবং (৩) সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন।

থিয়ার্স সরকারের সমস্যা

জার্মানীর সহিত ফ্রাঙ্কফোর্টের চুক্তি (Treaty of Firankfurt) অনুসারে ফ্রান্স জার্মানীকে পাঁচ হাজার মিলিয়ান ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দেবে ইহা ঠিক হয়। ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত জার্মান সৈন্য ফ্রান্সে অবস্থান করিবে। জার্মান সৈন্যকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায় প্র. ' ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া। প্রেসিডেণ্ট থিয়ার্সের তৎপরতায় : ৭৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জার্মানীর প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দেওয়া হয়। ফলে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্স পরিত্যাগ করিয়া যায়। থিয়ার্স এইভাবে ফরাসী জাতিকে জার্মানীর সামরিক অধীনতা হইতে মুক্ত করিলে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহাকে "দেশের মুক্তিদাতা" ("The Liberator of the Territory") এই উপাধিতে ভূষিত করে।

জার্মানীকে ক্ষতিপূরণ দান

"কম্যুন" (Commune) হইল মূলতঃ একটি সাম্যবাদী আদর্শ। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী জনসাধারণ এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, শাসনব্যবস্থা বর্জিত অরাজকতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই কম্যুনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। উহারা সমগ্র ফরাসী দেশকে শহর ও গ্রামের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে একটি করিয়া 'কম্যুন' স্থাপন করা এবং উহার উপর স্থানীয় শাসনের ভার অর্পণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা ফরাসী শাসন ব্যবস্থায় 'বকেন্দ্রীকরণ দাবি করিয়াছিলেন।

প্যারিসে 'কম্যুন' বিদ্রোহ—বিদ্রোহীদের আদর্শ

কম্যুনের বিদ্রোহের কারণগুলি হইল, প্রথমত জাতীয় সভার (National Assembly) নির্বাচনে কম্যুনের সমর্থকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। জাতীয় সভায় রাজতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল বেশী। সেজন্য কম্যুনের সভ্যদের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, জাতীয় সভা হয়ত পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়ত, প্যারিস নগরীকে উপেক্ষা করিয়া যখন জাতীয় সভার সভ্যগণ প্রথম বর্দো শহরে তারপর রাজতন্ত্রের স্মৃতি-বিজড়িত ভার্সাই শহরে অধিবেশনে সমবেত হইল, তখন প্যারিসের অধিবাসীরা অপমানিত বোধ করিল। প্যারিস নগরীর ঐতিহ্য, জার্মান অবরোধের সময় প্যারিস নগরবাসীর দুঃখ-কষ্ট এবং প্যারিস নগর রক্ষার জন্য তাহাদের স্বার্থত্যাগ সব কিছুই ফরাসী অস্থায়ী সরকার তথা জাতীয় সভা উপেক্ষা

কম্যুন-বিদ্রোহের কারণ

করিতেছে দেখিয়া ও প্রজাতান্ত্রিকতা বিলোপের আশঙ্কা করিয়া প্যারিস কম্যুন এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়াছিল। তৃতীয়ত, থিয়ার্স সরকার প্যারিসের জাতীয় রক্ষীবাহিনী (National Guard) ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং প্যারিস হইতে কামানগুলি সরাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্যারিসের বিপ্লবী জনসাধারণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সরকারের সাথে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

প্যারিসে কম্যুন প্রতিষ্ঠা

প্যারিসের বিপ্লবীরা রক্ত পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীন কম্যুনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করিয়াছিলনে। তাঁহারা শোষণ, অন্যায়, স্বার্থান্বেষণ প্রভৃতি শাসন ব্যবস্থা হইতে বিলোপ করিতে চাহিয়াছিলেন।

কম্যুন বিপ্লবের অবসান

এদিকে থিয়ার্স সরকার প্যারিস কম্যুন ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ফলে প্যারিসে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়াছিল। সরকারী সৈন্যবাহিনী প্যারিস অবরোধ করে। এই অবরোধ ছয় সপ্তাহ ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বিজয়ী জার্মান সৈন্যের চোখের সামনেই ইহা ঘটিয়াছিল। দুপক্ষই বর্বরতা ও নৃশংসতার পরিচয় দেয়। কমিউনপন্থী বিপ্লবীরা প্যারিসের আর্চবিশপ এবং খ্যাতনামা বুর্জোয়াপন্থীদের হত্যা করে। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়। টুইলারী প্রাসাদ ও হোটেল ভিলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। থিয়ার্স সরকারের সেনাবাহিনীও প্যারিস নগরীতে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য নরনারীকে প্যারিসের রাজপথে হত্যা করে এবং অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার করে। প্যারিসের রাস্তাঘাট প্যারিসবাসীর রক্তে রঞ্জিত হয়। অবশেষে প্রজাতান্ত্রিক নেতা গাম্বেটার (Gambettar) অনুরোধে এই অন্তর্যুদ্ধের অবসান হয়। থিয়ার্স সরকারের সৈন্য-বাহিনী প্যারিস নগরী পুনর্দখল করিয়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক একতা রক্ষা করে। কম্যুন বিদ্রোহ এইভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন

প্যারিসের পতনের পর হইতেই থিয়ার্সের নেতৃত্বে শাসন কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়। থিয়ার্স যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের বিভিন্ন সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। সেনা-বাহিনীর পুনর্গঠন করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে এক সামরিক আইন পাস করিয়া প্রত্যেক নাগরিকের সামরিক কর্তব্য সম্পাদন বাধ্যতামূলক দায়িত্ব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার করা হইল। নূতন ধরনের এবং সহজে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ফরাসী

সৈন্যদিগকে দেওয়া হয়। এইভাবে সেডানের যুদ্ধে পরাজিত সেনাবাহিনীকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইয়াছিল।

এতদিন যাবৎ অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সভা ফ্রান্সের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিল। এই অস্থায়ী শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে থিয়ার্স ক্ষতিপূরণ দান করিয়া দেশকে জার্মান সৈন্যদলের দখল হইতে মুক্ত করেন। তিনি আন্তর্জাতিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক পুনর্গঠনও সম্পাদন করেন। কিন্তু থিয়ার্সের কার্যের দ্বারা দেশের অবস্থা উন্নত হওয়ামাত্র জাতীয় সভার সংখ্যা গরিষ্ঠদল থিয়ার্সের বিপক্ষে চলিয়া যায়। ফলে থিয়ার্স পদত্যাগ করেন। অতঃপর মার্শাল ম্যাকম্যাহন (Marshal Macmahon) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ)। ম্যাকম্যাহনের প্রেসিডেন্ট-পদ লাভের কিছুকাল পরেই শাসনতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন উঠে। রাজতন্ত্র সমর্থকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেজন্য সকলেই মনে করিয়াছিল রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাজতান্ত্রিকরা বুরবোঁ বংশের বংশধর কমৃটি ডি সেমবর্ড (Comte de Chambord)-কে পঞ্চম হেনরী উপাধি দান করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিবে ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু কমৃটি ডি সেমবর্ড বিপ্লবী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। তিনি বুরবোঁ বংশের শ্বেত পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জিদ ধরিলে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন বাতিল হইয়া যায়। ফলে প্রজাতন্ত্র টিকিয়া যায়। প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রজাতন্ত্রের সমর্থক গাম্বেটার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ফরাসী জাতি প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা দূর হইলে শাসনতন্ত্র গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া সিনেট ও চেম্বার-অব-ডেপুটিজ বা প্রতিনিধি সভা নামে দুই কক্ষ-যুক্ত একটি জাতীয় সভা গঠনের ব্যবস্থা হয়। এই আইন সভা প্রেসিডেন্টকে সাত বৎসরের জন্য নির্বাচিত করিবে। মার্শাল ম্যাকম্যাহন সাত বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের এই শাসনতন্ত্র ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী শাসন-পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। মন্ত্রিসভা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে শাসনকার্যের বিধিব্যবস্থার জন্য প্রতিনিধিসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন সভার অধিক সংখ্যক সদস্য ভোটদান করিলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভাকেই শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট কেবল শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ

নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র

করে। ফরাসী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর আফ্রিকা। আলজেরিয়া, মরক্কো, টিউনিস্, ফরাসী কঙ্গো, সাহারা, মাদাগাস্কার দ্বীপ, গিনি, আইভরি কোস্ট ও নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ফরাসীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এশিয়ায় ইন্দোচীনে ফরাসীরা তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সময় উপনিবেশ নিয়া ফ্রান্সের সাথে ইংলণ্ডের স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু জার্মানীর প্রতি ভীতির জন্য উভয়ে নিজ নিজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া চুক্তিবদ্ধ হয় (১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ)।

তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাস (১৮৫৫-১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ)—(Russia under Alexander II, Alexander III and Nicholas II) :

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-৮১) :

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন জার নিকোলাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার জার হন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা এবং রাশিয়ার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি রাশিয়ার জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের অসন্তোষ বিপ্লবের রূপ ধরিতে পারে অনুমান করিয়া দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক ব্যাপক সংস্কার-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পিতা প্রথম নিকোলাসের স্বৈরাচারী আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ায় গণতন্ত্র ও উদারতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। কিন্তু প্রয়োজনে উদারনৈতিক বা গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে তিনি পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। তবে জারের সর্বময় কর্তৃত্ব যাহাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিলেন।

তাঁহার চরিত্র

তাঁহার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর সংস্কার কাজের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমেই তিনি ডেকাব্রিস্ট বা ডিসেমব্রিস্ট্ নামক বিদ্রোহীদিগকে নির্বাসন হইতে মুক্ত দিয়াছিলেন। ডেকাব্রিস্টগণ ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রথম নিকোলাসের শাসনকালে রাজদ্রোহের অপরাধে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইয়াছিল। তিনি নিকোলাসের আমলের অন্যান্য বিধিনিষেধগুলিও তুলিয়া নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বাধানিষেধগুলি তুলিয়া নেন। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন এবং বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন।

বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ সংস্কার

ডেকাব্রিস্টদের মুক্তি-দান এবং অন্যান্য বাধানিষেধ অপসারণ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জার আলেকজাণ্ডার নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া

তুলিতে চেষ্টা করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণ ছিল রে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অভাব। জার আলেকজাণ্ডার সামরিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনে রেলপথের বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন করেন।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হইল সার্ফগণের মুক্তিদান। রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল সার্ফ যাহার জন্য রাশিয়ার এতদিন কোন উন্নতি

সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ

হয় নাই। সার্ফগণ ছিল জমিদারদের ভূমিদাস। তাহারা বেগার খাটিয়া এবং নানা প্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া জমিদার শ্রেণীর সন্তুষ্টি বিধান করিত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার "মুক্তি ঘোষণা" (Edict of Emuncipation) দ্বারা সার্ফ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা করিলেন।

মুক্তি ঘোষণার চারটি মৌলিক নীতি

ভূমিদাসদের মুক্তি ঘোষণায় চারটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হইয়াছিল :

প্রথমত, এই "মুক্তি ঘোষণা" দ্বারা রাশিয়ার সার্ফদিগকে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা দান করা হইল। পূর্বে তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক অধিকার ভোগ করিত না। এখন হইতে তাহারা স্বাধীন নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিল।

দ্বিতীয়ত, তাহারা যে সকল জমি এতদিন ভূমিদাস হিসাবে চাষ করিত তাহার উপর তাহাদের মালিকানা স্বীকৃত হইয়াছিল।

তৃতীয়ত, এই মালিকানা কিন্তু সরাসরি তাহাদের না দিয়া মির (Mir) নামক গ্রাম্য যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হয়।

চতুর্থত, কৃষকদের জমির মালিকানা পাওয়ার বিনিময়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ কৃষকদের হইয়া 'মির' জমিদারদের দিতে বাধ্য থাকিবে বলা হয়। যেহেতু কৃষকদের অর্থের অভাব ছিল, সেই কারণে সরকার হইতে জমির মূল্য ধার্য করিয়া জমিদারদের দেওয়া হয়, এবং কৃষকদের নিকট হইতে শতকরা ৬ ভাগ সুদে ৪৯ কিস্তিতে এই অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে রাশিয়ার কৃষকেরা আইনত স্বাধীনতা লাভ করিলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাহারা পায় নাই। কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে জমি

মুক্তি ঘোষণার সমালোচনা

ভোগ করিতে পারিল না। মির (Mir) বা গ্রাম্য যৌথ সংস্থা জমির মালিক হইয়াছিল। ফলে ভূমিদাস প্রথার অবসানে কৃষকরা ব্যক্তির অধীনতা হইতে মুক্তি পাইল কিন্তু তাহার পরিবর্তে মিরের যৌথ দায়িত্ব স্থাপিত হইল। কোন কৃষককে কৃষি ভিন্ন অন্য কোন কাজ

করিতে হইলে মির-এর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এই অনুমতি সহজে দেওয়া হইত না। কারণ ইহাতে গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণের অংশ বাড়িয়া যাইতে পারে। এই কারণে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কৃষকদের পক্ষে কৃষিকার্য ছাড়িয়া কারখানায় শ্রমিক হওয়া খুব সহজ ছিল না।

এইসব কারণে কৃষকরা ভূমিদাস প্রথার অবসানে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা প্রত্যেকের ভাগে যে জমি পাইয়াছিল তাহা জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। যে জমিতে তাহারা এতদিন বাস করিত বা চাষ করিত তাহা অধিকার করিবার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তাহারা একেবারেই পছন্দ করে নাই। মির-এর কর্তৃত্ব জমিদারদের কর্তৃত্বের মতই তাহাদের অসহ্য মনে হইল। মিরগুলিতে সাধারণ কৃষকদের স্থান হয় নাই। গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই ঐগুলি পরিচালনার ভার নেয়। কৃষকরা ঐসব কারণে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ সাধনে খুশী হয় নাই।

রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থা ছিল কলুষিত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত। জার আলেকজাণ্ডার ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অনুকরণে বিচার-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। বিচার ও শাসনব্যবস্থার পৃথকীকরণ করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার পথ প্রস্তুত হইল। নির্ভীকভাবে বিচার করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেওয়া হইল। জার আলেকজাণ্ডার জুরীর সাহায্যে বিচার-ব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। সুশিক্ষিত বিচারকদের নিয়া ট্রাইবুন্যাল (Tribunal) গঠন করা হইল।

বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার ত্রুটি সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি না থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এই শিক্ষাই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে রাশিয়া লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার সেই কারণে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার ক্ষমতা স্থানীয় প্রতিনিধি সভার হাতে কিছু পরিমাণে ন্যস্ত করিয়া স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের এক ঘোষণা দ্বারা তিনি সমগ্র রাশিয়ায় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ঘোষণার দ্বারা প্রতি জেলায় Zemstvo বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিতেন। জেলা Zemstvo-সমূহের সদস্যরা প্রাদেশিক Zemstvo-গুলিতে তাদের প্রতিনিধি পাঠাইত।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন—'জেমস্টভো' নামক প্রতিনিধি সভা গঠিত

Zemstvo-গুলির উপর স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব এদের ছিল। দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভারও এদের উপর ছিল। কৃষি, জেলখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির তদারকী ইহারা করিত।

এই Zemstvo-গুলির মাধ্যমেই রাশিয়ার জনসাধারণর রাজনৈতিক শিক্ষার হাতে-খড়ি হয়।* এই প্রতিষ্ঠানগুলি রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দেখাশোনা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করিত। কিন্তু অর্থের অভাবে Zemstvo-গুলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী জনহিতকর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও তাদের কাজে অনেক সময় বাধা দিতেন। অবশেষে বলা যায় আলেকজাণ্ডার স্বায়ত্তশাসন দান করিলেও জাতীয় সভার ন্যায় কিছু স্থাপন করেন নাই। কারণ তিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক।

রাজত্বের প্রথম দশ বৎসর (১৮৫৫-৬৫ খ্রীস্টাব্দ) সংস্কার কার্য সম্পন্ন করিলেও ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ এবং উগ্রপন্থী নিহিলিস্ট আন্দোলন আলেকজাণ্ডারের সংস্কার-স্পৃহাকে দমন করে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে পরিস্থিতির চাপে তিনি ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন আদর্শের প্রেরণা ছিল না। তাঁহার অন্তরে সংস্কারের প্রয়োজনের স্বীকৃতি ছিল না বলিয়াই তিনি আকস্মিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েক বৎসর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের পর ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি এক আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক সার্ফদের মুক্তিদান, শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহাকে প্রকৃতই "মুক্তিদাতা জার" (Tsar Liberator) বলা যায়।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর প্যারিসের সন্ধি দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাশিয়া ইওরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে নাই। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে পোল বিদ্রোহের সময় ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বিপ্লবী পোলদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। ঠিক সেই সময় বিসমার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে এবং পোল বিদ্রোহ

পররাষ্ট্র নীতি

* "The Zemstvos became—training schools in political co-operation"—Hazen, "Europe since 1815" P. 585

দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে। প্রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন জার আলেকজাণ্ডারের একটি কূটনৈতিক জয় বলা যায়। কারণ ইহার ফলে পশ্চিম ইওরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার পুনরাগমন ঘটে। প্রাশিয়ার মিত্রতার সাহায্যে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্যারিস সন্ধির শর্তাদি নাকচ করিতে সক্ষম হন এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্যান স্টিফানো (San Stefano)-র সন্ধি দ্বারা নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা তুরস্কের সুলতানের নিকট হইতে আদায় করেন। কৃষ্ণসাগরের উপর রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের বার্লিন চুক্তি দ্বারা স্যান স্টিফানোর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং রাশিয়াকে তুরস্ক হইতে লব্ধ অনেক সুযোগ সুবিধা ত্যাগ করিতে হয়।

এইভাবে ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তেমন সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও তিনি সুদূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। চীনের সাথে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তবর্তী ভ্লাডিভস্টক (Vladivostok) বন্দর এবং আমুর (Amur) নদী বিধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিকারে আনিয়াছিলেন। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতিতে রাশিয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা দ্বারা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে রাশিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপন করে। উজবেকিস্থান, তাজাকিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব স্থাপিত হয়। রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা পারস্য ও আফগানিস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

নিহিলিজম্ বা নিহিলিস্ট মতবাদ (Nihilism) ঃ

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের শেষ দিকে রাশিয়ায় এক চরমপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। ইহাদের মতবাদ 'নিহিলিজম' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক তুর্গেনিভ (Turgeniev) তাঁর "Fathers and Sons" নামক গ্রন্থে নায়ক ব্যাজারফ-এর (Bazarov) কথার মধ্য দিয়া নিহিলিজমের ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থে যে ব্যক্তি কোন প্রকার কর্তৃত্বের নিকট মাথা নীচু করে না বা প্রচলিত মতবাদে আস্থা রাখে না তাহাকে নিহিলিস্ট বলা হইয়াছে। প্রচলিত প্রথা, প্রতিষ্ঠান, সংস্কার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সব কিছুই তাহারা ধ্বংসযোগ্য মনে করিত। এভাবে দেখিলে নিহিলিজমকে নেতিমূলক মতবাদ বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিচার করিলে নিহিলিজম কেবল ধ্বংসের নীতিই গ্রহণ করে নাই। তাহাদের সৃষ্টিধর্মী মনোভাবও

'নিহিলিজম' মতবাদের ব্যাখ্যা

ছিল। তাহারা ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিস্বত্ববাদ, ধর্মের স্থানে বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে সাধারণ স্বার্থ এবং কেন্দ্রীভূত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তে স্বাধীন কমিউন লইয়া গঠিত যৌথ রাষ্ট্রের কথা বলিত।

রাশিয়ার নিহিলিস্ট আন্দোলনের মোটামুটি তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং পুঁথিগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই পর্যায়ের লক্ষ্য ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তির মুক্তি'। এমন মানুষ তৈরী করা যাহারা কোন কিছুর নিকট মাথা নত করিবে না এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করিবে। এই সময় রাশিয়ায় স্ত্রীজাতির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়।

নিহিলিজম আন্দোলনের তিনটি পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ হইতে। নিহিলিস্টরা এই সময় অনুপ্রেরণা লাভ করে প্যারি কমিউন এবং প্রথম ইন্টারন্যাশনাল হইতে। এই সময় নিহিলিস্টরা চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক ও শিল্প শ্রমিকরূপে দেশবাসীর সাথে নিবিড়ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিল এবং গোপনে তাহাদের মতবাদ প্রচার করে। জার আলেকজাণ্ডার এই সময় নিহিলিস্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। হাজার হাজার লোককে সন্দেহের বশবর্তী হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হয়।

আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে নিহিলিস্টরা সন্ত্রাসের পন্থা গ্রহণ করে। ইহাদের হাতে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিহত হয়। জারের প্রাণনাশেরও চেষ্টা চলিতে থাকে। জার কিছুটা ভীত হইলেন এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের কথাও ভাবিতে লাগিলেন। তিনি Zemstvos-গুলির সহায়তায় একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের রিপোর্ট যেদিন তিনি প্রকাশ করা ঠিক করেন ঠিক সেই দিনই (১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ) তিনি নিহিলিস্টদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে নিহত হন। ফলে রাশিয়ায় জারদের উদারনীতি অনুসৃত হইবার সকল আশা দূর হয়।

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১-৯৪) ঃ

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের কোন প্রয়োজন নাই। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অনমনীয় মনোভাব ছিল কিন্তু তাঁহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনার অভাব দেখা যায়। তাঁহার মতে তাঁহার পিতার উদারনৈতিক চিন্তাধারাই

চরিত্র

জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে এবং ইহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কাজেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পিতার আমলের আইন-কানুন, শাসন-সংস্কার সব কিছুই নষ্ট করিয়া দিয়া রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরাইয়া নিতে চেষ্টা করেন।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের উপদেষ্টা ছিলেন প্রাচীনপন্থী পবেডোনেসটেভ, যিনি হোলি সিনোডের প্রধান প্রো কিউরেটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পবেডোনেসটেভ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না। ফলে উগ্রপন্থীদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করিয়া সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর প্রথম নিকোলাসের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। জেমস্টভোগুলির ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বিচারালয়গুলির স্বাধীনতাও হরণ করা হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী মনোভাব ভাষা, ধর্ম এবং কৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি সমগ্র রাশিয়ায় এক শাসন, এক ধর্ম এবং এক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কারণে রাশিয়ায় বসবাসকারী পোল, ফিন, ইহুদি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের উপর রুশ বৈশিষ্ট্য (Russification) চাপাইবার চেষ্টা করিলেন।

ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। তাহাদের উপর সরকারী সাহায্যে আক্রমণ চালান হয়। এই সকল আক্রমণকে 'প্রোগ্রম' (Progrom) বলা হয়। বহু সংখ্যক ইহুদি ঐ সময়ে প্রাণ হারায় এবং অনেক ইহুদি রাশিয়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচার চলিতে থাকে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রভৃতি সভ্য সমাজের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি রাশিয়া হইতে লুপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু অন্যদিকে রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। যেখানে রাশিয়ায় প্রধানত কুটির-শিল্পই বর্তমান ছিল সেখানে তৃতীয় আলেকজারের আমলে আধুনিক ধরনের শিল্প গড়িয়া উঠে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে সার্জিয়াস-ডি-উইটি (Sergius de Witte) বাণিজ্য ও অর্থসচিব নিযুক্ত হইলে রাশিয়ায় এক শিল্প বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। তিনি মনে করিলেন রাশিয়ার বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাইয়া রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে তৈয়ারী সামগ্রীতে পরিণত করিতে পারিলে একদিকে

জাতীয় জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন

যেমন কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে, অন্যদিকে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া উইটি (Witte) এক ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদেশী শিল্পপতিগণকে নানা প্রকার সুবিধা দান করিয়া তিনি তাহাদিগকে রাশিয়ার শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে আমন্ত্রণ করেন। ফলে প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন রাশিয়ার শিল্প গঠনে নিয়োজিত হইয়াছিল। বেশীরভাগ মূলধন আসিল ফ্রান্স হইতে। শিল্পোন্নতির সাথে সাথে পরিবহণ ব্যবস্থারও উন্নতি করা হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ১৪০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা আরম্ভ হইয়াছিল।

শিল্প প্রসারের ফলে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়ায় একটি নূতন শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হইল এবং ভবিষ্যতে ইহাদের মধ্যে উদারনৈতিক বিপ্লবের বীজ ছড়ান সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শিল্পপতিদের একটি ধনিক শ্রেণী (boergesisie) গড়িয়া উঠিল যাহারা ক্ষমতালোভী হইয়া উঠিল। তাহারা স্বৈরাচারী শাসন মানিয়া নিতে চাহিল না। এইভাবে বলা যায় তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন শুধু প্রতিক্রিয়াশীল নয় ইহা প্রগতিশীলও বটে।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৯৪-১৯১৭):

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস জারপদ লাভ করেন। তিনি পিতার আমলের স্বৈরাচারী নীতিই গ্রহণ করেন।* কিন্তু রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজ দ্বিতীয় নিকোলসের সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আশা করিয়াছিল। শাসন ব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিগণও অংশ লাভ করুক ইহাই ছিল রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

নিকোলাসের চরিত্র ও নীতি

কিন্তু নিকোলাস জনসাধারণের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের আশা "আকাশ কুসুম' বলিয়া ঘোষণা করিলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইয়াছিল। এদিকে স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনা করিতে হইলে যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন নিকোলাসের তাহা ছিল না। তিনি তাঁহার রানী আলেকজান্দ্রা এবং রাসপুটিন (Rasputin) নামে এক হীন প্রকৃতির যাজকের প্রভাবাধীন ছিলেন

---

* I will preserve the principles of Autocracy as firmly and unswervingly as my late father"—Nicholes II, Vide Lipson PP 111—112.

ফলে নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সহিত রাসপুটিন ও রানীর খেয়াল-খুশির সংমিশ্রণে রাশিয়ার এক কঠোর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল দুই মন্ত্রী পবেডোনেসটেভ (Pobedonostev) এবং প্লেহ্ভি (Plehve) দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে পুলিশের অত্যাচার, প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের উপর নিপীড়ন, ইহুদিদের দমন (Progrom) ও রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্য জাতীর লোকদের উপর রুশ-ভাষা ও সংস্কৃতি চাপান প্রভৃতি প্রতিক্রীয়াশীল নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। শিক্ষায়তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে উদারনৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পদচ্যুত করা হয়। ছাত্রসমাজের উপর নজর রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাত্র সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয় অথবা জেলখানায় বন্দী হয়। গুপ্তচরগণের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা বা শাস্তিদান করা হইত। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ভিনোগ্রাডোভ্ (Professor Vinogradoff) যিনি ইংলণ্ডে আশ্রয় নিয়াছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন : "তল্লাসী, গ্রেপ্তার, কয়েদখানায় বন্দী অথবা নির্বাসনদণ্ড হইতে রেহাই পাইবে এমন অবস্থা রাশিয়ায় নাই। ব্যক্তিগত জীবনেও সরকারী হস্তক্ষেপ করা যায়। রাশিয়ায় আমরা এইরূপ আইন-কানুনের অধীনে বাস করি।"* অধ্যাপক মিলিউকভ্ (Professor Miliukov) নামে একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের মতবাদ সরকারের মনঃপূত হয় নাই বলিয়া তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। যে সকল সংবাদপত্র সরকারের ইচ্ছানুযায়ী চলিতে রাজী হইত না তাহাদের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গ্রীণ-এর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) এবং ব্রাইসের 'আমেরিকান কমন্‌ওয়েল্‌থ' ('American Commonwealth) পাঠ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।

প্রতিক্রীয়াশীল নীতি—রাশিয়ার

শুধু রাশিয়াতেই নয় ফিনল্যাণ্ডেও দ্বিতীয় নিকোলাস প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ

* "Nobody is secure against search, arrest, imprisonment and relegation to the remote parts of the Empire. From political supervision the solicitude of the authorities has spread to interference with all kinds of private affairs…Such is the legal protection we are now enjoying in Russia"—Prof. Vinogradoff, Vide Hazen. p 597.

করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণা দ্বারা ফিনল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বহু পরিমাণে হ্রাস করা হয়। পূর্বে ফিন্‌দের ডায়েট বা আইন সভা ফিনল্যাণ্ড-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন পাস করিতে পারিত। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস কেবলমাত্র স্থানীয় বিষয়-সংক্রান্ত আইন ছাড়া ডায়েটের সব ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। ফিনল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী রুশ সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করা হইল। পূর্বে যে সকল সরকারী পদে কেবলমাত্র ফিন্‌গণই নিযুক্ত হইতে পারিত সেই সকল পদে এখন রুশগণও নিযুক্ত হইল। এইভাবে 'রুশীকরণ নীতি'র ফলে ফিনল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি—ফিনল্যাণ্ডে

রাজনীতিক্ষেত্রে নিকোলাসের সময় কোন উন্নতি না দেখা গেলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কাউণ্ট উইটির চেষ্টায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতি দ্রুতগতিতে হইতেছিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে কতকগুলি নূতন রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই রাজনৈতিক দলের মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদী' (Social Democrats) দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধন করা। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদল ধর্মঘট দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। ধর্মঘট দ্বারা কেবলমাত্র শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করাই উদ্দেশ্য এমন নয়, এগুলির মাধ্যমে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়েরও চেষ্টা চলিতেছিল।

অর্থনৈতিক উন্নতি

এই পটভূমিকায় দেখা দিয়াছিল রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ (১৯০৪-৫)। এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট বিশাল রাশিয়া সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়। জনসাধারণ এই পরাজয়ের জন্য স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে দায়ী করে। জাপানের সহিত যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখনই মন্ত্রী প্লেহভি (Plehve)-কে হত্যা করা হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)

পরবর্তী মন্ত্রী প্রিন্স মিরস্কি (Prince Mirsky) উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের দাবি সরকারের নিকট পেশ করিতে বলিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশের

প্রিন্স মিরস্কির নীতি

পেট্রোগ্রাডে (Petrograd) এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ১১ দফা দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। এই দাবিগুলির মধ্যে ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বমত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সংবিধান সভা স্থাপন।

১১ দফা সংস্কার দাবি

এই সংস্কার দাবি লইয়া দেশের সর্বত্র দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হইয়াছিল। এতদিন রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা এখন শ্রমিকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ২২শে জানুয়ারী ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ফাদার গ্যপন (Father Gapon) নামে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাডে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা জার নিকোলাসের নিকট তাহাদের দাবি পেশ করিবার জন্য জারের শীতকালীন রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে জারের সৈন্যদল নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে ফলে বহুসংখ্যক শ্রমিক হতাহত হয়। এই দিনটি রাশিয়ার ইতিহাসে "রক্তাক্ত রবিবার" (Red Sunday) বলিয়া পরিচিত।

রক্তাক্ত রবিবার:
২২শে জানুয়ারী, ১৯০৫

এই ঘটনার প্রতিবাদে রাশিয়ার সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদারের ঘরবাড়ী, সম্পত্তি সব নষ্ট করিয়াছিল। সন্ত্রাসবাদীরা পুলিশ কর্মচারী ও গুপ্তচরদের হত্যা করিতে লাগিল। জারের খুল্লতাত প্রতিক্রিয়াশীল সারজিয়াসকে (Sergius) হত্যা করা হয়। অবশেষে জার নিকোলাস প্রজাদের জাতীয় সভা (National Assembly) আহ্বানের দাবি মানিয়া লইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ নিকোলাস জাতীয় সভা (National Assembly) ডাকিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯শে আগস্ট তিনি 'বুলিঘিন শাসনতন্ত্র' (Bulyghin Constitution) নামে একটি শাসনতন্ত্র প্রকাশ করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সভার পরিবর্তে একটি ইম্পিরিয়াল ডুমা (Imperial Duma) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সভাকে কেবলমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সভার নির্বাচনে শিল্পশ্রমিক, গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক এবং সম্পত্তিহীন গ্রামবাসীকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না। জারের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা বজায় রাখা হয়, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপনের নীতি বর্জন করা হয়। এই শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক দলগুলির সন্তুষ্টি বিধান না করিতে পারায় সমগ্র রাশিয়ায় এক ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হয়। ফলে রাশিয়ার সমাজ জীবন

'বুলিঘিন শাসনতন্ত্র'

একেবারে অচল হইয়া পড়ে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ৩০শে অক্টোবর (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে) একটি ঘোষণা (October Manifesto) দ্বারা নিকোলাস ডুমাকে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করেন। রুশবাসীর নাগরিক অধিকারও স্বীকৃত হইল। ভোটদানের ক্ষমতা প্রসারিত হইল, ফলে শ্রমিকগণ ভোটাধিকার লাভ করিল। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ) এক সরকারী আদেশ দ্বারা এই ঘোষণা কার্যকারী করা হইয়াছিল।

প্রথম ডুমা, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ এবং এপ্রিল মাসে নূতন নির্বাচন হওয়ার পর ১০ই মে তারিখে জাতীয় সভা বা ডুমার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় ৪০০ জন সভ্য নির্বাচিত হয়। এই সভ্যগণ কয়েকটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন। উদার নীতিতে বিশ্বাসী দল 'কনস্টিটিউশন্যাল ডিমোক্র্যাট' (Constitutional Democrats) নামে পরিচিত। তাঁহারা 'ক্যাডেট' (Cadets) নামেও অভিহিত হন। জাতীয় সভায় তাঁহাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ১৫৩। তাঁহাদের বিরোধী রক্ষণশীল দলকে অক্টোবরিস্ট্ (Octoborists) বলা হয়। তাঁহারা নিকোলাস প্রদত্ত অক্টোবর ঘোষণার সমর্থক ছিলেন। শ্রমিক দল (Labour Group) হইতে মোট ১০৭ জন সভ্য নির্বাচিত হন। 'স্বায়ত্তশাসনবাদী' দল (Autonomists) নামে পোল ও অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধি ছিল ৬৩ জন। ইহা ছাড়া স্বাধীন মতাবলম্বী (Independents) কিছু সভ্য ছিল। 'ক্যাডেটগণ' ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি করে। কিন্তু নিকোলাস কয়েকটি ঘোষণা করিয়া পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আলোচনা, সামরিক বাহিনী ও নৌবাহিনী প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দেশের মৌলিক আইনকানুন (Fundamental Laws) পরিবর্তনের ক্ষমতা ডুমাকে দেওয়া হয় নাই। দুই মাসের উপর জার এবং ডুমার মধ্যে বিবাদ চলে। অবশেষে ২১শে জুলাই (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ) নিকোলাস ডুমা ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী স্টলিপিন (Stolypin)-কে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। স্টলিপিনের নীতি ছিল একদিকে দমন করা আবার অন্যদিকে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এদিকে ক্যাডেট দল প্রথম ডুমা ভাঙ্গিয়া দিবার পর ফিনল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়া সেখান হইতে এক ঘোষণা জারি করেন। এই ঘোষণাকে Vibrog Manifesto বলা হয়। ইহাতে অন্যায়ভাবে ডুমা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদ জনসাধারণের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই।

ডুমার ক্ষমতা হ্রাস

প্রথম ডুমা ভাঙ্গিয়া দিবার পর নূতন ডুমা গঠন করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনের সময় সরকারী পক্ষ হইতে অক্টোবরিস্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রতিনিধিগণকে নানাভাবে সাহায্য দান করা হয়। উদারনৈতিক দলগুলির প্রচারকার্যে বাধাদান এবং প্রতিনিধিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাচন হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল। অনেক ভোটারকে ভোটারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। ক্যাডেট দল মাত্র ৫০ হইতে ৬০টি আসন পাইল। দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন ৫ই মার্চ, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ক্যাডেট দলের আনুগত্যহীনতার অজুহাতে নিকোলাস ক্যাডেট প্রতিনিধিগণকে ডুমা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিলে শেষ পর্যন্ত ডুমা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

দ্বিতীয় ডুমা, ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ

তৃতীয় ডুমাতে (১৯০৭-১২ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই ডুমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ হইল কৃষকদিগকে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা দান। পূর্বে কৃষকরা সমষ্টিগত ভাবে জমি ভোগ-দখল করিত। পাঁচ বৎসর কাজ করার পর এই ডুমার কার্যকাল শেষ হয়।

তৃতীয় ডুমা, (১৯০৭-১৯১২) খ্রীস্টাব্দ

চতুর্থ ডুমার নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদলের সভ্য সংখ্যা হইল ১৫৫ জন, অক্টোবরিস্টদের সভ্যসংখ্যা হইল ১৩২ জন এবং ক্যাডেটদের সভ্যসংখ্যা মাত্র ৫২ জন। অক্টোবরিস্টরা এই সময় হইতে ক্যাডেটদের সাথে মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করে। অক্টোবরিস্টরা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, যেহেতু ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। তাহারা বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত বিবাদ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যাডেট এবং অক্টোবরিস্টদের লইয়া প্রগ্রেসিভ ব্লক (Progressive Bloc) নামে এক দলের সৃষ্টি হইলে সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। এইভাবে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের অদূরদর্শিতার ফলে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লব হয়, যাহার ফলে শুধু জারতন্ত্রের (Tsardom) অবসান হয় না, রাশিয়ার সামাজিক ব্যবস্থাও ধ্বংস হইয়া যায়।*

চতুর্থ ডুমা (১৯১২-১৯১৭) খ্রীস্টাব্দ

*"The blindness of the Czarist regime to the imperious necessity of taking time by the forelock caused the Reform Movement to develop into a Revolution (1917) which destroyed not only the monarchy but the structure of Russian society itself"—Lipson, "Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries"—P 124.

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী নীতি (১৮৭১-১৯১৪) (System of Alliances) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্র-জোট গঠিত হয়। একটি হইল 'ত্রিশক্তি চুক্তি' (Triple Alliance), অপরটি হইল 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' (Triple Entente)। এই দুইটি সামরিক জোট সৃষ্টি হওয়ার মূলে ছিল ফ্রান্স এবং জার্মানীর ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা।* ফ্রান্সকে ইওরোপে নির্বান্ধব করিয়া রাখিবার জন্য বিসমার্ক প্রথমে একটি তিন সম্রাটের চুক্তি (Dreikaiserbund) গঠন করিতে সমর্থ হন (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে)। ইহা জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার একটি সৌজন্যমূলক পরস্পরকে সাহায্য করিবার চুক্তি। কিন্তু বার্লিন কংগ্রেসের (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ) পর এই চুক্তি ভাঙ্গিয়া গেলে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে একটি 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Dual Alliance) স্বাক্ষর করেন (১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ)। ইহার পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সকে আফ্রিকায় টিউনিস বন্দরটি দখল করিতে উৎসাহিত করিলে ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই সুযোগে বিসমার্ক ইতালীকে অস্ট্রিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া 'দ্বি-শক্তি চুক্তি'তে যোগদান করাইলেন। ফলে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' (Triple Alliance)-তে পরিণত হইয়াছিল।

দুইটি সামরিক জোট —'Triple Alliance' এবং 'Triple Entente'

বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ইওরোপে ফ্রান্সের কোন মিত্র ছিল না। কিন্তু বিসমার্কের পতনের পর ইওরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রুশ-ফ্রান্স (Franco-Russian Entente, 1893)। এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ফ্রান্স পূর্বেই চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু বিসমার্ক জার্মানীর কর্ণধার থাকাকালীন তাহা সম্ভব হয় নাই। বিসমার্ক রাশিয়ার সহিত ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে একটি রি-ইনসুরেন্স (Reinsurance) সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু বিসমার্কের পতনের পর জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম রাশিয়ার সহিত নূতন ভাবে রি-ইনসুরেন্স সন্ধিটি স্বাক্ষর করিলেন না। ফলে রাশিয়ার সহিত জার্মানীর যোগসূত্র ছিন্ন হয় এবং রাশিয়ার পক্ষ হইতে ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী স্থাপন করার আর কোন আগ্রহ ছিল না। ফ্রান্সও

রুশ-ফ্রান্স মৈত্রী চুক্তি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ

* "The enduring hostility between France and Germany was one of the most constant factors in international diplomacy between 1871 and '1914"—"Europe since Napoleon" by David Thomson P. 488.

এইরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে 'দ্বি-শক্তি চুক্তি' (Franco-Russian Entente) স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। এই চুক্তির কথা বহুদিন গোপন রাখা হয়। এই চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে প্রধান শর্ত ছিল—যদি জার্মানী বা জার্মানী ও ইতালী একত্রিত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে তাহা হইলে রাশিয়া তাহার সর্বশক্তি দিয়া ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে, আবার জার্মানী বা জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একত্রিত হইয়া যদি রাশিয়া আক্রমণ করে তাহা হইলে ফ্রান্স তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া রাশিয়াকে সাহায্য করিবে।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও জাপানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সময় 'রুশ-ভীতি' ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করে। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার বিস্তার ইংলণ্ড ভাল চোখে দেখে নাই। রাশিয়া যাহাতে এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য ইংলণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিতও ইংলণ্ডের হৃদ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হইতে থাকে। দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সাহায্য যে প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। ফলে একে অন্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক নীতিকে সমর্থন করিল। মরক্কোতে জার্মান দাবির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করে। ফলে মরক্কো ফ্রান্সের অধীনে চলিয়া যায়। ইহা ছাড়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপগুলিকে ফ্রান্সের প্রভাবাধীন স্বীকার করিবার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হয়। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস ভ্রমণে যান। তিনি জার্মান বিরোধী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সহিত একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এদিকে জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধি ইংলণ্ডের নিকট আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। জার্মানীই ইংলণ্ডের আসল শত্রু বলিয়া মনে করা হইয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রীচুক্তি (Entente Cordiale ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ)

ফলে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি (Entente Cordiale) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স আফ্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে এবং মিশরের উপরও তার দাবি ত্যাগ করে। ইহার পরিবর্তে ইংলণ্ড মরক্কোর উপর ফ্রান্সের দাবি মানিয়া নিয়াছিল। এই চুক্তিটি কোন সামরিক চুক্তি নয় এবং সরাসরি ইহা জার্মানীর বিরুদ্ধে ছিল না। কিন্তু ইহা দ্বারা দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থের দিকে

লক্ষ্য রাখিয়া সমস্তাগুলি মীমাংসা করিতে পারিয়াছিল। ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেলকাসের (Delcasse) মতে ইহা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা করিয়াছিল।*

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি তিন বৎসরের মধ্যে ইঙ্গ-রুশ চুক্তির পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুন্ন হয়। ফলে ইংলণ্ড বুঝিতে পারিয়াছিল যে রাশিয়াকে ভয় করিবার মত কিছুই নাই। বরং তাহার সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে জার্মানীকে কোণঠাসা করা যাইবে। ফলে ইংলণ্ড যে সব অঞ্চলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ চলিতেছিল সেগুলির অবসান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (Anglo-Russian Convention) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে ঠিক হয় যে আফগানিস্তান, তিব্বত ও পারস্য অঞ্চলগুলিতে কোন পক্ষই নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইবে না। ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) বা ত্রি-শক্তি মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (Anglo Russian Convention) ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সাত বৎসর পূর্বে ইওরোপে দুইটি রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়—ট্রিপল্ এল্যায়েন্স (Triple Alliance) ও ট্রিপল্ আঁতাত (Triple Entente)। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন চুক্তিই পররাজ্য আক্রমণ করার জন্য স্বাক্ষর করা হয় নাই। পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য এগুলি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। তবে ইহা লক্ষণীয় যে এই দুইটি রাষ্ট্রজোট গঠনের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রগুলিতে যে পররাষ্ট্রনীতি ছিল তাহা পরিত্যক্ত হয়। তাহার পরিবর্তে কাভুর এবং বিসমার্কের পথ প্রদর্শিত নূতন কূটনৈতিক নীতি রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে ভবিষ্যতে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়।**

* "France and the United Kingdom were not in military alliance, and the agreement was not aimed specifically at Germany. But the lasting removal of Anglo-French frictions and the reconciliation of the two western powers betokened as the French foreign minster Delcasse foresaw, a new era in European politics"—'Europe since Napoleon' by David Thomson P. 492.

** The system of rival alliances marked the liquidation of nineteenth century relationships, the abandonment of traditional foreign policies, the adoption by others of the new mobile, dynamic diplomacy invented by Cavour and Bismarck—Vide Thomson" P. 493

(1) Show how from 1871 to 1890 Bismarck was the arbiter of European politics.

(১৮৭১ হইতে ১৮৯০ পর্যন্ত বিসমার্ক কিভাবে ইওরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন আলোচনা কর।)

উঃ ৯৩-৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(2) Discuss Bismarck's internal policy after 1870.

(১৮৭০ সালের পর বিসমার্কের অভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর।)

উঃ ৯৬-৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(3) Discuss the policy and achievements of Kaiser William II.

(কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের নীতি এবং কার্যাবলী আলোচনা কর।

উঃ ৯৯-১০২ পৃষ্ঠা দেখ।

(4) Write notes on :

(a) Thiers ; (b) Dreyfus Case ; (c) Bonlangist Movement.

(সংক্ষেপে আলোচনা কর : (ক) থিয়ার্স (১০২-১০৩ পৃষ্ঠা), (খ) ড্রেফুস ঘটনা (১০৭ পৃষ্ঠা), (গ) বুলাঙ্গিস্ট আন্দোলন

উঃ ১০৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(5) Give an account of the reforms of Alexander II.

(দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারগুলি আলোচনা কর।)

উঃ ১০৮-১১১ পৃষ্ঠা দেখ।

(6) Discuss the character and policy of Nicholas II.

(দ্বিতীয় নিকোলাসের চরিত্র ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ ১১৪-১২০ পৃষ্ঠা দেখ।

(7) Write a note on the system of alliances after 1871

(১৮৭১-এর পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

উঃ ১২১-১২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ
(Socialism and Imperialism)

কার্ল মার্কস, ১৮১৮ (Karl Marx) ও সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) :

শিল্প বিপ্লব প্রসূত কারখানা প্রথার দোষত্রুটি দূর করিবার প্রয়োজনেই সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দিয়াছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থার ফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতেই অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অন্যদিকে কঠোর শ্রম করিয়াও শ্রমিকশ্রেণী দরিদ্র জীবন যাপন করে। এই অন্যায়মূলক পার্থক্য এবং মালিক শ্রেণীর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ফলে 'সমাজতন্ত্রবাদ' চিন্তাধারার বিকাশ হয়।

সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি

ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) (১৭৭১-১৮৫৮) সর্বপ্রথম 'সমাজতন্ত্রবাদ' (Socilism) কথাটি ব্যবহার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে একশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন ছাড়া টমাস্ হজ্স্কিন্ (Thomas Hodgskin), উইলিয়াম টমসন্ (William Thompson) এবং ফ্রান্সের চার্লস্ ফেরিয়ার (Charles Farier) ও সেণ্ট সাইমন (Saint Simon)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমাজতান্ত্রিকগণের আদর্শ ছিল এমন সমাজ স্থাপন করা যেখানে সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে এবং সকলের পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ আয় সকলের মধ্যে সঠিকভাবে বণ্টন করা হইবে। এই সমাজতান্ত্রিকরা কিন্তু 'অবাস্তববাদী' (utopains) ছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে কিভাবে আদর্শকে কার্যকরী করিতে হইবে সে ধারণা তাহাদের ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সমাজতন্ত্রবাদ

কিন্তু যে মহান ব্যক্তিকে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক বলা যায় তিনি হইলেন কার্ল মার্কস। তিনি তাঁহার পূর্বগামী সমাজতান্ত্রিকদের অপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত (Scientific) উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা করেন। কার্ল মার্কস্ ছিলেন একজন জার্মান ইহুদি। তিনি ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রাশিয়া রাজ্যের রাইন অঞ্চলে ট্রায়ার (Trier) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই উত্তম শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি বন (Bonn) ও

মার্কস ও তাঁহার মতবাদ

বার্লিন (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করেন। দর্শনশাস্ত্র ও ইতিহাসে তাঁহার অনুরাগ অপরিসীম ছিল। এ সময়ে তিনি বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel)-এর মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি হেগেলের নিকট হইতে ইতিহাসকে ক্রমঃ বিবর্তনের অভ্রান্ত গতি হিসাবে মনে করিবার শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাসের দর্শন (Philosophy of Epicurus) সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ডক্টর ডিগ্রী (Doctorate) লাভ করেন। এ সময়ে জার্মানীর যুবসমাজের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল মার্কস তাহা সমর্থন করেন।

নানাবিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন এবং ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ হইতে তিনি 'রেনিশ গেজেট' (Rhenish Gazette) নামে একটি চরমপন্থী সংবাদ-পত্র সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রগতিশীল মতবাদের জন্য অল্পকালের মধ্যেই প্রাশিয়ার সরকারের আদেশে তাঁহার সংবাদপত্র বন্ধ করিতে হয় এবং তিনি দেশ হইতে নির্বাসিত হন। মার্কস ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ (Frederich Engels) নামে একজন জার্মান সমাজতান্ত্রিকের সহিত তাহার পরিচয় হয় যাহা আজীবন বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে মার্কস ফ্রান্স হইতেও বহিষ্কৃত হন। ইহার পর তিনি ব্রাসেলস্ (Brussels)-এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি এঙ্গেলসের সহায়তায় 'কমিউনিস্ট লীগ' (Communist League) নামে একটি সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ইহার মাধ্যমে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ব্রাসেলসে কয়েক বৎসর বাস করিবার পর মার্কস লণ্ডনে চলিয়া যান। সেখানে থাকাকালীন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (Communist Manifesto) নামে তাহার বিখ্যাত পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। এই ম্যানিফেস্টোকে বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের 'প্রথম ধ্বনি' ("birth cry") বলা যায়। এই পুস্তিকায় জ্বালাময়ী আবেদনের মাধ্যমে মার্কস তাহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মার্কস 'সমাজতন্ত্রবাদ' ('Socialism)-এর বদলে 'কমিউনিজম্ (Communism) নামটি ব্যবহার করেন। কারণ তাঁহার মতবাদ প্রাথমিক সমাজতান্ত্রিকদের মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল বলিয়া তিনি 'কমিউনিজম্' এই নূতন নাম ব্যবহার করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার অপর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ড্যাস ক্যাপিট্যাল' (Das Capital) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এ সময় হইতেই মার্কসের 'ড্যাস ক্যাপিট্যাল' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধর্মগ্রন্থ-স্বরূপ হইয়া

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো

'ড্যাস ক্যাপিট্যাল'

উঠে। ফরাসী বিপ্লবে যেমন রুশোর 'সামাজিক চুক্তির মতবাদ' (Contract Social) প্রেরণা জাগাইয়াছিল সেইরূপ ড্যাস্ ক্যাপিট্যালও রুশ বিপ্লবের প্রেরণা দান করিয়াছিল। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মার্কস মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মার্কসের মতবাদ

মার্কসের মতবাদের মধ্যে চারিটি মৌলিক নীতি দেখা যায়। প্রথমত, তাঁহার মতে মানুষের জীবনের উপর মূল প্রভাবই হইল অর্থনৈতিক প্রভাব। অতএব প্রাচীনকাল হইতে মানুষের ইতিহাস অর্থনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ভিন্ন আর কিছু নহে।* মার্কসের মতে প্রাচীনকালে স্বাধীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগের সামন্তশ্রেণী ও সার্ফদের দ্বন্দ্ব এবং বর্তমান যুগের মালিক ও মজুরশ্রেণীর দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসের অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পর্যায়। এইভাবে মার্কস ইতিহাসকে অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, মার্কসের মতে মানব সমাজকে দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: এক মালিকশ্রেণী ও দুই শ্রমিকশ্রেণী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থসংঘাত অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এই শ্রেণীসংঘাতের মধ্য দিয়াই সামাজিক বিপ্লব আসিবে। এই বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর কোন কিছু হারাইবার ভয় নাই। এবং এই বিপ্লবের ফলে শাসনক্ষমতা যাইবে সর্বহারা শ্রমিকদের (Proletariate) হাতে।

তৃতীয়ত, ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্ রিকার্ডো (Ricardo) এবং ক্লাসিকাল অর্থনীতি-বিদদের (Classical Economists) "Labour theory of value"এর উপর ভিত্তি করিয়া মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কোন দ্রব্যমূল্যের সর্বপ্রধান উপাদান হইল শ্রম। জমি ও কাঁচামাল প্রকৃতির দান। মানুষের শ্রম ভিন্ন এগুলিকে প্রস্তুত দ্রব্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে। অতএব কোন দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য উহার পশ্চাতে ব্যয়িত শ্রমের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে।** মার্কসের মতে একমাত্র শ্রমের মাপকাঠিতেই উৎপাদিত দ্রব্য হইতে আয় বণ্টিত হওয়া উচিত।

চতুর্থত, মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের একটি আন্তর্জাতিক দিক আছে। তিনি

---

*"The Marxist approach to history sees the struggle between contending classes as the principal driving forces in the development of humar society"

"What is Marxism" by Emile Burns ; p, 9.

**"The economic value of a commodity consists in "human labour crystallized" being directly derived from the labour that has gone to its construction"—Ketelby, P. 351.

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সংঘ" (International Workingmen's Association) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহা First International নামে পরিচিত। মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে Second International এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে Third International স্থাপিত হয়। Third International ভাঙ্গিয়া যায় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে। তারপর স্থাপিত হয় 'কমিনফর্ম' (Cominform—Communist Information)। উহা স্থায়ী ছিল ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

মার্কসবাদের সমালোচনা

মার্কসবাদের সমালোচনায় প্রথমত মার্কসের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাসে অর্থনৈতিক প্রেরণাই একমাত্র কারণ নহে। দেশাত্মবোধ, ধর্মভাব, ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব, ঐতিহ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রভাব ও শক্তির ফলেই মানব সমাজের বিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব ইতিহাসকে একমাত্র অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের কাহিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করা অনেকে ভুল মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানকালে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক উন্নয়নমূলক আইন-কানুন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে উন্নতি, রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শ্রমিক উন্নয়ন আইন-কানুন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ফলে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু মার্কসবাদের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ জনিত সমস্যা সমাধানে মার্কসবাদ ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ও মানবোচিত ব্যবহার করার আবশ্যকতা মার্কসবাদ সকলের দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। মার্কসের সময় হইতেই প্রত্যেক দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরন্তু তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসীগণই রুশ-বিপ্লবের ন্যায় এক যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত করিয়া ইতিহাসে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা (The urge for Imperialistic Expansion) ঃ

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি নূতন কারণ উপস্থিত হয় যাহার ফলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইওরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য বিস্তারের এক নূতন উদ্যম শুরু হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য-বিস্তারের কারণ

এই সাম্রাজ্য বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হইল: (ক) অর্থনৈতিক, (খ) রাজনৈতিক, (গ) ধর্মনৈতিক ও (ঘ) সামাজিক।

অর্থনৈতিক

শিল্পবিপ্লবের জন্য ইওরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রই আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচেষ্টাব ফলে উৎপাদন সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে এই সব সামগ্রী বিক্রয়ের অন্য নূতন বাজারের প্রয়োজন হয়। ইহার উপর ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শিল্পপতিদের হাতে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হওয়ায়* তাহারা ইওরোপের বাহিরে মূলধন বিনিয়োগ করিবার স্থান খুঁজিতেছিল। কাঁচামালের জন্যও ইওরোপের বাহিরে এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে তুলা, সিল্ক, রবার, ভেষজ তৈল এবং খনিজ ধাতুদ্রব্য আমদানী করার প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিক

অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনৈতিক কারণও ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির উপরই দেশেব মর্যাদা নির্ভরশীল এইরূপ এক মনোভাব ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে দেখা যায়। ইতালীর লিবিয়া আক্রমণের ব্যাপারে এইরূপ মনোবৃত্তি দেখা যায়। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে ইংলণ্ড সাইপ্রাস (Cyprus) এবং কেপ (Cape) এই দুটি নৌঘাটি দখল করিবার জন্য তৎপর হয়।

ধর্মনৈতিক

খ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা এশিয়া এবং আফ্রিকায় ধর্ম প্রচারের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করেন। ফরাসী ধর্মযাজকরা নিকট প্রাচ্য এবং সুদূর প্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে কার্ডিনাল লেভি জেরি (Cardinal Lavigerie) "আফ্রিকান মিশনারী সমিতি" "Society of African Missionaries)" নামে সমিতির মাধ্যমে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে আলজিরিয়া (Algeria) এবং টিউনিসিয়ায় (Tunisia) ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব বিস্তার করেন। ইহা একটি ফ্রান্সের ধর্মীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে যাহা পরবর্তিকালের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যের

* "glut of Capital"

অগ্রদূত বলা যায়। ফরাসী যাজকরা আফ্রিকার অন্যান্য অংশেও বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপনের দ্বারা তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে বেলজিয়ামের যাজকরা কঙ্গো উপত্যকায় তাহাদের প্রচারকার্য চালাইয়া বেলজিয়ামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

ইওরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছিল। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল।

সামাজিক

এই সকল সম্মিলিত কারণের ফলেই ১৮৭০ সালের পরে এশিয়া এবং আফ্রিকাতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে, যাহার জন্য ১৮৭০ সাল হইতে ১৯১৪ সালের যুগকে "সাম্রাজ্যবাদের যুগ" (Age of Imperialism") বলা হইয়াছে।*

ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঔপনিবেশিক সংঘর্ষ ; আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ ও এশিয়ার আংশিক ব্যবচ্ছেদ (Colonial rivalry and colonial collisions ; Partition of Africa and partial partition of Asia)

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঔপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ইওরোপীয়দের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। আফ্রিকাকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark Continent) বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে লিভিংস্টোন (Livingston), স্ট্যানলি (Stanley), স্পেক (Speke) এবং বার্টন (Burton) প্রভৃতি আবিষ্কারকের চেষ্টার ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তরের অনেক খবর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছিয়াছিল। ফলে অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা

আফ্রিকাতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ক্ষুদ্র বেলজিয়াম রাজ্যের রাজা লিওপোল্ড। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে কঙ্গো নদীর অববাহিকায় একটি বিরাট অঞ্চল দখল করিয়া নেন। তিনি ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কঙ্গো অববাহিকার উন্নয়ন এবং আফ্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাঁহার রাজধানী ব্রাসেলসে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলন ডাকেন। এই সম্মেলনের ফলে

বেলজিয়ামের উপনিবেশ স্থাপন

*"The generation after 1810 has come to be known in some specially significant sense as "the age of Imperialism".

—"Euorpe since Napoleon"—by Thompson P 451.

"International Africa Association" নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সমিতির আন্তর্জাতিক চরিত্র কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়। প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সেই মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। লিওপোল্ড কঙ্গোনদীর অববাহিকায় বেলজিয়াম অধিকৃত জায়গাটিকে 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য' (Congo Free State) নামকরণ করেন। ইহা প্রায় বেলজিয়াম রাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

বেলজিয়ামের রাজার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কঙ্গো অববাহিকার বিভিন্ন অংশের উপর দাবি জানাইতে আরম্ভ করে; ফ্রান্স, জার্মানী, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশ হইতে অভিযাত্রীদল আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে সক্রিয় হয়। এই অনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কোন রাষ্ট্র যদি আফ্রিকার কোন এলাকা দখল করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে তাহা জানাইয়া দেয় তাহা হইলে সেই রাষ্ট্র সেই এলাকার উপর মালিকানা স্থাপন করিতে পারে। বার্লিন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলা যায়। ইহার ফলে পুরাদমে আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হয়, এবং ঔপনিবেশিক যুগের সূত্রপাত হয়।* কার্যকালে অবশ্য এই সিদ্ধান্ত কোন রাষ্ট্রই মানিয়া চলে নাই এবং রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ সুবিধামত উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আবিসিনিয়া এবং লাইবেরিয়া ভিন্ন সমগ্র আফ্রিকাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া নিয়াছিল।

আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি দখল করিয়াছিল ইংলণ্ড। দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উত্তরে কাইরো পর্যন্ত অনেকগুলি স্থান ইংলণ্ডের অধিকারে আসে। ইহার মধ্যে বেচুয়ানাল্যাণ্ড (Bechuanaland) দখল হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে, রোডেশিয়া (Rhodesia) ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে, নিয়াসাল্যাণ্ড (Nyasaland) ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। ইংলণ্ডের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের মূলে ছিল সিসিল রোডস (Cecil Rhodes)-এর অভিযান। এই অভিযানের ফলে আফ্রিকার

ইংলণ্ডের উপনিবেশ

* "It was agreed that in future any power that effectively occupied African territory and duly notified the other powers could thereby establish possession of it. This gave the signal for the rapid partition of Africa among all the colonial powers, and inaugurated the era of colonialism".

—Thompson P. 4.6

অধিবাসী বোয়ার (Boer) বা ডাচ কৃষকদের সাথে ইংলণ্ডের সংঘর্ষ হয়। বোয়ার যুদ্ধে (১৮৯৯—১৯০২) ইংলণ্ড জয়লাভ করে, ফলে বোয়ারদের দুটি আফ্রিকার রাজ্য ট্রান্স-ভাল (Transvaal) ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট (Orange Free State) ইংলণ্ড দখল করে। ইহা ছাড়াও সিয়েরালিয়োন, গাম্বিয়া, গোল্ড কোস্ট, নাইজেরিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের একাংশ ইংলণ্ডের অধিকারে আসে।

ফ্রান্স প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশের-আলজিরিয়া (Algeria) অঞ্চলটি দখল করে (১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দ)। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স টুনিস (Tunis) দখল করে এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মরক্কো (Morocco) ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স সমস্ত সাহারা এবং সেনিগাল, গিনি, ডাহোমি, আইভরি কোস্ট প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া আলজিরিয়া হইতে কঙ্গো নদীর উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এইভাবে উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের নিকটবর্তী মাদাগাস্কার (Madagascar) দ্বীপটিও দখল করিয়া লয়।

ফ্রান্সের উপনিবেশ

বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণে **পোর্তুগাল** বহুকাল পূর্বেই কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পোর্তুগাল এসকল স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া এঙ্গোলা (Angola) নামক এক বৃহৎ প্রদেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক বা পোর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা নামক উপনিবেশও স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরোধিতার জন্য এঙ্গোলা এবং পোর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে পোর্তুগাল যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারে নাই।

পোর্তুগালের উপনিবেশ

স্পেন আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে রিও-ডি-অরো এবং মরক্কোর একাংশ দখল করে।

স্পেনীয় উপনিবেশ

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে **ইতালি** উপনিবেশ বিস্তারে মনোযোগী হয়। ক্রিসপি (Crispi)-র প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ইতালী উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রণী হয় এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে এরিট্রিয়া (Eritrea) এবং সোমালিল্যাণ্ড (Somaliland) দখল করে। তুরস্কের সাথে ১৯১১—১২ সালের যুদ্ধের ফলে ইতালী ত্রিপোলী (Tripoli) ও সাইরেনেইকা (Cyrenaica) অধিকার করে। পরে এই দুইটি অঞ্চল একত্রিত করিয়া নাম দেওয়া হয় লিবিয়া (Libya)।

ইতালীর উপনিবেশ

বিসমার্ক জার্মানীকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' বলে ঘোষণা করেন ফলে জার্মানী উপনিবেশ স্থাপনে প্রথমে অগ্রণী ছিল না। পরবর্তিকালে সম্প্রসারণের ফলে জার্মানী উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং নাইজার নদীর পশ্চিমে টোগোল্যাণ্ড (Togoland) এবং ক্যামারুন (Cameroon) দখল করে। ইহা ভিন্ন জার্মানী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব অফ্রিকায় দুইটি অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

জার্মানীর উপনিবেশ

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের বিষয়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও স্বার্থের সংঘাত বিশেষভাবে দেখা দেয়। ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সুদানে, ইংলণ্ডের সাথে জার্মানীর দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের মরক্কোতে সংঘর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকা বিভাগের স্বরূপ

মিশরের দক্ষিণে সুদান ও নীলনদের অববাহিকা অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলটি মিশরের শাসনকর্তার অধীন ছিল কিন্তু মাধী (Madhi) পদবীধারী এক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া সুদান মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সক্ষম হয়। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স উভয়েই এই অঞ্চল দখল করিতে চেষ্টা করে। ইংলণ্ডের সেনাপতি গর্ডনের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী সুদান দখল করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। গর্ডন নিহত হন। ইংলণ্ডের পরে ফ্রান্স নিজেকে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি মারচাঁদের নেতৃত্বে এক ফরাসী বাহিনীকে সুদানে পাঠানো হয়। মারচাঁদ সুদানের রাজধানী খার্টুম (Khartoom)-এর দক্ষিণে ফ্যাসোডা (Fashoda) নামক এক স্থানে উপনীত হইয়া ফরাসীপতাকা উত্তোলন করেন। ইংরেজ সেনাপতি কিচেনার এই সংবাদ পাইয়া পাঁচটি গানবোট ভর্তি সৈন্যসহ ফ্যাসোডাতে আসিয়া উপস্থিত হন। ফরাসী সেনাপতি মারচাঁদ কিচেনারকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু কিচেনারকে বলিলেন যে তিনি ফরাসী অঞ্চলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। ইহার উত্তরে কিচেনার ফরাসী সেনাপতিকে জানান যে ফরাসীরা ইংরেজের অধিকৃত অঞ্চলে আছে। তিনি যেন ফরাসী পতাকা অবনমিত করেন এবং সত্বর এই অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যান। এই রকম অবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে এক চুক্তির ফলে ফ্রান্স তাহার দাবি ত্যাগ করিয়া ফ্যাসোডা অঞ্চল পরিত্যাগ করে। ফলে যুদ্ধের কিনারা হইতে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের সুদানে সংঘর্ষ

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ (ডাচ) উপনিবেশ দু'টি ছিল ট্রান্সভাল (Transvaal) ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট (Orange Free State)। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসী বোয়ারদের সহিত ইংলণ্ডের সংঘর্ষ আরম্ভ হয় ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে যখন ইংলণ্ড এই অঞ্চলগুলি গ্রাস করিবার চেষ্টা করে। বুয়র অঞ্চলে এই সময় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। ফলে বহু ইংরেজ এ-অঞ্চলে প্রবেশ করে। ট্রান্সভালের রাষ্ট্রপতি পল ক্রুগার এই ইংরেজদের বিদেশী বলিয়া গণ্য করেন এবং ইহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। ইহাতে বুয়র অঞ্চলের ইংরেজগণ অসন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইংরেজদের সাহায্য চায়। ইংরেজ অধিকৃত কেপ (Cape) হইতে ডাঃ জেমসনের (Dr. Jameson) নেতৃত্বে কয়েকশত ইংরেজ ট্রান্সভালে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করিলে বুয়র সরকার তাহাদের বন্দী করে। এই ঘটনার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের জন্মদিনে ক্রুগারকে প্রেটোরিয়ার জার্মান ক্লাব অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দনের উত্তরে ক্রুগার জার্মানীকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করেন এবং আশা করেন যে জার্মানী ইংলণ্ডকে ট্রান্সভাল আক্রমণ করার ব্যাপারে বাধা দিবে। কাইজারও ক্রুগারকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আক্রমণকারীদের বাধা দিতে সাফল্যলাভ করায় শুভেচ্ছা জানান। জার্মানীর এইরূপ মনোভাবে ইংলণ্ডের সরকার অসন্তুষ্ট হয় এবং জার্মানীকে বোয়ারদের সহিত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু ইংলণ্ড যখন বোয়ারদের বিরুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২ খ্রীস্টাব্দ) যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জার্মানী অবশ্য হস্তক্ষেপ করে নাই। ফলে জার্মানী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয় নাই।

ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সংঘর্ষ

ঔপনিবেশিক সংঘর্ষের আরেকটি স্থান হইল মরক্কো। মরক্কোর বন্দর আগাদির-এর (Agadir) ঘটনা জার্মানী ও ফ্রান্সকে যুদ্ধের কিনারায় লইয়া গিয়েছিল। টিউনিস দখল করার পর ফ্রান্স মরক্কোর উপর নজর দিয়াছিল এবং এই অঞ্চলটি দখল করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। ফ্রান্স মরক্কোর সুলতানকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার দিয়া মরক্কোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। জার্মানী ফ্রান্সের এই নীতির বিরোধিতা করে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কাইজার মরক্কো ভ্রমণে যান এবং সেখানে জার্মান নীতি ঘোষণা করেন। তিনি মরক্কো সুলতানের স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক অধিকার এবং মরক্কোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।

জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের মরক্কোতে বিবাদ

এইরূপ অবস্থায় মরক্কো সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে

আলজেসিরাসে (Algeciras) একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রও যোগদান করে। বহু আলোচনার পর মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে—যেমন মরক্কোর আরক্ষা বাহিনী ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকৃত হয়। জার্মানীর তেমন কিছু লাভ হয় নাই, ফলে এই আন্তর্জাতিক বৈঠককে জার্মানীর কূটনৈতিক পরাজয়ই বলা যায়। যাহা হউক এই বৈঠকে মরক্কো সম্বন্ধে একটি সাময়িক আপস হয়।

আলজেসিরাসের আন্তর্জাতিক বৈঠক (Algeoirias Conferance)

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় মরক্কোতে ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত মিটমাট করিয়া ঠিক হয় যে মরক্কোতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকার থাকিবে কিন্তু জার্মানী অর্থ নৈতিক সুবিধা পাইবে।

কিন্তু দুই বৎসর পর (১৯১০ খ্রীস্টাব্দে) মরক্কো লইয়া পুনরায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। মরক্কোর ফেজ (Fez) শহরে বিদ্রোহ দেখা দিলে ফ্রান্স এককভাবে সৈন্য পাঠাইয়া ঐ শহরটি দখল করে। ইহাতে জার্মানী ক্রুদ্ধ হয় এবং মরক্কোতে জার্মান স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য প্যানথার (Panther) নামক একটি যুদ্ধ জাহাজ মরক্কোর বন্দর আগাদির (Agadir)-এ প্রেরণ করে। প্যানথার-এর উপর নজর রাখিবার জন্য ইংলণ্ড তার সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের পক্ষে প্রেরণ করে। এই সময় ইংলণ্ড ফ্রান্সের বন্ধুতে পরিণত হইয়াছিল, ফলে একে অপরের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই আগাদির ঘটনা (Agadir incident) শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হয় নাই।

(Agadir incident)

জার্মানী—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যৌথ শক্তিকে ভয় পায়, ফলে শেষ পর্যন্ত চুক্তি দ্বারা ইহার পরিসমাপ্তি হয়। এই চুক্তিদ্বারা ঠিক হয় যে মরক্কো ফ্রান্সের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। জার্মানী ফরাসী কঙ্গোর এক অংশ লাভ করে। জার্মানী প্যানথার জাহাজটি সরাইয়া লইয়াছিল। আগাদির ঘটনাতে জার্মানীর কূটনৈতিক পরাজয় হয়। ইহা দ্বারা ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়।*

আফ্রিকার ন্যায় এশিয়াতেও ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপন করে বা জোর করিয়া স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করে।** ইংলণ্ড, ফ্রান্স,

* "The main effect of the crisis of Agadir was to accentuate Anglo-German rivalry and distrust, and to inflame public opinion in the cause of national prestige"—David Thomson, P 486.

**Forcible intrusion of the West upon the East.—Ketelby, P 141.

রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, এবং হল্যাণ্ড এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উপরোক্ত দেশগুলি এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

এশিয়ায় ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। এই সময় মারাঠাদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের সব-চেয়ে দুর্ধর্ষ শত্রুর পতন ঘটায়। ইহার পর ভারতে ইংরেজ অধিকার ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতে থাকে। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের দ্বারা পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৎসর ঘোষণাদ্বারা ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ইংরেজ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খ্রীস্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের (১৮৭৮-৮০ খ্রীস্টাব্দে) ফলে আফগানিস্থানের উপর ইংরেজ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মদেশ, বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলও ইংরেজের অধীনে আসিয়াছিল।

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষের দিকে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয় কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়নের সময় হইতেই ঔপনিবেশিক নীতি পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়। ফ্রান্স পূর্ব এশিয়ায় কোচিন-চীন (Cochin-China), আনাম (Annam), কম্বোজ (Cambodia), টনকিন্ (Tonkin) প্রভৃতি কয়েকটি স্থান দখল করে। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia), তাহিটি (Tahiti) ও মার্কুইসাস (Marquesas) দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের অধিকারে আসিয়াছিল।

ফ্রান্সের উপনিবেশ

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইওরোপীয় মহাদেশে রাশিয়ার বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হইলে রাশিয়া সেই ক্ষতি এশিয়া মহাদেশে পূরণ করিতে চাহিয়াছিল। এশিয়াতে রাশিয়ার বিস্তার দু'দিকে যায়—একটি হইল দক্ষিণে পারস্য ও আফগানিস্থানের দিকে এবং অন্যদিক হইল চীনের দিকে। পারস্য ও আফগানিস্থানের দিকে অগ্রগতির পথে রাশিয়া তাসখন্দ (১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ), সমরখন্দ (১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ) এবং খিবা (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ) দখল করে। এই অগ্রগতির ফলে রাশিয়ার সীমান্ত আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। রাশিয়ার এই বিস্তৃতির ফলে ইংলণ্ডের রুশভীতি (Russophobia) সৃষ্টি হয় এবং ভারতবর্ষের সীমান্ত নিরাপত্তা রাখার অজুহাতে ইংরেজ সরকার আফগানিস্থানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে

রাশিয়ার স্থাপিত উপনিবেশ

এবং নিজেদের মনোনীত আমীরকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে স্থাপন করে। এদিকে রাশিয়া তুর্কিস্থান (১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ), মার্ভ (১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং পাঞ্জাব অধিকার করে। এই সব স্থান দখল করার ফলে রুশ সীমান্ত পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ চুক্তি দ্বারা মধ্য এশিয়ায় উভয়ের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট হয়।

এশিয়ার পূর্বদিকে চীনের অভ্যন্তরে টাইপিং বিদ্রোহ (Taiping Rebellion)-এর সুযোগ নিয়া রাশিয়া চীনকে আইগুনের সন্ধি (Treaty of Aigun) স্বাক্ষর করিয়া আমুর (Amur) নদীর অঞ্চলে কিছু জায়গা দিতে বাধ্য করে। দু'বৎসর পর ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে চীনের বন্ধু হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিয়া রাশিয়া চীনের নিকট হইতে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলস্থ অঞ্চল দখল করিয়া ভ্লাডিভস্টক্ (Vladivostok) বন্দরটি নির্মাণ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলটি দখল করিবার ফলে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা কোরিয়া (Korea)-র নিকটবর্তী হইল এবং মাঞ্চুরিয়া (Manchuria) রুশ সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) মনরো নীতি ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আমেরিকা মহাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নিরাপত্তা সাধন ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়। ফলে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (Philippine Islands) এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (Hawaian Islands) এবং স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জ (Samoan Islands) দখল করে।

যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ

এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড)-রা পশ্চাদপদ ছিল না। জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সিলিবিস দ্বীপপুঞ্জ ও নিউগিনির একাংশতে ওলান্দাজ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে।

ওলন্দাজ উপনিবেশ

চীনে সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লব (Reform and Revolution in China) :

১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানের নিকট চীনের পরাজয় চীনজাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধের উদ্রেক করে। যুবক সম্রাট কুয়াং সু (Kuang Hsu) সংস্কারপন্থী ছিলেন। তিনি কাং ইউ উই (K'ang Yu Wei) নামক এক উদারপন্থী নেতার পরামর্শে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কতকগুলি সংস্কার ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য নূতন নূতন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন, বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের ব্যবস্থা করেন এবং বিদেশে ভ্রমণ

সম্রাট কুয়াং সু কর্তৃক সংস্কার ঘোষণা

ও বিজ্ঞানের প্রসারে উৎসাহ দান করেন। ইহা ভিন্ন তিনি কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় সরকারী পদ (sinecures) উচ্ছেদ করেন এবং সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের পুনর্গঠন করেন।

সম্রাটমাতা জু সি কর্তৃক সংস্কার বাতিল

কিন্তু বিধবা মাতা জু সির (Tzu Hsi) নেতৃত্বে সংরক্ষণশীল দল এই সংস্কারের বিরোধিতা করিয়া ইহা কার্যকরী করিতে দেয় নাই। সম্রাট কুয়াং স্থকে বন্দী করা হয়। জু সি সম্রাটের সংস্কারগুলি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন।

জু সি কর্তৃক সংস্কার ঘোষণা

কিন্তু বক্সার বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দে) বিধবা মাতা জু সি এবং অন্যান্য সংরক্ষণশীল ব্যক্তিদের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করাইল। ইহা ছাড়া ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ চীনজাতির মধ্যে সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে এই দাবি সোচ্চার হইয়া উঠে। ফলে জু সি কতকগুলি সংস্কার সাধন করিয়া মাঞ্চুশাসনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। তিনি সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের আদেশ দেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহ দান করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। রেলপথ নির্মাণের কাজ পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়। সর্বোপরি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য বিদেশে একটি কমিশন পাঠান হয়। এই কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। নয় বৎসরের মধ্যে একটি জাতীয় প্রতিনিধিসভা ডাকা হইবে ইহাও ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন সংস্কার, আরক্ষা বাহিনী সংস্কার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি কাজে হাত দেওয়া হয়। কিন্তু জু সির মৃত্যুর পর (১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে) সংস্কারের কাজ বন্ধ হইয়া যায়, ফলে বিপ্লবী দল ডাঃ সান-ইয়াত-সেনের (Sun-Yat-Sen) নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন আরম্ভ করে।

সান-ইয়াত-সেনের দ্বারা প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন

ডাঃ সান ক্যান্টনে প্রজাতান্ত্রিক দল বা কুয়োমিন-তাং (Kuomin-tang) গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে চীনের দক্ষিণে এভাবে প্রচারকার্য শুরু হইলে সরকার পক্ষ জাতীয় সভা আহ্বান করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু সান-ইয়াত-সেন মাঞ্চুশাসনের সহিত কোনপ্রকার মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন না। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সান-ইয়াত-সেনের প্রজাতান্ত্রিক দল মাঞ্চুবংশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক অস্থায়ী

প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করিয়াছিল। সান-ইয়াত-সেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। মাঞ্চুবংশের নাবালক সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১৯১২ খ্রীস্টাব্দে)। ফলে চীনদেশে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের উত্থান (Rise of U. S. A and Japan as Imperialistic Powers) :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মনরো নীতি পরিত্যাগ করিয়া নিরাপত্তা ও বাণিজ্য-স্বার্থরক্ষার জন্য আমেরিকা ক্রমেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী নীতি এশিয়া, ইওরোপ ও আমেরিকা এই তিন মহাদেশেই সমপরিমাণ উৎসাহে অনুসরণ করে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে কানাডা এবং আলাস্কার সীমারেখা সংক্রান্ত বিবাদে থিয়োডোর রুজভেল্টের দৃঢ়তার জন্যই কানাডা আলাস্কার দাবি মানিয়া নিতে বাধ্য হয়।

কানাডা-আলাস্কার সীমা সংক্রান্ত বিবাদ

আমেরিকা ভূভাগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'প্যান আমেরিকানিজম্' (Pan-Americanism)-এর মধ্যে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা কয়েকটি 'প্যান-আমেরিকান' কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিল।

প্যান আমেরিকানিজম্

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থরক্ষার জন্য আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-৫) আমেরিকার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমেরিকার কূটচালের জন্য পোর্টস্‌মাউথের সন্ধিতে রাশিয়াকে যতদূর অপমানিত করিতে পারিত ততদূর পারে নাই। এইজন্য আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় জাপানীদের বসবাস-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে এই মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট আমেরিকার নৌবাহিনীর শক্তিপ্রদর্শনের জন্য এক আমেরিকান নৌবাহিনী পৃথিবী প্রদক্ষিণে প্রেরণ করেন।

আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

ইহার পর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপূরক হিসাবে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপন আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্র হইতে পানামা রাজ্যটিকে সামরিক ভীতি প্রদর্শন দ্বারা আমেরিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হয়। পরে পানামা রাজ্য হইতে পানামা খাল খননের জন্য জমি ক্রয় করিয়া আমেরিকা পানামা খালটি খনন করায়। এই খাল খননের ফলে মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগরের উপর আমেরিকার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। নানাপ্রকার ফন্দিফিকির দ্বারা 'ক্যানাল জোন' (Canal Zone)-এ আমেরিকা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য পানামা খাল খনন

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করিলেও যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর আমেরিকা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু জার্মানীর ডুবো জাহাজের আক্রমণে আমেরিকার বাণিজ্যস্বার্থ বিনষ্ট হইতে থাকিলে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়।

জাপানের উত্থান—

সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দ) জয়লাভের ফলে সিমনোসেকির সন্ধি (Treaty of Shimonoseki) দ্বারা জাপান চীনদেশ হইতে ফরমোসা (Formosa) এবং পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ (Pescadores Islands) লাভ করে। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানী জাতির মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং এই সন্ধি জাপানী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

ইহার পর রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫ খ্রীস্টাব্দ) জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাসে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। এই যুদ্ধের অবসানে পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth) দ্বারা (১) জাপান কোরিয়া দখল করে, (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপে রাশিয়ার যাবতীয় অধিকার জাপান লাভ করে, (৩) মাঞ্চুরিয়া রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং শাখলিন দ্বীপটিও রাশিয়া জাপানকে দিতে বাধ্য হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক অন্যায়মূলক বিস্তার নীতি অবলম্বন করে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনদেশে জার্মান অধিকৃত সাণ্টুং অঞ্চল এবং কিয়াও-চাও দখল করে।

অনুশীলনী

(1) Sketch the career of Karl Marx. Write a short essay on Marxian Communism.
(কার্ল মার্কসের জীবনী আলোচনা কর। মার্কসের মতবাদ প্রবন্ধাকারে আলোচনা কর।)
উঃ 'কার্ল মার্কসের জীবনী' ১২৫-১২৭ পৃষ্ঠা ও 'মতবাদ' ১২৭-১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(2) Discuss the causes of Imperialistic expansion in the Nineteenth century.
(উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের কারণগুলি আলোচনা কর।)
উঃ ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

(3) Discuss fully the history of the partition of Africa among different European Powers.
(ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা কর।)
উঃ ১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

(4) How were the colonial collisions among different European powers in Africa solved ?
(আফ্রিকাতে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক সংঘর্ষ কিভাবে মিটমাট হইয়াছিল আলোচনা কর।)
উঃ ১৩৩-১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(5) Discuss the partial partition of Asia by European powers.
(ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক এশিয়াকে আংশিকভাবে কিভাবে ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছিল আলোচনা কর।)
উঃ ১৩৫-১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(6) Write a short account of the Reform and Revolution in China.
(চীনের সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।)
উঃ ১৩৭-১৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(7) What do you know of the rise of U. S. A. and Japan as Imperialistic powers in the Nineteenth century.
(উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে উত্থানের সম্বন্ধে যাহা জান আলোচনা কর।)
উঃ ১৩৯-১৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

একাদশ অধ্যায়

অটোমান সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ
(Dismemberment of the Ottoman Empire)

বার্লিনের সন্ধি হইতে বলকান যুদ্ধগুলি পর্যন্ত বলকান জাতীয়তাবাদের বিকাশ (Development of Balkan Nationalism from the Treaty of Berlin to the Balkan Wars): ক্রিমিয়ার যুদ্ধের দ্বারা নিকট প্রাচ্য সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয় নাই। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলকান অঞ্চলে স্লাভ এবং গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় নাই। রাশিয়ারও এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা প্যারিসের সন্ধির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তদুপরি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বৃহৎ শক্তিবর্গের পরস্পরের স্বার্থদ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে পরবর্তিকালে স্বাধীনতাকামী বল্‌কান জাতির রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি রাশিয়ার প্যারিস সন্ধির শর্তাদি বানচাল করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা এবং তুর্কী সুলতানের সংস্কার সাধনে নিষ্ক্রিয়তার কারণে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার পুনরুদ্ভব ঘটে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর নিকট প্রাচ্য সমস্যার প্রকৃতি

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা তুরস্কের সুলতান মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া নামে দুই প্রদেশকে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা স্থাপন, আইনপ্রণয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা দানে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসনের এই সকল প্রতিশ্রুতি তাহাদের স্বাধীনতা এবং ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিয়াছিল। মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া একত্রিত হইয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করুক ইহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে ইহা রাশিয়ার অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারিবে। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের আপত্তিতে ইহাদের ঐক্যস্থাপন সম্ভব হয় না। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্যারিস নগরীতে এক অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া স্থির করে যে মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়া তুরস্কের অধীন পৃথক প্রদেশ হিসাবেই থাকিবে কিন্তু তাহারা নিজ নিজ শাসনকর্তা নির্বাচন করিতে পারিবে। কিন্তু মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ার অধিবাসীদের নিকট ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয়

মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

নাই। প্যারিসের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া [illegible] [illegible] উভয় [illegible] আলেকজাণ্ডার কৌজা (Alexander Couza) নামে এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নির্বাচন করে। এবিষয় লইয়া ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইলেও ইতালীর সহিত অস্ট্রিয়ার তখন যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া মোলডাভিয়া এবং ওয়ালাচিয়ার একই শাসকের অধীনে স্থাপিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে উভয় রাষ্ট্রের সংযুক্তি ঘোষণা করা হইল। সংযুক্ত প্রদেশ দুটির রাজধানী হইল বুখারেস্ট এবং ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের নাম হইল রুমানিয়া।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ মোলডাভিয়া এবং ওয়ালচিয়া'র সংযুক্তি এবং রুমানিয়া রাষ্ট্র গঠন

রুমানিয়া রাজ্যের গঠনের পর প্রায় দশ বৎসর নিকট প্রাচ্য সমস্যার কোন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময় তুর্কীর সুলতান খ্রীস্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাইয়াছিলেন ফলে বলকান দেশগুলির মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। স্লাভ জাতি অধ্যুষিত বলকান দেশগুলির মধ্যে স্লাভ রাশিয়ার চরবা (Russian agents) প্রচারকার্য চালাইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতির সহায়তা করে।* সার্বিয়া, বোসনিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং বুলগেরিয়াতে বহু গোপন সমিতি স্থাপিত হয়।

বলকান দেশগুলিতে তুরস্কের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ

১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে বোসনিয়া এবং হারজেগোভিনা নামক স্থানে তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হইলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা পুনরায় দেখা দেয়। এই অঞ্চলের আন্দোলনের পশ্চাতে ত্রিবিধ কারণ ছিল; অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও জাতীয়তাবোধক। অন্যান্য বল্‌কান দেশগুলির ন্যায় এই দুইস্থানেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। উপরন্তু উভয় স্থানেই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। ফলে একদিকে কৃষকগণ তুর্কী রাজকর্মচারীদের শোষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, অপরদিকে জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্পত্তিরক্ষার জন্য অনেক খ্রীস্টান জমিদারই ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া তুর্কী রাজকর্মচারীদের অপেক্ষা অধিকতর কঠোরভাবে কৃষকদিগকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে হারজেগোভিনার কৃষক সম্প্রদায় করদান অথবা বিনাপারিশ্রমিকে শ্রমদান বন্ধ করে। তুরস্কের সুলতান উহাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে সেই সৈন্যবাহিনী

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় স্বাধীনতা আন্দোলন

*"Pan-Soviet agents of Russia were...at work, stirring up racial consciousness and national hostility"—Ketelby, P. 216.

পরাজিত হয়। এই বিদ্রোহ ক্রমে সমস্ত বলকান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। বোসনিয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করে। ক্রমে সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা এই আন্দোলনে যোগদান করিলে বিপ্লব ক্রমেই তুরস্কের নিকটবর্তী হয়। ফলে তুরস্কের সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে এবং বহু সহস্র নরনারী ও শিশুকে হত্যা করে।

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ড

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ড ("Bulgarian Atrocities") ইওরোপের খ্রীস্টান দেশগুলিতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে গ্লাড্‌স্টোন (Gladstone) তুরস্কের সুলতানকে ইওরোপ হইতে বিতাড়িত করিবার দাবি উত্থাপন করেন।* কিন্তু তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী তুরস্কের বিরোধিতা করিয়া তুরস্কের দুর্বলতা বৃদ্ধি এবং ফলে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তাঁহার মতে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু হইল রাশিয়া। বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের জন্য অপর ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সক্রিয় বিরোধিতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু রাশিয়া এবিষয়ে নিরপেক্ষ না রহিয়া ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তুরস্ক সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অস্ট্রিয়া এবং রুমানিয়ার সহিত নিরপেক্ষতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া রুশ সৈন্য দানিউব অঞ্চল অতিক্রম করিয়া তুরস্কের রাজধানী কনস্টেনটিনোপলের দিকে অগ্রসর হইলে তুরস্ক রাশিয়ার সহিত স্যান-স্টিফানো (San-Stephano)-র সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়।

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

স্যান-স্টিফানোর সন্ধিদ্বারা, প্রথমত, তুরস্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইল। দ্বিতীয়ত, বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার উপর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম আধিপত্য স্থাপিত হইল। তৃতীয়ত, রাশিয়া বাটুম (Batum), কারস্ (Kars), বেসারবিয়া (Bessarabia) ও দব্রুদজার (Dobrudja) এক অংশ লাভ করিল। চতুর্থত, স্যান-স্টিফানোর সন্ধির আরেকটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হইল এক বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন। দানিউব নদী হইতে ইজিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ম্যাসিডোনিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ড লইয়া এক নূতন বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। ইহা তুরস্কের করদ রাজ্য হিসাবে বিবেচিত

স্যান-স্টিফানোর সন্ধির শর্তগুলি

* "He...urged that Turks be expelled from Europe "bag and baggage."—Hazen—P 562.

হইবে কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইহার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সামরিক বাহিনী থাকিবে।

স্যান স্টিফানোর সন্ধি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের প্যারিসের সন্ধির রুশবিরোধী শর্তগুলি বাতিল করিয়া বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে।*

রাশিয়া কর্তৃক এককভাবে প্যারিসের সন্ধির শর্তাদি নাকচ করায় পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলিতে, বিশেষত ইংলণ্ডে দারুণ প্রতিবাদ শুরু হয়। একমাত্র রাশিয়া এবং বুলগেরিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশ স্যান স্টিফানো সন্ধির শর্তাদিতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। বলকান অঞ্চলে গ্রীস এবং রুমানিয়া অসন্তুষ্ট হইল। ম্যাসিডোনিয়া পর্যন্ত রুশ প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় গ্রীস অসন্তুষ্ট হয় এবং বেসারাবিয়া রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় রুমানিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া রাশিয়া কর্তৃক প্যারিসের সন্ধির পরিবর্তনে এবং রুশ-প্রাধান্য বিস্তারে ভীত হয়। ভূমধ্যসাগরের দিকে রাশিয়ার বিস্তারে ইংলণ্ডও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সন্ত্রস্ত হয়। ইহার ফলে স্যান স্টিফানোর সন্ধি একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে উত্থাপন করিবার জন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজ্‌রেলী এবিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়া ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করে। রাশিয়া প্রথমে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দাবি উপেক্ষা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে ইহা আশঙ্কা করিয়া এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান স্টিফানো সন্ধির শর্তাদি পুনর্বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে স্বীকৃত হয়।

ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক স্যান স্টিফানো সন্ধির বিরোধিতা

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বার্লিনে বিসমার্কের সভাপতিত্বে এক আন্তর্জাতিক বৈঠকে স্যান স্টিফানো সন্ধির শর্তাদি পরিবর্তন করিয়া 'বার্লিন চুক্তি' নামে এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়া বার্লিন চুক্তির শর্তগুলি মানিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে, প্রথমতঃ, বেসারাবিয়া, কারস্‌, বাটুম এবং আর্মেনিয়ার একাংশের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা তুরস্ক স্বীকার করিয়া লইল। রাশিয়াকে বেসারাবিয়া দানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রুমানিয়া দবরুদ্‌জা লাভ করে। তৃতীয়তঃ, অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনার অধিকার লাভ করে। এই দুই দেশের মধ্যবর্তী

বার্লিন কংগ্রেস এবং বার্লিন চুক্তি

* "It wiped out the Treaty of Paris and promised her once again the dominance of the Belkans."—Ketelby. P. 320.

নভিবাজার (Novibazar)-এ সৈন্য রাখিবার অধিকার অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, স্যান স্টেফানোর সন্ধিদ্বারা যে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল উহাকে তিন-ভাগে ভাগ করা হয়। ম্যাসিডোনিয়া তুরস্ক সুলতানের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব-রুমেলিয়া তুরস্কের অংশই রহিল কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিল এবং তুরস্কের সুলতান খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ভিন্ন অপর কাহাকেও রুমালিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবেন না স্থির হইল। অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং এখানে সুলতানের প্রভাব নামে মাত্র রাখা হইল। পঞ্চমতঃ, ইংলণ্ড তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ রক্ষার জন্য সাহায্যদানের শর্তে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপটি দখল করে।

বার্লিন চুক্তির সমালোচনা

বার্লিন চুক্তি নিকট প্রাচ্য সমস্যার কোন যুক্তিযুক্ত বা স্থায়ী সমাধান করিতে সক্ষম হয় নাই।* প্রথমতঃ, তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা রোধ করিয়া বার্লিন কংগ্রেস উহার অনিবার্য পতনের সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বার্লিন চুক্তি বলকান অঞ্চলের জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করিয়া পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া এই দুই অংশ গঠন করিয়া বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যেই (১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ) এই দুই অংশ একত্রিত হইয়া ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার উৎপত্তি করিয়াছিল। ম্যাসিডোনিয়াকে স্যান স্টিফানো সন্ধিদ্বারা গঠিত বিশাল বুলগেরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অথবা মানবতা কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীস্টানগণ তুরস্ক শাসনাধীনে আরও বহুকাল নির্যাতিত হইয়াছিল। ম্যাসিডোনিয়াকে তুরস্কের অধীন রাখার ফলেই ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করার ফলে ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বুলগেরিয়া বিভক্ত

তৃতীয়তঃ, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন অঞ্চল দ্বারা সার্বিয়াকে পরিবেষ্টিত করিয়া বার্লিন কংগ্রেস সার্বিয়ার অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করিয়াছিল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে বলকান সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং এই সমস্যাই প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা করে।

সার্বিয়া অসন্তুষ্ট

*"The treaty of Berlin was not a final solution of the Eastern Question."—Hazen, "Europe since 1815', P 565.

চতুর্থতঃ, ইংলণ্ড সাইপ্রাস দখল করিয়া তুরস্ক সংরক্ষণ নীতির অবমাননা করিয়াছিল। তুর্কী সুলতানের মিত্র হিসাবে বার্লিন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া মিত্রতার পুরস্কার স্বরূপ সাইপ্রাস দখল করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ বলা যায়। ইংলণ্ডের সততায় সন্দিহান হইয়া তুরস্ক ভবিষ্যতে জার্মানীর দিকে ঝুঁকিয়াছিল।

ইংলণ্ডের স্বার্থপর নীতি

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ডিজেরলী এই সময় ঘোষণা করেন তিনি সসম্মানে শান্তিরক্ষা করিয়াছেন ("Peace with honour") এবং ইওরোপে তুরস্কের প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছেন ("There is again a Turkey in Europe")। ইহা সত্য যে বার্লিন চুক্তির শর্তানুসারে তুরস্ক স্যান স্টিফানোর সন্ধিদ্বারা হৃত স্থানগুলির মধ্যে মোট ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এবং প্রায় পঁচিশ লক্ষ প্রজা ফিরিয়া পাইয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক তাহার সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অংশ হারাইয়াছিল যাহা উদ্ধার করিবার ভবিষ্যতে আর কোন সম্ভাবনা ছিল না।*

উপসংহারে ইহা বলা যায় যে বার্লিন চুক্তিতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান ত হয়ই নাই, উপরন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পরবিরোধী স্বার্থপর নীতির ফলে বলকান অঞ্চল ইওরোপের আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। ভবিষ্যতে যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হইতে পারে ইহা নিশ্চিত ছিল।**

বার্লিন কংগ্রেসের পরবর্তিকালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার বৈশিষ্ট্য (১৮৭৮-১৯১৪)

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের পর বলকান দেশগুলির পরস্পর বিবাদ এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সংঘাত পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এক জটিল সমস্যায় পরিণত হয়। বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, আর্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এই সমস্যার জটিলতা দেখা যায়।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা বার্লিন চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়াকে একত্রিত করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স আলেকজাণ্ডার (Alexander of Battenburg) এই ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেন। পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়ার ঐক্যসাধনে স্টিফেন

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের পর বুলগেরিয়ার ঐক্যসাধন

*"The Porte, it is true, recovered two and a half millions of people and 30,000 square miles that she had lost at San Stefano, but her empire, reduced by more than half its area was mutilated beyond revival"—Ketelby, P 322.

**"It was more than ever certain that the Balkan volcano would erupt again in the near future"—Thompson, "Europe since Napoleon". P 432.

স্ট্যাম্বোলোভ্ (Stephan Stambolov) নামে একজন বুলগেরিয়ার নেতার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বল্কান অঞ্চলের শক্তি-সাম্য ("Balance of Power") নষ্ট হইয়াছে এই অজুহাতে সার্বিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া সার্বিয়ান সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার চাপে বুলগেরিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং বুখারেস্ট্ (Bucharest)-এর সন্ধিদ্বারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে উভয় দেশ স্বীকার করে।

সার্বিয়া কর্তৃক বুলগেরিয়া আক্রমণ

সার্বিয়ার পরাজয়

এদিকে ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষত রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের বলকান্ নীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড তুরস্কের উপর চাপ দিয়া বুলগেরিয়া রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করে। রাশিয়া ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় এবং এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা আলেকজাণ্ডারকে বুলগেরিয়ার শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। পরবর্তী শাসক স্যাক্সকোবার্গ গোথার ফার্ডিনেণ্ড (Prince Ferdinand of Saxe-Coburg-Gotha) ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।

তুরস্ক কর্তৃক বুলগেরিয়াকে স্বীকৃতি দান

আর্মেনিয়ার সমস্যা (Armenian Problem)

আর্মেনিয়ার ঘটনা নিকট প্রাচ্য সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। তুর্কী সরকারের দমননীতির ফলে আর্মেনিয়াবাসী খ্রীস্টানদের দুর্দশার সীমা ছিল না। বার্লিনের চুক্তি এবং সাইপ্রাসের চুক্তিতে ইংলণ্ড, আর্মেনিয়াবাসীদের উপর ভাল ব্যবহার করিবার প্রতিশ্রুত তুরস্ক সরকারের নিকট হইতে আদায় করিয়াছিল কিন্তু কার্যত এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই। ফলে আর্মেনিয়ানগণ তুরস্ক সরকারের নিকট হইতে সুযোগ সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন সুরু করিলে তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ দেখিলেন যে, আর্মেনিয়ায় বুলগেরিয়ার মত আরেকটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে। সুতরাং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আর্মেনিয়ার বিপ্লবীগণ আন্দোলন শুরু করিলে তুর্কী সরকার অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮৯৪ হইতে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট ৫০,০০০ আর্মেনিয় তুরস্ক সরকারের অত্যাচারে প্রাণ হারায়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কনস্টেনটিনোপলে অবস্থানকারী আর্মেনিয়গণ তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে

আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন

তুরস্কের দমননীতি

বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছয় হাজার আর্মেনিয়কে হত্যা করা হয়। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত থাকে। রাশিয়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই তাহার কারণ ধর্মের দিক দিয়া আর্মেনিয়গণ রুশদের ন্যায় গ্রীক খ্রীস্টান ছিল না। অস্ট্রিয়া ও জার্মানী তখন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তুরস্কের সুলতানের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছিল। শুধু ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিবাদ তুরস্কের সুলতান গ্রাহ্য করিলেন না। ইংলণ্ডের তুরস্ক সংরক্ষণ নীতির এইরূপ পরিণাম হয় যাহার জন্য তদানীন্তন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড সল্‌সবেরি (Lord Salisbury) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ককে সমর্থন করিয়া এতদিন ইংলণ্ড ভুল করিয়াছে।*

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ছয় হাজার আর্মেনিয় হত্যা

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা এবং ইংলণ্ডের প্রতিবাদ

গ্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ (Graeco-Turkish War)

বলকান অঞ্চলে গ্রীসের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা নিকট প্রাচ্য সমস্যার আরেকটি অধ্যায়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের চাপে তুরস্ক ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসকে ইপাইরাস (Epirus)-এর এক-তৃতীয়াংশ এবং থেসালীর (Thessaly) বেশীর ভাগ অংশ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গ্রীসের আকাঙ্ক্ষা ইহাতে পরিতৃপ্ত হয় নাই। গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপ ক্রীট তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তুর্কীর শাসনে ক্রীটবাসীরা বলকান অঞ্চলে অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় অত্যাচারিত হইতেছিল। ফলে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তাহারা বার বার বিদ্রোহ করে কিন্তু তুরস্ক সুলতানের নিকট হইতে মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছাড়া অন্য কিছু আদায় করিতে সাফল্য লাভ করে নাই। ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ক্রীটবাসীরা ভেনিজেলস (Venizelos)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ক্রীটের সাথে সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। গ্রীস ক্রীটবাসীদের সাহায্যের জন্য এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত থেসালীর অংশ আক্রমণ করে। ফলে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ)। এই যুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যপুষ্ট তুরস্কের সুলতান সহজেই গ্রীসকে পরাজিত করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করে। আর্মেনিয়

গ্রীসবাসীদের জাতীয়তা স্পৃহা

ক্রীটের বিদ্রোহ

গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ

*"That in supporting Turkey hitherto England had to put her money on the wrong horse"—Ketelby P 323.

সমস্যার ন্যায় এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, ফলে এই সমস্যা সমাধানে অযথা বিলম্ব হয়। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালির চাপে তুরস্কের সুলতান ক্রীটে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই চারি দেশের এক যৌথ সমিতির হাতে ক্রীটের শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। গ্রীসের রাজা জর্জের পুত্র যুবরাজ জর্জ ক্রীটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে ক্রীটবাসীরা তুরস্কে বিপ্লবের সুযোগ লইয়া স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের বিরোধিতার জন্য তাহাদের বিপ্লব সাফল্য লাভ করে নাই। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধের পর ক্রীট গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়।

তুরস্কে বিপ্লবী আন্দোলন (Revolution in Turkey)

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় এক নূতন এবং জটিলতাপূর্ণ সমস্যা দেখা দেয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এক বিপ্লবী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন "তরুণ তুর্কী" নামে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ দ্বারা পরিচালিত হয়। ঐক্য এবং প্রগতির আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া এই সমিতি তুরস্ক সুলতানের অত্যাচারী শাসনের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল। প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্ট স্থাপন, বাক্ স্বাধীনতা এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা লাভ করা এই সমিতির আদর্শ ছিল। এই গুপ্ত আন্দোলন সমস্ত তুরস্কে এমনকি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে যে শাসনতন্ত্র তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন কিন্তু দু'বৎসর পর বাতিল করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় কার্যকরী করিবেন বলিয়া জানাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পার্লামেণ্ট স্থাপন করেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই আবদুল হামিদ এই সকল উদারনৈতিক সংস্কার নাকচ করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠেন। ফলে তরুণ তুর্কীদল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে সিংহাসনে স্থাপন করে (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ।)

"তরুণ তুর্কী" আন্দোলন

সুলতান দ্বিতীয় হামিদের পদচ্যুতি এবং পঞ্চম মহম্মদকে সিংহাসনে স্থাপন

এই বিপ্লবের প্রভাব সমগ্র বল্‌কান অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। বুলগেরিয়া রাশিয়ার সমর্থনে এই সুযোগে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন হইয়া যায়। অস্ট্রিয়াও বোসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অঞ্চল দুটি দখল করিয়া লয়। ইতালি তুরস্কের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আফ্রিকাতে তুরস্কের সাম্রাজ্যের অংশ ট্রিপোলি (Tripoli) দখল করে।

তরুণ তুর্কী আন্দোলনের ফলাফল

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া এবং হারজেগোভিনা দখল হওয়ায় সার্বিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। সার্বিয়ার ন্যায় এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ স্লাভ্ জাতির লোক ছিল। ইহা ভিন্ন বল্‌কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে রাশিয়ার অসন্তোষ ক্রমেই বলকান রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করে। এই জটিলতাই ১৯১২ ও ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বলকান অঞ্চলে জটিলতা

প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ (The First Balkan War)

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সাফল্যের পরও তুরস্ক সরকার অত্যাচারের দ্বারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই সময় গ্রীকমন্ত্রী ভেনিজেলোস (Venizelos) গ্রীস, মন্টিনেগ্রো, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া এই কয়টি দেশ লইয়া 'বলকান লীগ' নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সরকারের অত্যাচারকে বাধা দেওয়া। এদিকে তুরস্ক সরকার ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীস্টানদিগকে দমননীতির দ্বারা অনুগত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। বলকান লীগ ম্যাসিডোনিয়ার পক্ষ লইয়া ম্যাসিডোনিয়ায় প্রতিশ্রুত সংস্কার কার্যকরী করিবার জন্য তুরস্ক সুলতানের উপর চাপ দেয়। কিন্তু তুরস্ক ম্যাসিডোনিয়ার প্রতি নীতি পরিবর্তন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বল্‌কান লীগ ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষেধ সত্ত্বেও চতুর্দিক হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই বল্‌কান যুদ্ধে তুরস্ক সর্বত্র পরাজিত হইয়া লণ্ডনের চুক্তি (Treaty of London) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয় (১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ)। এই চুক্তির শর্তানুসারে কনস্টানটিনোপল সহ থ্রেসের ক্ষুদ্র একাংশ বাদে সমগ্র বলকান অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করে।

'বলকান লীগ'

বলকান লীগ কর্তৃক তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

লণ্ডন চুক্তি

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ (The Second Balkan War)

প্রথম বলকান যুদ্ধের পর ম্যাসিডোনিয়ায় আধিপত্য নিয়া বুলগেরিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যে এক বিবাদ শুরু হয়। ম্যাসিডোনিয়ায় বুলগার জাতি এবং স্লাভ জাতি উভয়ই বাস করিত। এই বিবাদ নিয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধে। মন্টিনিগ্রো, গ্রীস এবং রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে এবং বুলগেরিয়া পরাজিত হয়। বুখারেস্টে (Bucharest)-এর সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়া ম্যাসিডোনিয়ার উপর দাবি ত্যাগ করে। এই সন্ধি দ্বারা রুমানিয়া ডবরুজা

বুখারেস্টের সন্ধি

লাভ করে। এই যুদ্ধের সুযোগে তুরস্ক এড্রিয়ানোপল এবং থ্রেসের একাংশ পুনর্দখল করিয়াছিল। বুখারেস্টের সন্ধিতে এই শর্ত অনুমোদিত হয়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের ফলে কনস্টানটিনোপল এবং থ্রেসের অংশ ভিন্ন তুরস্ক সাম্রাজ্য বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীনতা লাভ করিলেও বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সৌহার্দ্যভাব স্থাপিত হয় নাই। সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার শত্রুতা বৃদ্ধি পায় যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্য বিলুপ্ত

অনুশীলনী

(1) Describe the course of events leading to the Treaty of San Stefano and the Congress of Berlin.

(স্যানস্টিফানোর চুক্তি এবং বার্লিন কংগ্রেস পর্যন্ত নিকট প্রাচ্য সমস্যার ঘটনাগুলি আলোচনা কর।

(উঃ ১৪২-১৪৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

(2) Discuss the main provisions of the Treaty of Berlin. Did the treaty satisfy the political aspirations of the Balkan nations ?

(বার্লিন চুক্তির প্রধান শর্তগুলি আলোচনা কর। এই চুক্তি কি বলকান জাতিগুলির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল ?

(উঃ ১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।)

(3) Give an account of the nature of the Balkan problem from 1878-1914.

(১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বলকান সমস্যার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(উঃ ১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠা দেখ।)

———

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তাহার ফলাফল
(First World War and its aftermath)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি (Causes of the War) এবং যুদ্ধে যোগদানকারী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি (and Major Participants)

১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি আলোচনা করিলেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি স্পষ্ট হয়। ইওরোপ এই সময়ের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'যুদ্ধ-শিবিরে' পরিণত হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল বলা যায়।

ফ্রান্সের আলসাস-লোরেন পুনরাধিকার করিবার সঙ্কল্প

প্রথমত, সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স জার্মানীকে আল্‌সাস-লোরেন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু ভবিষ্যতে এই দুইটি স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করিবার আশা ফ্রান্স ত্যাগ করিতে পারে নাই। ফরাসী জাতির মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লৌহখনি পরিপূর্ণ লোরেন অঞ্চল জার্মানীর হাতে চলিয়া যাওয়া ফ্রান্স কোনমতেই ভুলিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়ত, বিসমার্ক কর্তৃক জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে 'ট্রিপল এলায়েন্স' (Tripple Alliance) গ্রহণ এবং উহার প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া কর্তৃক 'ট্রিপল আঁতাত' (Triple Entente) স্বাক্ষর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির সহায়ক হইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের বিসমার্কের পদত্যাগের পর জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম বিস্মার্কের অনুসৃত সাবধানী নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি পৃথিবীর রাজনীতিতে (Weltpolitik জার্মানীর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। জার্মান জাতির) শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক ব্যাপক ঔপনিবেশিক ও নৌনীতি গ্রহণ করেন। ফলে ইংলণ্ডের সহিত জার্মানীর বিরোধ শুরু হইয়াছিল। এদিকে রাশিয়া জার্মানীর সাথে রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্সের সাথে চুক্তি (Dual Alliance) স্বাক্ষর করে। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের পরস্পরের ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া একটি মৈত্রী চুক্তি (Entente Cordiale)

ইওরোপ দুইটি সমরিক শিবিরে পরিণত—'ট্রিপল এলায়েন্স' ও 'ট্রিপল আঁতাত'

স্বাক্ষর করে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অপর এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ইওরোপ দুইটি পরস্পর বিরোধী যুদ্ধ শিবিরে পরিণত হয়।

ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা

তৃতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইওরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক বিস্তার লইয়া এক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয় যাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ বলা যাইতে পারে। আফ্রিকা এবং এশিয়াতে বিস্তারনীতির ফলেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেরই শিল্পপতিগণ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। যুদ্ধ ভিন্ন এই সকল জিনিসপত্র বিক্রয় করিবার সুযোগ ছিল না। ফলে শিল্পপতিগণ যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল।

উৎকট জাতীয়তাবোধ

চতুর্থত, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে ইওরোপে উৎকট জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়। এই উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানীতে চরমভাবে প্রকাশ পায়। জার্মান ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদের জন্য জার্মান পিতৃভূমি (Deutschland) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এই ধারণা জার্মানদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। কেবল জার্মানীতে নয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপান প্রভৃতি দেশেও এ সময় স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি হয়।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার বিরোধ

সর্বশেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার বিবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা যায়। সার্বিয়া ছিল স্লাভ্‌জাতি অধ্যুষিত দেশ এবং সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার স্লাভ্ অঞ্চলগুলি দখল করিতে ইচ্ছুক ছিল। ইহা ভিন্ন সার্বিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে একটি বন্দর দখল করিতে চেষ্টা করে। অস্ট্রিয়ার স্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির সার্বিয়ার সাথে সংযুক্তির ইচ্ছা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। অস্ট্রিয়া সরকারকে ভয় দেখাইবার জন্য এই সকল অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের গোপন সমিতি সৃষ্টি হয়। 'ব্ল্যাক হ্যাণ্ড' (Black Hand) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিসকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল।

সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জুন আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার পত্নী বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো (Serajevo) ভ্রমণে আসিলে সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের একজন আকস্মিকভাবে গুলি করিয়া আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার স্ত্রী সোফির প্রাণনাশ করে।

সেরাজিভোর হত্যাকাণ্ড বারুদখানায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করে। অস্ট্রিয়া সরকার সার্বিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে এবং সার্বিয়াকে 'আততায়ীর জাতি' (race of assassins) বলিয়া অভিযুক্ত করে। অস্ট্রিয়া সরকার জার্মানীর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৩শে জুলাই (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ) সার্বিয়া সরকারের নিকট কতকগুলি কঠোর শর্ত সম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করে। এই চরমপত্রে সার্বিয়া সরকারের (১) অস্ট্রিয়াবিরোধী প্রচার কার্যের প্রতিবাদ করা হইল, (২) সার্বিয়া সরকারকে অস্ট্রিয়াবিরোধী প্রচারকার্যকে সরকারীভাবে নিন্দা করিতে বলা হইল, (৩) যাহারা এইসব প্রচারকার্যে লিপ্ত আছে এমন সংবাদপত্র, সমিতিকে নিষিদ্ধ করিতে বলা হইল এবং সরকারী কর্মচারী ও স্কুল শিক্ষকদের পদচ্যুত করিতে বলা হইল, (৪) সেরাজিভো হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত এমন দুইজন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে বলা হইল, (৫) আর্কডিউক হত্যার তদন্ত ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে সার্বিয়া সরকারকে বলা হইল, (৬) ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর দাবি করা হয়।

সার্বিয়া সরকারের নিকট অস্ট্রিয়ার চরমপত্র

সার্বিয়া সরকার এই চরমপত্রের উত্তর ২৫শে জুলাই (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ) প্রেরণ করে। ইহাতে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে উল্লিখিত কিছু দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় কিন্তু সার্বিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এমন দাবিগুলি মানিতে অস্বীকার করা হয়। সার্বিয়ার উত্তর অস্ট্রিয়ার মনঃপূত হয় নাই; ফলে ২৬শে জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সার্বিয়ার উত্তর

অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাশিয়া অস্ট্রিয়ার দাবিগুলি বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য-মূলক মনে করিয়া ঘোষণা করিল যে, সার্বিয়ার ভাগ্য বিপর্যয়ে রাশিয়া উদাসীন থাকিবে না। ২৯শে জুলাই (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ) অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের উপর কামান দাগিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিল। জার্মানী রুশ সৈন্য সমাবেশকে যুদ্ধ ঘোষণাই মনে করিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্রে ১২ ঘণ্টার মধ্যে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইল (৩১শে জুলাই)। সেইদিনই রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্সের মনোভাব সম্পর্কে জার্মান সরকার জানিতে

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বেলগ্রেড আক্রমণ

চাহিল। রাশিয়া জার্মানীর চরমপত্রের কোন জবাব না দেওয়ায় ১লা আগস্ট (১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ) জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স জার্মানীর পত্রের উত্তরে জানাইয়াছিল যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করিবে। রাশিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তি (Dual Alliance) অনুযায়ী ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে ইহা মনে করিয়া জার্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (৩রা আগস্ট, ১৯১৪)। এদিকে ইতালী নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে।

জার্মানীর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিবার জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া এক সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের এক আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হয় এবং ফ্রান্স ও জার্মানী ছিল এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা রক্ষা ছিল ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র। বেলজিয়াম ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইংলণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪)। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ক্রমে ইতালী, জাপান ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগদান করে। তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের আফ্রিকার এবং এশিয়ার উপনিবেশগুলিও এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ

ইংলণ্ডের যুদ্ধঘোষণা

১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শান্তি চুক্তিগুলি (Peace Settlements of 1919 to 1923):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। জার্মানী এবং তাহার মিত্ররাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মিত্র পক্ষের সহিত জার্মানীর যুদ্ধবিরতি ঘটে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম দেশ হইতে পলায়ন করিলে জার্মানী প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হয়। দীর্ঘ চার বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর ইওরোপে শান্তি ফিরিয়া আসে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস নগরীতে বিশ্বের ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিবার জন্য সমবেত হন। রাশিয়া অথবা শত্রুপক্ষের কোন রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে ডাকা হয় নাই। ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four)-এর হাতে ছিল। ইঁহারা হইলেন আমেরিকার উড্রো উইলসন, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্‌লো

জার্মানী এবং তাহার মিত্র শক্তিরা যুদ্ধে পরাজিত

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন

এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী সিনর ওর্লাণ্ডো। ক্লিমেন্‌লো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনকে ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভিয়েনা কংগ্রেসে যেমন জার আলেকজাণ্ডার আদর্শবাদিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন, প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে সেরূপ ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন। তিনি ন্যায় এবং নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত' সম্বলিত এক প্রস্তাব শান্তি সম্মেলনে উত্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তবে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইত না, কারণ যুদ্ধচলাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল। এই সকল চুক্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীকে অপমানিত করা।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের সহিত ভিয়েনা কংগ্রেসের তুলনা

অতএব বলা যায় প্যারিস শান্তি সম্মেলনে দুইটি পরস্পর বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হয়। একদিকে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা অন্যদিকে জার্মানী যেন ভবিষ্যতে ইওরোপের শক্তিসাম্য বিনষ্ট করিতে না পারে সেজন্য জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং জার্মানীকে দুর্বল করা। এই দুই আদর্শের সংঘাতে জার্মানীকে হীনবল করার নীতিই জয়ী হয়। কারণ ইওরোপীয় রাজনীতির কূটকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ প্রেসিডেন্ট উইলসন্ ক্লিমেনলো, লয়েড জর্জ এবং ওলাণ্ডোর কূটনৈতিক চালের নিকট পরাস্ত হন। তাঁহার ১৪ দফা শর্ত (Fourteen Points) প্যারিস শান্তি সম্মেলনে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

দুইটি পরস্পরবিরোধী ধারার সংঘাত

প্রেসিডেণ্টে উইলসনের আদর্শের পরাজয়

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে পাঁচটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—জার্মানীর সহিত ভার্সাই (Versailles)-এর সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-র সন্ধি এবং তুরস্কের সহিত সেভ্‌রে (Sevres)-র সন্ধি। এই সন্ধিগুলি পরাজিত রাষ্ট্রগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলা যায়।

পাঁচটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত

ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles) :

ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানী (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্-লোরেন ফিরাইয়া

দিতে বাধ্য হয়। (২) মরেস্‌নেট, ইউপেন ও মালমেডি (Moresnet, Eupen and Malmedy) বেলজিয়ামকে দিতে বাধ্য হয়। (৩) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের (Allied powers) নিকট ত্যাগ করিতে হয়। (৪) পোল্যাণ্ডকে পোজেন (Posen)-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম প্রাশিয়া দিতে হইল। যদি উত্তর সাইলেশিয়া এবং পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট মাধ্যমে পোল্যাণ্ডের সাথে সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যাণ্ডকে দিতে হইবে স্থির হয়। (৫) আফ্রিকার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), লাইবেরিয়া, মরক্কো, মিশর ও তুরস্কের সাথে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য অধিকার জার্মানীকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

ভ.সাই-এর সন্ধি

রাজনৈতিক শর্তাদি

ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানীর সামরিক শক্তি হ্রাস করা হয়। (১) সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষ করা হয় এবং বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি (Conscription) জার্মানীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। (২) জার্মানীর নৌবাহিনী (Merchant marine)-র সংখ্যাও হ্রাস করা হয়। যুদ্ধ জাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হয়। যুদ্ধ জাহাজগুলির অধিকাংশই জার্মান এ্যাডমিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa Flow) নামক স্থানে যুদ্ধবিরতির কিছুদিন পূর্বেই ডুবাইয়া দেওয়া হয়। (৩) হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland)-এর সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলা হয়। রাইন নদীর বাম তীরে ত্রিশ মাইলের মধ্যে জার্মানীর যেসকল সামরিক ঘাঁটি আছে সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে বলা হইল। (৪) উপরের শর্তাদি যথাযথভাবে যাহাতে পালিত হয় সেজন্য রাইন নদীর বাম অঞ্চলে পনের বৎসরের জন্য মিত্রপক্ষের এক সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

সামরিক শর্তাদি

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানীকে দুর্বল করা হয়। এই উদ্দেশ্যে (১) সার অঞ্চল (Saar Valley) নামক একটি জার্মান জেলা পনের বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হয়। এই সময় যুদ্ধে জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্সের কয়লাখনির ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি ফ্রান্সকে ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হয়। পনের বৎসর পর গণভোট গ্রহণ করিয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। বেলজিয়াম, ইতালি ও ফ্রান্সকে জার্মানী কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

অর্থনৈতিক শর্তাদি

(২) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্মানীকে অর্থ দিতে হইবে স্থির হয়। একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানীকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবে।

এইসকল শর্তগুলি ছাড়াও যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধ জার্মানীর উপর চাপাইয়া কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম এবং অপরাপর যুদ্ধ অপরাধীদিগকে ("other war criminals") বিচারের জন্য মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবি করা হয়।

ভার্সাই সন্ধিতে দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখা যায়: (১) যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে জার্মানীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) ভবিষ্যতে জার্মানীর আক্রমণ হইতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা।* এই দুইটি নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞগণ পরাজিত শত্রুর প্রতি উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক মনোভাবই অবলম্বন করিয়াছিলেন। দূরদৃষ্টি ও ন্যায়বিচার উপেক্ষা করিয়া তাহারা সংকীর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা: দুইটি নীতি

ভার্সাই চুক্তিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, ভার্সাই চুক্তিকে বিজয়ীর আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলক চাপান শান্তিচুক্তি ("Dictated Peace") বলা যায়। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই চুক্তির খসড়ার উপর কেবলমাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। জার্মান প্রতিনিধিগণকে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। জার্মানীর প্রতিনিধিগণকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সম্মেলনের কক্ষে উপস্থিত করা হয় এবং অধিবেশনের শেষে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। এই প্রকার আচরণে জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই প্রকার আচরণের দ্বারা স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি ব্যাহত হয়। ফলে এই সন্ধির প্রতি জার্মান জাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ এইরূপ মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল বলা যায়।

জার্মানীর প্রতি অপমানজনক ব্যবহার

*"The treaty represented two main ideas, a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and need of protecting Europe against a revival of German ambition"—Riper "A Short History of Modern Europe"—P396.

দ্বিতীয়ত, ইহাও বলা হইয়াছে যে, জাতীয়তাবাদের আদর্শ অনুসারে মিত্রপক্ষ জার্মানীর নিকট হইতে ফ্রান্সকে আল্সেস্-লোরেন ফিরাইয়া দেয়, এবং পোল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রাশিয়াও পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্মান বসবাসকারী অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা ছাড়া পোল্যাণ্ডকে যে সকল স্থান জার্মানী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের অজুহাতে পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলা যাইতে পারে।*

তৃতীয়ত, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই সন্ধির স্বাক্ষরকারী দেশগুলি গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানীর উপরই মিত্র পক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অব্যাহত রাখিয়াছিল। মিত্রপক্ষের এই আচরণকে জার্মানীর দিক হইতে কপটতা এবং প্রতারণার সামিল ধরা হইয়াছিল। বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র দেশের সামরিক শক্তি অপেক্ষা জার্মানীর সামরিক শক্তি হ্রাস করা হয়।

সামরিক শক্তির হ্রাস নীতি কার্যকরী হয় নাই

চতুর্থত, জার্মানীর নিকট হইতে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানীকে পঙ্গু করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এইরূপ মনোভাব ভবিষ্যতে জার্মানীর অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগাইয়া তোলে। পরাজিত শত্রুর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে ইহা মিত্রপক্ষ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

ক্ষতিপূরণ দাবি অদূরদর্শিতার পরিচয়

মিত্রপক্ষের সপক্ষে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে জার্মান জঙ্গীবাদের ফলে সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানীর বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধমূলক জনমত সৃষ্টি হয়। মিত্রপক্ষ এই জনমতের দাবি উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়াও মিত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই সন্ধিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

জনমতের চাপ

*"It was perhaps open to question whether, the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabitated by indisputably Polish populations"—E. H. Carr. "International" Relations between the Two World War" PP 5-6

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা মনে হয় যে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ, জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ঈর্ষা ভার্সাই সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়াছিল। জার্মানীর ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে এই চুক্তি মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ ভার্সাই সন্ধিতেই নিহিত ছিল বলা যায়।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূলে

সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of Saint Germain) :

মিত্রপক্ষ এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট জার্মেইনের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অস্ট্রিয়াকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেশিয়া এবং নিম্ন অস্ট্রিয়ার একাংশ একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czechoslovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠিত হয়। ইহা ভিন্ন বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হয় যুগোশ্লাভিয়া (Yugoslavia)। অস্ট্রিয়া ইতালিকে দক্ষিণ টাইরল (South Tyral), ট্রেনটিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria), এবং ড্যালমেশিয়া (Dalmatia)-র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ টাইরলের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জার্মান ভাষাভাষী। ইতালীর সহিত গোপন চুক্তির শর্ত রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানীকে না দিয়া ইতালীকে দেওয়া হয়। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া এবং রুমানিয়াকে বুকোভিনা (Bukovina) দেওয়া হয়। এইভাবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হয়।

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধি স্বাক্ষরিত

অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস

এই সন্ধির এক শর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়া এবং জার্মানীর মিলন (Auschluss) নিষিদ্ধ করা হয়। অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নির্দিষ্ট করা হয় এবং নৌবাহিনী দানিউব নদীতে তিনটি বজরার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহা ভিন্ন, ক্ষতিপূরণ এবং যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি শর্তও অস্ট্রিয়াকে মানিতে বাধ্য করা হয়।

ভার্সাই সন্ধিতে যেসকল দোষ-ত্রুটি দেখা যায় সেইরকম দোষ-ত্রুটি সেণ্ট জার্মেইনের সন্ধিতেও দেখা যায়।

ট্রিয়ানন-এর সন্ধি (Treaty of Trianon) :

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুন মিত্রপক্ষ ট্রিয়ানন প্রাসাদে হাঙ্গেরীর সহিত সন্ধি স্বাক্ষর

করে। এই সন্ধি অনুসারে হাঙ্গেরীর নিকট হইতে রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া এবং টেমেস্‌ভারের অধিকাংশ দেওয়া হয়। যুগোস্লাভিয়াকে টেমেসভারের অবশিষ্টাংশ, ক্রোসিয়া-স্লাভোনিয়া দেওয়া হইল। চেকোস্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়াকে দেওয়া হইল। হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজার নির্দিষ্ট করা হয় কিন্তু নৌবাহিনীর কোন অস্তিত্ব রাখা হয় নাই। হাঙ্গেরীকেও যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়।

হাঙ্গেরীর সহিত মিত্রপক্ষের ট্রিয়াননের সন্ধি স্বাক্ষরিত

নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly) :

২৭শে নভেম্বর, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুযায়ী বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। বুলগেরিয়ার সৈন্য সংখ্যা মোট ৩৩,০০০ নির্দিষ্ট হয়। ক্ষতিপূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হয়।

বুলগেরিয়ার সহিত মিত্রপক্ষের নিউলির সন্ধি স্বাক্ষরিত

সেভ্‌রে-এর সন্ধি (Treaty of Sevres) :

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট মিত্রপক্ষ তুরস্কের সহিত সেভ্‌রের সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধি অনুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, মরক্কো, টিউনিসিয়া, ট্রিপোলিটানিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর তুরস্ক সকল অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং মেশোপটামিয়ার উপর তুরস্কের অধিকার বিলোপ করা হয়। স্মার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে রাখা হয়। গ্রীস ইজিয়ান সাগরস্থ কতকগুলি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ লাভ করে। রোড্‌স্‌ ও ডেডোকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে অবশ্য ইতালি ডেডোকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দার্দানেলিস্‌ ও বোস্‌ফোরাস্‌ প্রণালী দুটি 'আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ' জলপথ বলিয়া ঘোষিত হয়। একদা বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য কন্‌স্টান্‌টিনোপল এবং আনাটোলিয়া (Anatolia)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল।

তুরস্কের সহিত সেভরের সন্ধি স্বাক্ষরিত

তুরস্কের সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধিগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন বটে, কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হয় তখন মুস্তাফা

কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা দেয়। অবশেষে ল্যসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne) দ্বারা তুরস্ক সেভ্রের সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়।

ল্যসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne)

ল্যসেনের সন্ধি দ্বারা সেভ্রের সন্ধির শর্তাদি পরিবর্তিত

এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদী পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান এবং ম্যারিৎসা নদীর পশ্চিম তীরে কারাগাচ্ (Karagach) শহরটি পুনরায় লাভ করে। কন্স্টান্টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইজিয়ান সাগরস্থ ইমব্রস্ (Imbros) ও টেনেডস্ (Tenedos) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইজিয়ান সাগরের অন্যান্য দ্বীপগুলি গ্রীস লাভ করে। মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সিরিয়া লিবিয়া প্রভৃতি আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্কের দাবি ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু অপরদিকে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। সেভ্রের সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলির তুলনায় ল্যসেনের সন্ধি তুরস্কের পক্ষে সম্মানজনক বলা যায়।*

লীগ-অব-ন্যেশন্স্ (The League of Nations)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও ব্যাপকতা বিভিন্ন দেশের মানুষের মনে শান্তিস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহারই ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্যেশন্স্ (League of Nations) নামে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

লীগের উৎপত্তি

এই আন্তর্জাতিক শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)। তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দদফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর শেষ শর্তটির উপর ভিত্তি করিয়া লীগ-অব-ন্যেশন্স্ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগ-অব-ন্যেশন্সের একটি চুক্তিপত্র বা 'কভেনাণ্ট' (Covenant) রচিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা। এই কভেনাণ্টেই লীগের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) ও একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariat) লইয়া লীগ গঠিত হয়।† ইহা ছাড়া একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent Court

উদ্দেশ্য

লীগের গঠনপ্রণালী

*"In comparison with……the humiliating Treaty of Sevres, the Treaty of Lausanne was a victory for Turkey"—George Lenczouski. "The Middle East in World Affairs", P 108

†"The League functioned through an Assembly, a Council, and a Secretariat" Langsam' 'The World since 1919', P.41.

of International Justice) এবং একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ (International Labour Organisation) গঠন করা হয়। নিরপেক্ষ দেশ সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল স্থাপিত হয়।

সদস্য-সংখ্যা

প্যারিসের শান্তি-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরকারী ত্রিশটি রাষ্ট্র এবং আরও তেরটি রাষ্ট্র লীগের সদস্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের আপত্তিহেতু যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য হয় নাই। রাশিয়া এবং পরাজিত জার্মানীকে লীগের সদস্যপদে গ্রহণ করা হইল না। লীগের সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা সমর্থিত হইলে কোনও ডোমিনিয়ান অথবা উপনিবেশ সদস্যভুক্ত হইতে পারিত। কোনও সদস্য লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে দুই বৎসরের নোটিশ দিতে হইত। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লীগের সদস্য সংখ্যা ৬০-এ পৌঁছিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে লীগের শেষ বৎসরে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৩-এ দাঁড়ায়।

সাধারণ সভার সংগঠন ও কার্যাবলী

লীগের সাধারণ সভা লীগের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষে তিনজন প্রতিনিধি সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিত কিন্তু একটির বেশি ভোট দিতে পারিত না। প্রতিবৎসর সাধারণ সভার অধিবেশন জেনেভাতে বসিত। সাধারণ সভা নিরাপত্তা ও শান্তি সম্পর্কিত যে কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারিত। প্রতিবৎসর সাধারণ সভার অধিবেশনে সদস্যগণ সমবেত হইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতেন, নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতেন এবং লীগের কার্যের সমালোচনা করিতেন। তাঁহাদের আরেকটি প্রধান কাজ ছিল লীগ কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যগণকে নির্বাচিত করা। ইহা ভিন্ন লীগের ব্যয় বরাদ্দ করা, নূতন নূতন সদস্য রাষ্ট্রের আবেদন মঞ্জুর করা এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের লীগ কাউন্সিলের সাহায্যে নির্বাচিত করা।

লীগ কাউন্সিলের সংগঠন, সদস্য সংখ্যা ও ক্ষমতা

লীগ কাউন্সিল ছিল লীগের কার্যকরী সভা। কভেনেণ্ট অনুযায়ী এই কাউন্সিল পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং প্রতিবৎসর সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত চারজন অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্যভুক্ত হইতে রাজী না হওয়ায় উহার সদস্যসংখ্যা ৮ জনে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র ভিন্ন অপর চারটি স্থায়ী সদস্য ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জাপান। অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এগার পর্যন্ত করা হয় এবং তাহাদের কার্যকাল তিন বৎসর করা হয়।

লীগ কাউন্সিল বৎসরে সাধারণত তিনবার মিলিত হইত। ইহা ভিন্ন বিশেষ অধিবেশনও বসিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কাউন্সিলের প্রস্তাব সর্বসম্মত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে লীগ কাউন্সিল প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিত। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং ম্যাণ্ডেট ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা এই কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক যে কোন বিবাদ কাউন্সিলের নিকট পেশ করা হইলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজন হইলে সাধারণসভার মতামতের জন্য উহা প্রেরণ করাও কাউন্সিলের কর্তব্য ছিল। অবশেষে লীগের চুক্তিপত্রের শর্তাদি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও লীগ কাউন্সিলের কাজ ছিল।

লীগ দপ্তরের সংগঠন ও কার্যকলাপ

লীগের দপ্তর (Secretariat) জেনেভাতেই স্থাপন করা হয়। ইহা 'সেক্রেটারী জেনারেল' নামে একজন কর্মচারীর অধীনে স্থাপন করা হয়। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রায় ৭০০ জন কর্মচারী ৫০টি দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হয়। স্যার এরিক ড্রামণ্ড ছিলেন লীগের সর্বপ্রথম সেক্রেটারী জেনারেল। দপ্তরকে এগারটি বিভাগে ভাগ করা হয়। লীগ কাউন্সিল ও লীগের সাধারণসভার যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করাই ছিল দপ্তরের কাজ।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

লীগের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা হইল স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ। লীগ কাউন্সিল ও সাধারণ সভা একত্রিত হইয়া নয় বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচন করিত। বিচারপতির সংখ্যা ছিল পনের। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদের মীমাংসা, আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা প্রভৃতি কাজ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপর ভার ছিল। ইহা ছাড়াও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে কাউন্সিল এবং সাধারণ সভাকে উপদেশ দিতে পারিত। হেগ্ (Hague) নামক স্থানে এই বিচারালয় স্থাপিত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা

বিশ্বের শ্রমিকদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা জেনেভা শহরে স্থাপিত হয়। লীগের সদস্য হইলেই এই সংস্থার সদস্যভুক্ত বলিয়া ধরা হইত। শ্রমিকদের অবস্থা এবং উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট শ্রমিক উন্নতির সুপারিশ করা এই সংস্থার দায়িত্ব ছিল। এই সংস্থার তিনটি ভাগ ছিল—সাধারণ সমিতি (General

Conference), পরিচালক সমিতি (Governing Body) ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক কার্যালয় (International Labour Office)। প্রতি রাষ্ট্র হইতে চারজন প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সমিতি এবং বত্রিশজন প্রতিনিধি লইয়া পরিচালক সমিতি গঠিত ছিল।

তুরস্কের আধুনিকীকরণ (Modernization of Turkey)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। যে তুরস্ককে 'Sickman of Europe' বলা হইত সেই তুরস্ক কামালের পরিচালনায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মুস্তাফা কামাল
(১৮৮০-১৯৩৩)

প্রথম জীবন

গুপ্ত সমিতি স্থাপন

মুস্তাফা কামাল প্রথম জীবনে সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু সামরিক শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি ফরাসী বৈপ্লবিক পুস্তকাটি পাঠ করিয়া বিপ্লবী হইয়া উঠেন। তুরস্ক সুলতানের গুপ্তচররা ইহা জানিতে পারিলে তাঁহাকে দূরবর্তী দামাস্কাসের এক অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। সেখানে কামাল 'বতন' (Vatan) অর্থাৎ পিতৃভূমি (Fatherland) নামে এক গোপন সমিতি স্থাপন করেন। এই গোপন সমিতির উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিয়া তুরস্কের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা।

ফ্রান্সে গমন এবং তুরস্কের অনুন্নত অবস্থার উপলব্ধি

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্যের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কামালকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয়। প্যারিসে থাকাকালীন সেখানকার প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় তুরস্ক কত অনুন্নত তাহা তিনি উপলব্ধি করেন।

জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর সন্ধির যে শর্তগুলি (Armistice of Mudros, 1918) চাপাইয়াছিল মুস্তাফা কামালের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি উহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তখন তুর্কী সরকারের আদেশে তাঁহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হয়। সেখানে থাকাকালীন তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল এবং জাতীয় সামরিক বাহিনীও গঠন করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী পার্লামেন্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই পার্লামেন্ট ছয়টি শর্ত সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে এবং এই শর্তগুলি না মানিলে

মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন সম্ভব নয় বলিয়া ঘোষণা করে। ইহার উত্তরে ইংলণ্ডের সেনাপতি আর্চিবল্ড মিলনী (Archibold Milne)-র অধীনে এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কনস্টানটিনোপলে উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করে এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। যে সকল সদস্য পলায়ন করিতে সমর্থ হয় তাহারা আনাটোলিয়ার উত্তরে এঙ্গোরা (Angora)-তে সমবেত হইয়া সেখানে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন শুরু করে। কনস্টানটিনোপলে অপরাপর সদস্যদের লইয়া পুরাতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিয়াছিল। ফলে তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এঙ্গোরার পার্লামেণ্ট মুস্তাফা কামালকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে এবং জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করে (১৯২০ খ্রীস্টাব্দ)। পরের বৎসর এঙ্গোরার পার্লামেণ্ট 'মৌলিক গঠনতন্ত্রের আইন' (Law of Fundamental Organisation) নামে এক আইন পাস করে। এই আইন দ্বারা তুরস্ক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত করা হয় এবং এঙ্গোরা পার্লামেণ্টকেই তুরস্কের জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইন পরবর্তিকালে কিছু পরিমাণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল।

ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কনস্টানটিনোপল দখল

এঙ্গোরার পার্লামেণ্ট

এঙ্গোরার পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলাকালীন কামাল রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করিয়া বিদেশী সৈন্য বিতাড়ন করিবার জন্য অভিযান শুরু করেন। তিনি কার্স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুইটি স্থান তুরস্কের সহিত যুক্ত করেন। এদিকে সেভরের সন্ধির শর্তানুযায়ী তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি দখল করিবার জন্য গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সাখারিয়া (Sakharia)-র যুদ্ধে কামালের সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজিত হইয়া গ্রীক সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। গ্রীক বাহিনীর বিতাড়নকালে ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীর সাথে কামালের সংঘর্ষ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত ইংলণ্ডের এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পর কামালের চেষ্টায় সেভরের সন্ধির শর্তগুলি পরিবর্তিত করিয়া ল্যসেনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে কামালের অক্লান্ত চেষ্টা এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেম তুরস্ক সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা করে।

বিদেশী সৈন্য বিতাড়ন নীতি

গ্রীক সৈন্যবাহিনীর পরাজয়

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি

তুরস্কের পার্লামেণ্ট স্থলতান ষষ্ঠ মোহম্মদকে পদচ্যুত করে এবং ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করে। মুস্তাফা কামাল সর্বসম্মতিক্রমে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত, কামাল প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত

প্রেসিডেণ্ট হইয়া কামাল তুরস্কের প্রাচীনপন্থী যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্তন করিয়া তুরস্ককে পাশ্চাত্য দেশের সমপর্যায়ে উন্নত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।* তাঁহার সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের শাসন, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন সাধন করা। কিন্তু কামাল অস্ট্রিয়ার সম্রাট যোশেফের ন্যায় একসঙ্গে একাধিক সংস্কারে হাত দেন নাই। এক সময়ে একটি মাত্র সংস্কারে ব্রতী হইতেন, যাহার ফলে তিনি সাফল্য লাভ করেন।

কামালের সংস্কার নীতি

তুর্কীর জাতীয় পার্লামেণ্ট ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে স্থলতানপদ উঠাইয়া দিয়াছিল কিন্তু স্থলতানের খলিফা পদ (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান) তখনও বাতিল হয় নাই। ষষ্ঠ মোহম্মদ স্থলতান পদ হইতে পদচ্যুত হইলেও খলিফা ছিলেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের পার্লামেণ্ট খলিফা পদ উঠাইয়া দেয়।

তুরস্কের খলিফা পদের অবলুপ্তি

তুরস্কের শাসনতন্ত্রে ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রগতিশীল তুরস্কে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের আদর্শ ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র হইতে 'ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম' এই কথাটি উঠাইয়া দেয়। তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত

কামালের উল্লেখযোগ্য অন্যতম সংস্কার তুরস্কের নারীজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে আইন পাস করিয়া রেজেস্ট্রি বিবাহ, বহু বিবাহ-প্রথা রদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশীয় সকল প্রকার বিবাহ-বিষয়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তুরস্কের নারীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদের ইচ্ছামত পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। বোরখা পরিধান করা না করা তাহাদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। নারীশিক্ষার জন্য

তুরস্কে স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি

*"As President Mustafa Kamal determined to abolish outworn institutions and to raise his country to the level of Western Civilization"—Vide Langsam, "The World since 1919'—P382.

বিদ্যায়তন খোলা হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষিতা মহিলাদিগকে নানাপ্রকার উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়। তুরস্কের নারীজাতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন হ্যালিদি ত্রদিব। ইনি ছিলেন তুরস্কের প্রথম নারী-গ্রাজুয়েট। ইনি ইস্তামবুল (Istanbul) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্য ভাষার অধ্যাপিকা হন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বহু মহিলা বিচারক এবং অধ্যাপিকা নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্ট নির্বাচনে নারীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং বহু মহিলা পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

শিক্ষার উন্নতি

তুরস্কের জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সাত হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত বালক বালিকাদের স্কুলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা শতকরা ৮৫ জন হইতে ৪২ জনে নামিয়া আসিয়াছিল। আরবী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের ব্যবহার, বর্ষপঞ্জী সংস্কার, দশমিক মুদ্রা প্রচলন এবং ঘড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় নির্ধারণ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার সাধন করা হয়। সরকারী, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক কর্মচারিগণকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৈনিক কয়েকঘণ্টার জন্য সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে হইত। চল্লিশ বৎসরের অনূর্ধ্ব তুরস্কের অধিবাসীদের লিখিতে পড়িতে শিখিতে হইত। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের পর একমাত্র শিক্ষার ভিত্তিতেই নাগরিক অধিকার লাভ করা সম্ভব হইত।

স্কুলগুলিতে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। পুরাতন অর্থহীন রীতি-নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ফেজটুপি (Fez) বা পাগড়ী (turban) মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নামের শেষের পদবীর পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কামাল নিজেই জাতীয় পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুসারে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির জনক' উপাধি গ্রহণ করেন।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন

সুলতানদের আমলে তুর্কী জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পে অংশ গ্রহণ করিত না। তুরস্কের ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রীক, ইহুদী এবং আর্মেনিয়ানদের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কী জাতি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক দিয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। সরকারী উদ্যোগে আনাটোলিয়াতে কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং কৃষিকার্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কামাল

নিজেই একটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন। কৃষকদের করভার লাঘব করিয়া এবং যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করিয়া কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা হইল।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের পার্লামেণ্ট ১২ বৎসরের জন্য একটি উন্নতিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। রেলপথ ও বন্দর নির্মাণ, রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা এবং জমি-উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে হাত দেওয়া হয়। সুইডেন হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনাইয়া এইসব কাজের তদারকীর ব্যবস্থা করা হয়।

সংরক্ষণ নীতি (Protective tariff system) গ্রহণ করার ফলে বস্ত্র-শিল্পের ও চিনির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে তামা, কয়লা, এন্টিমনি, পেট্রোল, দস্তা প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সংরক্ষণ নীতি

শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ শিল্পে জাতীয়করণ (nationalisation) নীতি গ্রহণ করা হয়। তামাক, লবণ, মাদকদ্রব্য এবং গোলাবারুদ নির্মাণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিয়া কামাল তুরস্কের বহির্বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জাতীয়করণ নীতি

সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে তুরস্কের নগরগুলির আয়তন বৃদ্ধি হয়। এঙ্গোরা (Angora) নগরীরও আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং আতাতুর্ক ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আঙ্কারা' (Ankara) রাখেন। ইহা তুরস্কের নূতন রাজধানীতে পরিণত হয়। রেলপথ দ্বারা সমুদ্রের সাথে ইহার সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই নগরীর আধুনিকীকরণ এবং সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য কামাল সবপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

আঙ্কারা নূতন রাজধানী

এইভাবে কামাল আতাতুর্ক প্রাচীন তুরস্কদেশের রাজনৈতিক এবং সমাজ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তুরস্কের জনজীবনে এক নব চেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল। লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ন্যায় কামালের সংস্কার নীতি কোন অংশে কম বৈপ্লবিক নয়।*

লেনিনের সাথে তুলনা

---

*"His policy was no less radical than Lenin's revolution in Russia" | Vide David Thomson, "Europe since Napoleon", P. 550.

অনুশীলনী

Q 1. What were the causes of the First World War of 1914-1918 ?

(১৯১৪-১৮ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি কি কি ?)

(উত্তর-সংকেত : ১৫৩—১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।)

Q. 2. Discuss the provisions of the Versailles Treaty of 1919 and criticise them.

(১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা করিয়া সমালোচনা কর।)

(উত্তর-সংকেত : ১৫০—১৬১ পৃষ্ঠা দেখ।)

Q 3. Discuss the composition and functions of the different organs of the Leage of Nations.

(লীগ-অব-ন্যেশন্‌সের বিভিন্ন বিভাগের গঠনপ্রণালী এবং কার্যাবলী আলোচনা কর।)

(উত্তর সংকেত ১৬৩—১৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

Q. 4. Discuss the part played by Kamal Atatürk in the modernisation of Turkey.

(তুরস্কের আধুনিকীকরণে কামাল আতাতুর্কের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।)

(উত্তর-সংকেত : ১৬৬—১৭০ পৃষ্ঠা দেখ।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশ-বিপ্লব এবং ইহার প্রভাব
(Russian Revolution – its Impact)

বিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী ঘটনা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের রুশ-বিপ্লব।* ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী আন্দোলনগুলির ইহা হইল পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রুশবিপ্লবও কতকগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল। এই কারণগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক দিকগুলি এইভাবে বর্ণনা করা যায়।

রুশবিপ্লবের নানাবিধ কারণ

স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের দুর্বলতা দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (১৮৯৪-১৯১৭) প্রকাশ পায়। কোন প্রতিনিধিসভা না থাকার ফলে শাসক সম্প্রদায়ের সাথে জনসাধারণের কোন প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। কঠোর দমননীতির ফলে জনসাধারণ দিনদিনই জারশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কাপুরুষ ও ভীরু দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার দ্বারা পরিচালিত হইতেন। আলেকজান্দ্রা আবার ধর্মযাজক রাসপুটিন (Rasputin)-এর প্রভাবাধীন ছিলেন। হীন চরিত্র রাসপুটিনের প্রভাব শাসনকার্যে প্রতিফলিত হয়। রাসপুটিনের সুপারিশে অযোগ্য ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়, যাহার ফলে শাসনবিভাগ দুর্বল হইয়া পড়ে। ফরাসীদেশের বুরবোঁ রাজাদের ন্যায় নিকোলাস আবার অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ শাসন করিতে থাকেন। এদিকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় হইলে শাসনসংস্কারের দাবিতে এক বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে নিকোলাস ডুমা (Duma) নামে এক পার্লামেন্ট বা জাতীয় সভা ডাকিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ডুমাতে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য থাকায় নিকোলাসের পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন চালু রাখায় কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার সরকারের চরম অব্যবস্থা এবং অকর্মণ্যতার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে বহু রুশ সৈন্য জার্মান সৈন্যদের হাতে পরাজিত এবং বন্দী হয়। সৈন্যদলে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক কারণ : জারতন্ত্রের দুর্বলতা দ্বিতীয় নিকোলাস

*"1917 stands like a huge and indestructible landmark in the annals of man kind"—Isaac Dentscher in New Cambridge Modern History Vol XII, P-415

শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। এই সুযোগে পার্লামেন্টের বিরোধী দল 'সোশিয়াল ডিমোক্রেটিক পার্টি' (Social Democratic Party) নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই দলের একাংশ বলশেভিকরাই শেষ পর্যন্ত জারতন্ত্রের পতন ঘটাইয়া রাশিয়াতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

সামাজিক কারণ

সামাজিক ক্ষেত্রেও রাশিয়া ছিল একটি অনুন্নত দেশ। রাশিয়ার সমাজ ছিল দুইটি ভাগে বিভক্ত—অভিজাত শ্রেণী ও সার্ফ সম্প্রদায়। যদিও ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে সার্ফদের ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হয় তথাপি তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকারে জমি ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। 'মির' নামক যে গ্রাম্য সমিতির উপর জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয় তাহা অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। যদিও তৃতীয় ডুমার কার্যকাল (১৯০৭-১২ খ্রীস্টাব্দ)-এর মধ্যে কৃষকরা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে কিন্তু তাহাতে কৃষকদের বিশেষ কিছুই লাভ হয় নাই। অনেক কৃষকই স্বাধীনভাবে জমি চাষ করিতে সক্ষম হয় নাই। অনেকে জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। কৃষকদের অসন্তোষ দিনদিনই বৃদ্ধি পায়।

অর্থ নৈতিক কারণ

রাশিয়ার অর্থ নৈতিক সমস্যা জনসাধারণকে বিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে কৃষকদের দুরবস্থা যেমন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। রাশিয়ায় শিল্প বিস্তারের সাথে সাথে ফ্যাক্টরী প্রথার যাবতীয় অসুবিধা শ্রমিকদের ভোগ করিতে হইত। কোনপ্রকার ধর্মঘট করা বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়াতে সোশ্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি (Social Democratic Party) প্রতিষ্ঠার পর হইতে শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের সময় রাশিয়ার মজুর শ্রেণী ধর্মঘট করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রাশিয়ার শ্রমিক সমাজ শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

মানসিক কারণ

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকরা বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন সেইরূপ রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছিলেন রাশিয়ার মনীষীরা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, টুর্গেনিভ, গোগল প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণ অকর্মণ্য স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাশিয়ার শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করেন। বাকুনিন (Bakunine) ও কার্ল মার্কস্ (Karl Marx)-এর

প্রবন্ধাদি পাঠের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে অত্যাচারী জারতন্ত্রের অবসানের আগ্রহ দেখা দেয়।

এইভাবে উপরোক্ত কারণগুলির জন্য রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ

জারের শাসনে রাশিয়া যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের অসুবিধা এবং বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির জন্য জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর হাতে রুশসৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হইতে থাকে। ইহার ফলে দেশের সর্বত্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হইয়াছিল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাড শহরে ধর্মঘট

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাড শহরে এক সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করা হয় এবং ধর্মঘটই জারতন্ত্রের পতন সূচনা করে।* এই ধর্মঘট চলাকালীন শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা ও ধর্মঘট দমন করিবার জন্য জার সরকার পেট্রোগ্রাডের সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সেনাবাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ না করিয়া ধর্মঘটীদের সাথে হাত মিলায়। এই অবস্থায় নিকোলাস কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ বা শ্রমিকদের দাবি মানিয়া নেওয়া কোনটাই করিলেন না। ফলে সোশিয়াল ডিমোক্রেটিক দলের প্রচারকার্যের ফলে বিপ্লবী আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জনতার বিক্ষোভ

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বড় বড় শহরগুলিতে জনতার বিক্ষোভ এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। ডুমার সদস্যরাও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জার্মানীর কাছে রাশিয়া যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে ইহা আইন সভার অধিবেশনে ঘোষণা করে। এই অবস্থায় নিকোলাস চতুর্থ ডুমার অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য এবং ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজে যোগদান করিবার জন্য আদেশ দেন। এই আদেশই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবী সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা

ডুমা জারের আদেশ তো মানিলই না উপরন্তু তাহারা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে পরিচালিত করিবার জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করে। ডুমার বাহিরে শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতিনিধিগণ পেট্রোগ্রাডে 'সোভিয়েট' (Soviet) নামে এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন

---

*"The doom of the old regime was hearlded by a general strike in Petrograd in February 1917"—Langsam, "The World since 1919', P-311

করেন। ডুমার সমিতি এবং পেট্রোগ্রাডের 'সোভিয়েট' একত্রিত হইয়া ১৪ই মার্চ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে একটি অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) স্থাপন করে। এই অস্থায়ী সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে যাহার মধ্যে ক্যাডেট (Cadets) বা উদারনীতিতে বিশ্বাসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১৫ই মার্চ নিকোলাস এই অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করেন এবং পদত্যাগ করেন। জারতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে রুশবিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হয়।

অস্থায়ী সরকার স্থাপন

নিকোলাসের পদত্যাগ

এই অস্থায়ী সরকারের প্রথম কাজ হইল উদারনৈতিক সংস্কার করা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতিতে যোগদানের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার প্রভৃতি স্বীকার করা হইল। কিন্তু এই সকল সংস্কার ঘোষণায় পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট সন্তুষ্ট হয় নাই। সোভিয়েটের প্রতিনিধিরা চাহিয়াছিল অর্থনৈতিক সংস্কার। ভূমির মালিকানার আমূল সংস্কার করিয়া কৃষকদের জমি হস্তান্তর করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভা ইহাতে সম্মত ছিল না। এই মতের পার্থক্যের ফলে রাশিয়ার বিপ্লবের গতির পরিবর্তন হয়।

অস্থায়ী সরকার এবং পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের মধ্যে মতের পার্থক্য

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েটের শাখা সমিতি গঠন করিয়া প্রচার কার্যের দ্বারা শ্রমিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সামরিক বাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে প্রচারের ফলে সৈনিকরা বিপ্লবী দলে যোগদান করে। অনেক সৈনিক সেনাপতিদের আদেশ অমান্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে মন্ত্রিসভার পরিবর্তে সোভিয়েটের প্রতি আনুগত্য দেখা যায়।

শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে সোভিয়েটের প্রভাব বিস্তার

এই অবস্থায় ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রায় সহস্র প্রতিনিধিদের নিয়া পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েট কংগ্রেস ডাকা হয়। এই কংগ্রেসে স্যোশাল রেভুলিশনারী পার্টি (Social Revolutionary Party) হইতে কৃষক প্রতিনিধিগণ স্যোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (Social Democratic Party) হইতে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সমবেত হন। স্যোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র মধ্যে দুইটি উপদল ছিল, একটি হইল মেনশেভিক (Menshevik), অপরটি হইল বলশেভিক (Bolshevik).

পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েট কংগ্রেস (জুন, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ)

অস্থায়ী সরকারের সংস্কারনীতিতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নাই, ফলে সমগ্র দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। অভিজাতশ্রেণীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হয়। এই সুযোগে মেনশেভিক দলের নেতা কেরেন্‌স্কি (Kerensky) শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। কেরেন্‌স্কি চাহিয়াছিলেন গণতান্ত্রিক উপায়ে সংস্কারসাধন। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে জার্মানীর সাথে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াও ছিল তাঁহার নীতি। কিন্তু মেনশেভিকদের বিরোধী পক্ষ বলশেভিক দলের নেতৃবৃন্দ লেনিন এবং ট্রট্‌স্কি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। অভ্যন্তরীণ নীতিতে তাঁহারা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া প্রোলেটারিয়েটদের শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কেরেন্‌স্কি কিছুকাল সাফল্যের সহিতই যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা করিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বলশেভিকদের প্রচারকার্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সৈন্যবাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ফলে জার্মান সৈন্যবাহিনী রুশ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রিগা (Riga) নামক স্থানটি দখল করে।

মেনশেভিক দলের নেতা কেরেন্‌স্কি কর্তৃক শাসন ক্ষমতা দখল

এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকরা 'শান্তি, জমি ও খাদ্য' এই দাবি তুলিয়া জনসাধারণের মধ্যে কেরেন্‌স্কি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করে। কেরেন্‌স্কি সরকারের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। লেনিন সুইজারল্যাণ্ডের নিবাসন হইতে এই সময় জার্মানীর সাহায্যে রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। তিনি পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সোভিয়েটগুলি উপর বলশেভিক দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কেরেন্‌স্কি সরকার প্রথমে বলশেভিকদের গ্রেপ্তার করিয়া আন্দোলন দমন করিতে সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ও ৭ই নভেম্বর বলশেভিকরা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে পেট্রোগ্রাড দখল করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়, কেবল কেরেন্‌স্কি পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হয়।

কেরেন্‌স্কি সরকারের পতন : বলশেভিকদের শাসনক্ষমতা দখল

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াই রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য দূর করিবার জন্য বলশেভিক সরকার জমি, মূলধন, শ্রম প্রভৃতিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না। সম্পত্তিমাত্রই জাতীয়করণ করা হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা প্রভৃতির

লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকারের নীতি : সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। পূর্ববর্তী রুশ সরকারের সকল ঋণ বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক রুশ নাগরিককে শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হইল। দেশে ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া এক শোষণমুক্ত শ্রেণীবিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা করা হইল।

শোষণমুক্ত ও শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন

এই প্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহারা নূতন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। বিশেষত অভিজাত ব্যবসায়ী এবং যাজক সম্প্রদায় এই প্রকার রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না। ইহাদের বিদ্রোহ বলশেভিক সরকার বলপূর্বক দমন করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় সন্ত্রাস রাজত্বের ন্যায় বলশেভিক সরকার গ্রেপ্তার এবং প্রাণদণ্ড দিয়া এক 'ভয়াবহ শাসন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাঁহার পরিবারবর্গকেও হত্যা করা হয় (১৬ই জুলাই, ১৯১৮)।

প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রোহ দমন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বলশেভিক সরকার শান্তি স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধে শক্তি এবং সামর্থ্য নষ্ট না করিয়া অভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানের জন্য বলশেভিক সরকার জার্মানীর সহিত ব্রেস্টলিটভস্কের (Brest-Litovsk) সন্ধি স্বাক্ষর করে (৩রা মার্চ, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে বালটিক সাগরের তীরে সকল অঞ্চল এবং ইউকরেইন (Ukraine) অঞ্চল রাশিয়া জার্মানিকে দিতে বাধ্য হইল। পিটার-দি-গ্রেটের আমল হইতে বালটিক সাগরের তীরে রাশিয়া যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার সব কিছুই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। যদিও এই সন্ধি রাশিয়ার পক্ষে অপমানজনক ছিল কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলশেভিক সরকারকে স্থায়ী করিবার জন্য এই সন্ধির প্রয়োজন ছিল। বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করিয়া বলশেভিক সরকার সংস্কারকার্যে অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়।

পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তি স্থাপন—ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি

এদিকে বলশেভিক সরকারের বিপদ আসিল বাহিরের রাষ্ট্রগুলি হইতে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকারের নীতি ছিল বিশ্বের সর্বত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন করা। তাহাদের আন্তর্জাতিক প্রচারের ফলে ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। ইওরোপীয় দেশগুলিতে যুদ্ধের ফলে তখন অর্থনৈতিক

দুর্দশা চলিতেছিল। ঐসব দেশের সরকার আশঙ্কা করিয়াছিল যে রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিপ্লব দেশের জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে পারে। ফলে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এমন কি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ প্রতিক্রিয়াশীল দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমনকি রাশিয়া আক্রমণ করিতেও তাহারা দ্বিধা করিল না। মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী মার্মানস্ক্ (Murmansk), আর্কেঞ্জেল (Archangel) এবং ভ্লাডিভস্টক (Vladivostok)-এ প্রেরিত হয়। ফরাসীরা অডেসা (Odessa) দখল করে এবং ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বাকু (Baku) অঞ্চল আক্রমণ করে। কিন্তু বলশেভিক সরকার ট্রটস্কির পরিচালনায় লালফৌজের সাহায্যে এই আক্রমণ ব্যর্থ করে। দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবীরা যেন বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা না করিতে পারে সেজন্য চেকা (Cheka) নামে গুপ্ত পুলিশ বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে এবং বিপ্লবী বিচারালয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

বলশেভিক সরকারের পশ্চাতে রাশিয়ার কৃষক শ্রমিকের সমর্থন থাকায় এবং প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব শেষ পর্যন্ত দেশের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। অবশেষে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ সৈন্য রাশিয়া হইতে অপসারণ করিয়াছিল। ফলে রুশ বিপ্লব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়াকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হয় এবং নূতন নামকরণ হয় Union of Soviet Socialist Republics (U. S. S. R.).

রুশ বিপ্লবের প্রভাব (Impact of the Russian Revolution):

রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক সমাজের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল বলা যায়। বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অন্যান্য দেশের সম্মুখে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া থাকে। বিপ্লবের ভয়ে ভীত হইয়া পশ্চিমের দেশগুলি, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিককল্যাণ আইন প্রণয়ন করে, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আইনত স্বীকার করিয়া লয়।

লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় নূতন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) এবং স্টালিনের আমলের তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃথিবীতে এক নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছে। রাষ্ট্রদায়িত্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী

করার সুন্দর দৃষ্টান্ত রাশিয়া অন্যান্য দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা, তুরস্কের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রভৃতি রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছে। রাশিয়ার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৮)-র ফলে অভাবনীয় শিল্পোন্নতি হয়। উহাতে রুশ প্রতিযোগিতার ভয়ে ভীত হইয়া আমেরিকা রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হয় এবং বলশেভিক সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লয়।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বলশেভিক সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি ও শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া রাশিয়ার বিপক্ষে রাষ্ট্র জোট গঠন করিবার চেষ্টা করে। অন্যদিকে রাশিয়া নিজের নিরাপত্তার জন্য পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিকে নিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠনের চেষ্টা করে। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইওরোপে দুইটি ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)-এর শিবির গড়িয়া উঠে।

অনুশীলনী

(1) Discuss the causes of the Russian Revolution.

(রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর।

(উত্তর সংকেত ১৭২—১৭৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

(2) Discuss the achievements of the Balshevik Government under Lenin.

(লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক সরকারের কার্যাবলী আলোচনা কর।

(উত্তর সংকেত ১৭৬—১৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

———

চতুর্দশ অধ্যায়

একনায়কতন্ত্র ও যৌথনিরাপত্তার ব্যর্থতা (Dictatorship and Failure of Collective Security)

লোকার্নোর সন্ধি এবং প্যারিসের চুক্তি (Locarno Treaty and Pact of Paris)

ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পর ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে পরস্পর সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। উহার উপশমের উদ্দেশ্যে ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জার্মানী ফ্রান্সের সহিত পরস্পর রাজ্যসীমা অপরিবর্তিত রাখার প্রতিশ্রুতি দানের, পরস্পর যুদ্ধনিরোধ চুক্তি সম্পাদনের এবং পরস্পরের বিবাদে সালিশী ব্যবস্থার জন্য আলাপ আলোচনা চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল।

লোকার্নো সন্ধির কারণ

একাধিকবার জার্মানী এইপ্রকার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু ফ্রান্স এবিষয়ে কোন সাড়া দেয় নাই। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্ট্রেসম্যান (Stresemann) পুনরায় পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির প্রশ্ন ফরাসী সরকারের নিকট উত্থাপন করেন। এবার ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স উভয় দেশই জার্মানীর প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফরাসী সরকারের ইচ্ছায় ইটালী, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ড এই রাষ্ট্রগুলিকে এই বিষয়ে আলোচনাকালে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো নামক স্থানে উপরে উল্লিখিত সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বপ্রথম লোকার্নো সম্মেলনেই বিজয়ী ও বিজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমমর্যাদা এবং সম-অধিকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তিত মনোভাবকেই 'Locarno Spirit' বলা হয়। এই সৌহার্দ্যমূলক আবহাওয়ায় জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও ইটালী এক 'পরস্পর প্রতিশ্রুতি চুক্তি' (Treaty of Mutual Gurantee) স্বাক্ষর করে। ইহা ভিন্ন জার্মানীর সহিত ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের পৃথকভাবে মোট চারিটি সালিসী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হয়। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের সহিত পোল্যাণ্ডের এবং ফ্রান্সের সহিত চেকোশ্লোভাকিয়ার পারস্পরিক

পরস্পর প্রতিশ্রুত চুক্তি (Treaty of Mutual Gurantees)

সালিশী চুক্তি (Arbitration Treaties)

পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি চুক্তি
Treaties of Guarantee

প্রতিশ্রুতি সম্বলিত (Treaties of Guarantee) স্বাক্ষরিত হয়। এই সাতটি চুক্তি মোট একত্রে 'লোকার্নো চুক্তিসমূহ' বা Locano Treaties নামে পরিচিত।

উপরে উল্লিখিত চুক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম ও ইটালীর মধ্যে 'পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি চুক্তি'।

পারস্পরিক চুক্তির শর্তাদি

এই চুক্তির শর্তানুসারে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ভার্সাই সন্ধির শর্তানুসারে পরস্পর রাজ্যসীমা যাহাতে অপরিবর্তিত থাকে সেজন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ইহা ছাড়া ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়াম কেবলমাত্র (১) দেশরক্ষা, (২) লীগ-অব-ন্যেশনস্-এর আদেশ পালন এবং (৩) রাইন অঞ্চলের বেসামরিকীকরণের (demilitarisation) ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি দান করে। এই সকল পরস্পর প্রতিশ্রুত দেশগুলির মধ্যে কোনটি যদি অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে অপরাপর স্বাক্ষরকারী দেশ উহার সাহায্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য থাকিবে। কোন ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছে কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে লীগ কাউন্সিলের মত চাওয়া হইবে। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানীকে লীগ-অব-ন্যেশনসের সদস্যভুক্ত করা হয় এবং জার্মানী লীগের সদস্যভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে লোকার্নো চুক্তি কার্যকরী হইবে স্থির হয়।

জার্মানীর বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে যে সালিসী চুক্তি (Arbitration Treaties) স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তিগুলির শর্তানুসারে ঠিক হয়

সালিসী চুক্তির শর্তাদি

যে এইসকল দেশ যদি পরস্পরের বিবাদ কূটনৈতিক উপায়ে মীমাংসা করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে সে বিবাদ কোন সালিশীসভা অথবা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই চুক্তির শর্ত অবশ্য লোকার্নো চুক্তির পূর্বেকার বিবাদগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। ফলে পোল্যাণ্ডের করিডোর (Polish Corridor) সম্বন্ধীয় বিবাদ এই চুক্তির আওতায় পড়ে নাই।

ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রতিশ্রুতি চুক্তির শর্তাদি

উহার শর্তানুসারে ঠিক হয় যে লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গকারী কোন দেশ দ্বারা ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড অথবা চেকোশ্লোভাকিয়া যদি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

লোকার্নো চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবযুগের স্থচনা করিয়াছিল বলা যাইতে পারে।* পরাজিত জার্মানীকে বিজয়ী শক্তিবর্গের সমপর্যায়ে স্থাপন করিয়া এবং ফরাসী নিরাপত্তা সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করিয়া লোকার্নো চুক্তি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তির কঠোরতা হ্রাস করিয়া এবং ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে (Ruhr) অঞ্চল দখলের ফলে জার্মান জাতির মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল লোকার্নো চুক্তি তাহা বহুলপরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। লোকার্নো চুক্তির সপক্ষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স যেমন রাইন অঞ্চলের উপর রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ত্যাগ করিয়াছিল তেমন জার্মানীও আলসেস্-লোরেনের উপর অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল।

লোকার্নো চুক্তির সমালোচনা

কিন্তু লোকার্নো চুক্তি বা সৌহার্দ্যমূলক আবহাওয়া বাস্তবে ভবিষ্যতে শান্তি স্থাপিত করিতে পারে নাই।† ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্শেন-এর (Clemencean) মতে লোকার্নো চুক্তি পরস্পর নিরাপত্তা চুক্তির এক দুর্বল ব্যবস্থামাত্র ছিল। ইহাও বলা যায় যে লোর্কানো চুক্তি লীগ চুক্তিপত্রের (League Covenant) দুর্বলতা প্রমাণ করিয়াছিল। লীগ চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও লোকার্নো চুক্তিতে পুনরায় পরস্পর সাহায্য সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ফলে লীগ চুক্তিপত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সামরিক সাহায্য সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষর না করিলে কোন রাষ্ট্র আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সাহায্য দানে বাধ্য নহে এই ধারণা লোকার্নো চুক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। দশ বৎসর পর জার্মানী যখন ভার্সাই সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল তখন ইওরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া জার্মানীর বিরোধিতা করে নাই। তবে ইহা বলা যায় যে লোকার্নো চুক্তি পরাজিত জার্মানীকে ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সমমর্যাদায় স্থাপন করে, ফলে জার্মানীর যে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা বহু পরিমাণে দূরীভূত হয়।

লোকার্নো চুক্তির পর শান্তিপ্রয়াসের অপর প্রচেষ্টা হইল কেলগ্-ব্রিয়াও চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি (Kellogg-Briand Pact or Pact of Paris)। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্রিয়াও আমেরিকার সহিত একটি যুদ্ধ-নিরোধ চুক্তি

*"The Locarno achievements were widely hailed as precursors of a new era in world history"—Langsam, "The World since 1919", P 82.

†"But neither the pacts nor the spirit of Locarno were actual gurantees of peace.'' Langsam, P 82.

স্বাক্ষর করার প্রস্তাব করেন। কয়েক মাস আলাপ আলোচনার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State) প্রস্তাব করেন যে যুদ্ধ-নিরোধ শুধু মাত্র ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হইয়া অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গের সহিত যৌথভাবে স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। অপরাপর রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইল না। তাহার কারণ লীগ-অব-ন্যেশনসের সদস্য রাষ্ট্রগুলি পূর্বেই যুদ্ধ-নিরোধ সম্পর্কে প্রতিশ্রুত ছিল। এইভাবে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট পনেরটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি বা প্যারিসের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চারি বৎসরের মধ্যে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৬২তে দাঁড়াইয়াছিল।* যে সকল রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে তাহাদের মধ্যে প্রধান রাষ্ট্রগুলি ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, জাপান, বেলজিয়াম পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ভারতবর্ষ।

কেলগ-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির পটভূমিকা

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির প্রথম শর্তে (Article I) বলা হয়, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণে যুদ্ধ অত্যন্ত ঘৃণ্য পন্থা বলিয়া মনে করে এবং প্রত্যেকে পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণে যুদ্ধ পরিত্যাগে স্বীকৃত হয়।

কেলগ-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির শর্তগুলি

দ্বিতীয় শর্তে (Article II) বলা হয়, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সর্বপ্রকার বিবাদ মীমাংসায় শান্তিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিবে।

আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রগুলির মধ্যে কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি সংক্ষিপ্ত চুক্তিগুলির মধ্যে অন্যতম।** এই চুক্তি বিভিন্ন রাষ্ট্র আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছিল সত্য কিন্তু ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে যুদ্ধের পথ বন্ধ হইয়াছিল বলা চলে না। প্রথমত, যদিও এই চুক্তি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু নিজ দেশ রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ, পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তি-প্রসূত দায়িত্ব পালনের জন্য যুদ্ধ এবং লীগ কভেনেন্টের শর্তানুযায়ী যুদ্ধ প্রভৃতি

*"In the long run, the Locarno Treaty was destructive both of the Versailles Treaty and of the Covenant. It encouraged the view that the Versailles Treaty, unless confirmed by other engagements……lacked binding force……Ten years later, nearly all governments appeared to be acting on assumptions"—E. H. Carr, P 97.

**"It is one of the shortest treaties on record."—Hartman, "The Relations of Nations." P 37.

নিষিদ্ধ করা হয় নাই। অতএব কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তি যুদ্ধ-নিরোধ নীতি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে নাই, কেবলমাত্র আক্রমণাত্মক যুদ্ধই এই চুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। এই চুক্তির আরেকটি ত্রুটি ছিল এই যে, ইহার শর্তাদি কিভাবে কার্যকরী করা হইবে সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাতে কিছু বলা হয় নাই। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি আশা করিয়াছিল যে জনমতের চাপে আক্রমণকারী দেশ আক্রমণাত্মক কার্য হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে চীন-জাপান বিবাদকালে একথা বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তিতে আক্রমণকারী দেশের শাস্তি বিধানের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর অঘোষিত যুদ্ধ (Undeclared war) অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবার নীতি অনুসৃত হইতে থাকে।*

কেলগ্-ব্রিয়াণ্ড চুক্তির সমালোচনা

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ দেখা দেয়, ফলে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যাহার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতএব প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসান হইলে ভবিষ্যতে যেন যুদ্ধ সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যে বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গ ভার্সাই সন্ধির পঞ্চম অংশে (Part V of the Versailles Treaty) জার্মানীর কঠোর নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে।† ইহা ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট উইলসনের যে চৌদ্দ দফা শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া লীগ চুক্তিপত্র (Covenant) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উহার চতুর্থ শর্তে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রত্যেক দেশের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়া ন্যূনতম পরিমাণে আনিতে হইবে একথা বলা হইয়াছিল। লীগ চুক্তিপত্রের অষ্টম শর্তে এই নীতি গৃহীত হয় এবং নবম শর্তে বলা হয় যে একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লীগ কাউন্সিল নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইবে।

ভার্সাই সন্ধিতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে উল্লেখ

লীগ-অব-নেশনসের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

*"One of the chief effects of the Paris Pact was the appearance of undeclared war."—Langsam, P 83.

†In the Versailles Treaty the Allied Powers had declared that the purpose of the drastic disarmament of Germany was "to render possible the initiation of a general limitation of the armaments of all nations"—E. H. Carr, "International Relations between Two World Wars" P 175.

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে লীগ কাউন্সিল অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে কমান হইবে তাহা নির্ধারিত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন পারস্পরিক সাহায্যমূলক একটি সন্ধির খসড়া (Draft Treaty of Mutual Assistance) তৈয়ারি করে। এই কমিশন লীগ কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করে যে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্র কত বিমান, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবে তাহা লীগ কাউন্সিল নির্ধারিত করিবে। কিন্তু এই কমিশনের নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব যখন লীগ কাউন্সিলের সভ্যদের মধ্যে প্রচার করা হয় তখন উহা অস্পষ্ট বলিয়া সভ্যরা মতামত প্রকাশ করে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে (Fifth Assembly of the League) নিরস্ত্রীকরণ নিয়া আলোচনা হয় কিন্তু কিভাবে ইহা কার্যকরী করা হইবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

লীগের সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জেনেভাতে (Geneva) লীগের সাধারণ সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ কিভাবে কার্যকরী করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ হইতে এ পর্যন্ত বাস্তবে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে কোন কিছুই করা হয় নাই। এজন্য লীগের ষষ্ঠ সাধারণ সভা লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেদন করে যেন নিরস্ত্রীকরণ কিভাবে কার্যকরী করা যায় সেজন্য রাষ্ট্রবর্গের এক অধিবেশন শীঘ্র ডাকা হয়। সেই অনুসারে লীগ কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তুতির একটি কমিশনের (Preparatory Commission for Disarmament) অধিবেশন জেনেভাতে ডাকা হয়। এই কমিশনের অধিবেশন শুরু হইলে ইংলণ্ড ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে এই কমিশনের আলোচনার জন্য পৃথক পৃথক খসড়া উত্থাপন করা হয়। উপস্থিত সদস্যদের আলাপ আলোচনায় মতানৈক্য এমনভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে নিরস্ত্রীকরণের মূল প্রশ্নটি এড়াইয়া সকলে পারস্পরিক বিদ্বেষ, ভীতি এবং অহমিকার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission) তিনটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রথমত, স্থলবাহিনী হ্রাস করার ব্যাপারে সকলে একমত হইলেও প্রকৃত সৈনিক বলিতে কাহাদের বুঝাইবে সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফ্রান্স এবং অন্যান্য যে সকল দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের রীতি বর্তমান ছিল সেই সকল দেশ 'সৈনিক' সংখ্যার হিসাব হইতে যাহারা সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিন্তু স্থায়ী সৈনিকের

লীগের সাধারণ সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা

প্রস্তুতি কমিশন (Preparatory Commission)

কাজ করে না তাহাদিগকে বাদ দিতে চাহিয়াছিল। অপরদিকে ইংলণ্ড, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ সৈনিকের মোট সংখ্যার হিসাবে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, নৌবাহিনী সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে ইংলণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেক দেশের নৌবাহিনীর বহন ক্ষমতা কত টন (Ton) হইবে তাহা সীমাবদ্ধ করিতে চাহিল। ইহা ছাড়াও তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজের পৃথকভাবে বহন ক্ষমতা নির্ধারণের পক্ষে ছিল। কিন্তু ফ্রান্স এবং ইটালী প্রত্যেক দেশের জন্য নৌবাহিনীর জন্য নির্ধারিত মোট টন-এর পরিমাণ ঠিক রাখিয়া যে কোন শ্রেণীর জাহাজের জন্য কোন বাঁধাধরা বহন ক্ষমতা স্থির না করার পক্ষপাতী ছিল। তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশগুলি নিরস্ত্রীকরণ সঠিকভাবে পালন করিতেছে কিনা তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ফ্রান্স একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু অন্যান্য দেশ কোনপ্রকার পরিদর্শন সংস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা প্রত্যেক দেশের সততার উপরই নিরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল। যাহা হউক যে সকল বিষয়ে সদস্যগণ মোটামুটি একমত হইতে পারিয়াছিল সেগুলি একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রস্তুতি কমিশন (Prepartory Commission) তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে (১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ)।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রস্তুতি কমিশনের পুনরায় দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতের পার্থক্য ছিল সেগুলির কোন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাই ছিল কমিশনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে একটি নৌবাহিনী-সংক্রান্ত কনফারেন্স (Naval Conference) আহ্বান করা হয়।

নৌবাহিনী-সংক্রান্ত কনফারেন্স (Naval Conference)

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালী এই পাচটি রাষ্ট্র এই কনফারেন্সে সমবেত হয়। ফ্রান্স ও ইটালী এই সম্মেলনে গৃহীত শর্তাদি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান কর্তৃক উহার শর্তাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও চুক্তিটি কার্যকরী হয় না। এই অবস্থায় প্রস্তুতি কমিশন ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নিরস্ত্রীকরণ কনফারেন্সে আলোচনার জন্য একটি দলিলের খসড়া (Draft Convention) প্রস্তুত করে। কিন্তু এই খসড়ায় কোন সর্ববাদিসম্মত নীতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় নাই।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন (১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ)

প্রস্তুতি কমিশনের অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও লীগ কাউন্সিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনেভা (Geneva) শহরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন (Disarmament Conference) আহ্বান করে।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী জেনেভাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হয়। মোট ৬১টি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব আর্থার হেণ্ডারসন। প্রস্তুতি কমিশন কর্তৃক গৃহীত চুক্তির খসড়া এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে স্থাপন করা হয়। এই দলিলে কি পদ্ধতিতে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা হইবে তাহার উল্লেখ ছিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার পদ্ধতি কিভাবে কার্যকরী করা হইবে বা অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার পরিমাণের কোন উল্লেখ ছিল না।* তবে এই খসড়া চুক্তিতে পদাতিক সৈন্য, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী হ্রাস করিবার এবং একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠন করিবার উল্লেখ ছিল।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন শুরু হইবামাত্র ফ্রান্সের প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত ফ্রান্সের নিরাপত্তা প্রশ্নের সাথে জার্মানীর প্রতিনিধি কর্তৃক ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম রাখিবার দাবি উঠিলে সদস্যবর্গের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। ফ্রান্সের প্রতিনিধি জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি না পাইয়া নিজের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হন নাই। এজন্য ফ্রান্সের প্রতিনিধি লীগ-অব-নেশন্‌সের আদেশাধীন পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠনের দাবি উত্থাপন করেন। অপরদিকে জার্মানী ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি জানায়। এইভাবে ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা নিরস্ত্রীকরণের ব্যর্থতার সূচনা করে।

ফরাসী-জার্মান বিরোধ ভিন্ন এই সম্মেলনে আরও নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দেয়। ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্যার জন সাইমন কোন কোন বিশেষ বিশেষ সামরিক সরঞ্জাম—যেমন বিশাল আকৃতির কামান, ট্যাঙ্ক, ডুবোজাহাজ, বোমারু বিমান, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবি উত্থাপন করেন। ইংলণ্ডের প্রতিনিধির এই প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক সমর্থিত হয়। অতঃপর এই প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য তিনটি কমিশনের নিকট স্থাপন করা হয়। তাহাদের সুপারিশ লইয়া আলোচনার সময় কোন্ অস্ত্র আত্মরক্ষামূলক এবং কোন্ অস্ত্র আক্রমণাত্মক ইহা লইয়া বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অনেক প্রতিনিধির মতে ট্যাঙ্ক আক্রমণাত্মক অস্ত্র কিন্তু ফরাসী

*"The draft convention that was placed before the Conference was a general document which indicated the methods of limitation that might be adopted, but which left to the Conference the application of these methods and the decisions as to ratio and figures."—Langsam, P 88.

প্রতিনিধির মতে কেবলমাত্র ৭০ টন-এর উপর ট্যাঙ্ক ভিন্ন আর সব কিছুই আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র। বিশাল আকৃতির ট্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কোন প্রকার অস্ত্র নিষিদ্ধ করা ফ্রান্সের ইচ্ছা ছিল না। অপর দিকে জার্মান প্রতিনিধি যুক্তি দেখান যে, ভার্সাই শান্তিচুক্তি কর্তৃক নিষিদ্ধ সকল অস্ত্রশস্ত্রই আক্রমণাত্মক। শুধু বিষাক্ত গ্যাস সম্পর্কে কোন দ্বিমত দেখা যায় নাই এবং উহা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করিবার কোন নীতি সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, ২০শে জুলাই (১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ) নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সম্মুখে তিনটি কমিশন একটি সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। তাহাতে বলা হয়, বৃহদাকৃতির ট্যাঙ্ক-ব্যবহার করা চলিবে না, বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপ করা চলিবে না, বিষাক্ত গ্যাস যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইবে না, প্রত্যেক দেশের বিমান সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইবে এবং বেসামরিক বিমান চলাচলও আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। মোট ৪১টি দেশ এই প্রস্তাব সমর্থন করে, রাশিয়া ও জার্মানী উহার বিরোধিতা করে এবং ইটালী সহ আটটি দেশের প্রতিনিধি নিরপেক্ষ থাকে। জার্মানীর প্রতিনিধি জোর দিয়া বলেন যে ভার্সাই চুক্তি অনুসারে জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস যে পর্যায়ে আনা হইয়াছে অপরাপর দেশকেও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিয়া সে পর্যায়ে আনিতে হইবে, নতুবা জার্মানীকে পুনরায় অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইবার অধিকার দিতে হইবে। এইভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। ফলে কিছুকালের জন্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হয়। অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হইলে জার্মান প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন নাই। ফলে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালী জার্মানীর সম-অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এই স্বীকৃতিতে অবশ্য বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই জার্মানী সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। এই ঘোষণার পর জার্মান প্রতিনিধি পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে যোগ দেন। এইভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রথম বৎসর সাফল্য লাভের সীমায়িত আশার মধ্যে শেষ হয়।*

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন

পর বৎসর ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের তৃতীয়

*"The first year of the Disarmament Conference ended on this note of restrained hope."—E. H. Carr, "International Relations between Two World Wars.", P 187.

অধিবেশন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ফরাসী-জার্মান বিরোধিতা চরম তিক্ততায় পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) জেনেভাতে আসিয়া নিরস্ত্রীকরণের একটি নূতন পরিকল্পনা সম্মেলনে পেশ করেন।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন

ইহাকে ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা ("Macdonald Plan") বলা হয়। এই পরিকল্পনায় কোন দেশ কত পরিমাণ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে পারিবে তাহার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু চার সপ্তাহের আলোচনা সত্ত্বেও উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে মৌলিক বিষয়েও মতের পার্থক্য দেখা যায়।

ম্যাকডোনাল্ড পরিকল্পনা (Macdonald Plan)

ম্যাক্‌ডোনাল্ড পরিকল্পনা অবশেষে প্রত্যাখ্যাত হইলে ফরাসী প্রতিনিধি একটি নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় নিরস্ত্রীকরণের কাজকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম চার বৎসর একটি আন্তর্জাতিক পরিদর্শক সমিতি বিভিন্ন দেশের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন করিবে এবং এই সমিতির পরামর্শমত প্রত্যেক দেশের জাতীয় সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন করা হইবে। এই চারি বৎসর পর প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণের কাজ শুরু হইবে। ইংলণ্ড ও ইটালীর প্রতিনিধি দুইজন ইহা সমর্থন করেন। এইজন্য জার্মানীর প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং জার্মানী লীগ-অব-নেশন্‌স সদস্যপদও ত্যাগ করে (১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩)। ইহার পর জার্মানী ভার্সাই চুক্তির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধি করিতে থাকে। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের অধিবেশন কয়েক মাস পর ভাঙিয়া যায়। এইভাবে লীগ-অব-নেশন্‌স-এর মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সমাপ্তি

লীগের কার্যকলাপ (Work of Leage):

প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে লীগ-অব-নেশন্‌সের দায়িত্ব ছিল ব্যাপক। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা করা, আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা এবং লীগ চুক্তিভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন এইগুলি লীগের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্যারিসের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। অনেকগুলি ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু আবার কতকগুলি ক্ষেত্রে লীগ অসাফল্যের পরিচয় দিয়াছিল।

লীগের উদ্দেশ্য

যে সকল ক্ষেত্রে লীগ শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হয় তাহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের আধিপত্য লইয়া বিবাদ দেখা দেয়। উভয় দেশই লীগের সদস্য না হইলেও ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় তাহাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেদন করে। লীগ একটি কমিটি গঠন করিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ড তাহা মানিয়া লয়।

আল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ-সংক্রান্ত বিরোধ

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ কাউন্সিল এই দুইটি দেশের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। জার্মানী ও পোল্যাণ্ড লীগের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছিল।

জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের সীমান্ত সমস্যা

গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন ব্যাপারেও লীগের হস্তক্ষেপ সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনাপতি তাঁহার একজন অনুচরের হাতে প্রাণ হারাইলে গ্রীস প্রতিশোধ লইবার জন্য বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠায়। বুলগেরিয়ার সরকার লীগের নিকট আবেদন করিলে প্যারিস নগরীতে লীগের অধিবেশন হয়। লীগ গ্রীসকে সৈন্য অপসারণ করিতে এবং বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।

গ্রীস এবং বুলগেরিয়ার বিবাদ

উপরিউক্ত বিবাদগুলি মীমাংসা করিতে লীগের কোন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ভিন্ন অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে লীগ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। Mandated স্থানসমূহ ব্যাপারে, সার অঞ্চল, ডানজিগ্ ও দার্দানেলিজ এবং বস্‌ফোরাস প্রণালী সংক্রান্ত ব্যাপারে লীগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

আন্তর্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন আহ্বান করা, ক্রীতদাস ব্যবসায় উচ্ছেদ করা এবং শ্রমিক সমস্যা সমাধান প্রভৃতি বিষয়েও লীগের ভূমিকা কম ছিল না।

কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সমাধানে লীগের ব্যর্থতা প্রমাণিত হইয়াছিল।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে করফু ঘটনায় (Corfu incident) লীগের ব্যর্থতা দেখা গিয়াছিল। ঐ সময় গ্রীস এবং আলবেনিয়ার সীমান্ত সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি কমিশনের অধিবেশন যখন গ্রীসে চলিতেছিল তখন ঐ সভায় উপস্থিত ইতালীয়ান দূত জনৈক জেনারেলকে

করফু ঘটনা

গ্রীক দস্যুরা হত্যা করে। ইতালী এজন্য প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রীসের করফু নামক দ্বীপটির উপর গোলাবর্ষণ করে, ঐ দ্বীপটি দখল করে এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে। গ্রীস এই ব্যাপারে লীগ কাউন্সিলের নিকট ইতালীর বিরুদ্ধে অভিযোগে করিলে মুসোলিনী লীগের অধিকার অস্বীকার করেন। অবশেষে যে কমিশনের সভা গ্রীসে চলিতেছিল উহা গ্রীসের উপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপাইয়া দিলে গ্রীস উহা দিতে বাধ্য হয়। ইতালী কর্তৃক লীগের বিচারক্ষমতা অস্বীকার করা লীগের দুর্বলতার পরিচয়।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। লীগ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাপানকে নিরস্ত করিতে চাহে। চীন ছিল লীগের সদস্যরাষ্ট্র, কাজেই লীগের চুক্তিপত্র অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে লীগের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া সেখানে মাঞ্চুকুয়ো (Manchukuo) সরকার নামে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে। লীগ কাউন্সিল জাপানকে মাঞ্চুরিয়া হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেয় কিন্তু জাপান তাহা অগ্রাহ্য করে। ফলে লীগ লর্ড লিটনের নেতৃত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশন এক রিপোর্ট দাখিল করিলে দীর্ঘ আলোচনার পর লীগ জাপানের উপর দোষারোপ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। লীগ কাউন্সিল জাপানের অন্যায় আচরণের শুধু নিন্দাই করিয়াছিল, লীগ চুক্তিপত্রের ষোড়শ শর্তানুযায়ী কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই। এদিকে জাপান লীগ-অব-নেশন্‌সের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া লীগের দুর্বলতা প্রমাণ করিয়াছিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ)

ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া আক্রমণ (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ) এবং এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারা লীগের ব্যর্থতার আরেকটি প্রমাণ। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ইতালীর সোমালিল্যাণ্ড ও ইথিওপিয়ার সীমায় ওয়ালওয়াল (Walwal) নামক স্থানে ইতালীর এবং ইথিওপিয় সৈনিকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে ইতালীর কিছু সৈন্য নিহত হয় এবং ইতালী ইথিওপিয় সরকারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইথিওপিয় সরকার লীগ কাউন্সিলের নিকট আবেদন করে কিন্তু দীর্ঘ দুই বৎসর লীগ কাউন্সিল ইতালীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। ফলে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ ইতালীর একনায়ক (Dictator)

ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) অধিকার

মুসোলিনী সমগ্র ইথিওপিয়া জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মুসোলিনী কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। ফলে লীগের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল।

ইহার পর স্পেনে তথাকার প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্ষমতাচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলে স্পেনীয় সরকার লীগ-অব্-নেশন্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। একনায়ক কর্তৃত্বাধীন জার্মানী ও ইতালী ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করে। স্পেনের সরকার লীগের নিকট হইতে কার্যকরী কোন সাহায্য পাইলেন না। লীগের কাউন্সিল কতকগুলি প্রস্তাব পাস করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ লীগের পতন সূচনা করিয়াছিল।

জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া দখল (১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ) হইলে লীগ কোন কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব-নেশন্স্ ভাঙ্গিয়া যায়।

ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতন (Fascism on ascendant and breakdown of collective Security):

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাশন্সের মাধ্যমে শান্তিস্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ইওরোপে ফ্যাসিজমের প্রকাশ। তদানীন্তন জার্মানী, ইতালী এবং স্পেনের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল।

জার্মানীতে নাৎসি দলের অভ্যুত্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অন্যান্য দেশের তুলনায় জার্মানীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা বহুগুণ বেশী ছিল। বিশাল ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা, যুদ্ধে পরাজয়ের হতাশা এবং মুদ্রাস্ফীতি এই সকল জার্মানীর যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি তাহার জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল। এই সময় এডলফ হিটলার নামে একজন প্রাক্তন সৈনিক 'ন্যাশনাল সোশিয়েলিস্ট' (National Socialists) বা নাৎসি নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির হাতে জার্মানীর পরাজয় এবং ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তির অপমানজনক শর্তগুলি জার্মান জাতিকে প্রতিশোধ গ্রহণে [illegible] । [illegible] নাৎসিদলের প্রতিশোধ গ্রহণের নীতি জার্মান জাতির মনে [illegible] হইয়াছিল। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই নাৎসি দলের সদস্যসংখ্যা জার্মানীর প্রতিনিধিসভা বা রাইকস্ট্যাগে (Reichstag) বৃদ্ধি পায়।

এবং পরের বৎসর সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও ফন্ পেপেন (Von Papen)-এর কারসাজির ফলে হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ)।

হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার নিযুক্ত (১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ)

রাইকস্ট্যাগ্ সভাগৃহে জনৈক অর্ধ-উন্মাদ ওলন্দাজ অগ্নিসংযোগ করিলে হিটলার এই অজুহাতে কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রেট দলের নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তিনি কমিউনিস্ট ভীতির ধুয়া তুলিয়া নাৎসি দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। পরবর্তী নির্বাচনে নাৎসিদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে হিটলার রাইকস্ট্যাগের সাহায্যে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা চারিবৎসরের জন্য বাতিল করেন। কতকগুলি বিষয়ে আইন পাস করাইয়া নাৎসিদল ও উহার নেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এইসময়ে জার্মান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিটলার চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্ট উভয় পদেই নিযুক্ত হন। পদবী হইল 'ফুহ্‌রার' (Fuhrer)।

হিটলারের উদ্দেশ্য

হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মান জাতির অপমান দূর করা এবং সমগ্র জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া জার্মান জাতির এবং রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। নাৎসি সরকার ব্যাপক প্রচার কার্যের মাধ্যমে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে।

হিটলারের পররাষ্ট্র-নীতি

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ইওরোপীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানী সম্পর্কে এক ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। জার্মানীর পুনরুত্থান ফ্রান্স ও রাশিয়ার সর্বাধিক ভীতির কারণ হইয়াছিল। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী কর্তৃক লীগ ত্যাগ ও ভার্সাই-এই শান্তিচুক্তির শর্তগুলি উপেক্ষা করিয়া সামরিক প্রস্তুতি ফ্রান্সের পক্ষে ত্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে ফ্রান্স রাশিয়াকে লীগের সদস্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করে এবং ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালীর উদ্যোগে রাশিয়া লীগের সদস্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স এবং রাশিয়া পরস্পর এক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় (১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ)।

মুসোলিনী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল

অন্যদিকে ইতালীর একনায়ক মুসোলিনী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল (১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ) হইবার পর ইতালী ও জার্মানীর মৈত্রীর পথ প্রস্তুত হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হিটলার ইতালীর সহিত 'অক্টোবর প্রোটোক্যাল' (October Protocal) নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

ঐ বৎসরই হিটলার জাপানের সহিত একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী (Anti-Comintern) চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরের বৎসর জার্মানী এবং ইতালীর মধ্যে একটি কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। স্পেনের একনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো (Franco)-ও হিটলারের পক্ষে যোগদান করেন। এই শক্তিজোটের বিপক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া।

জার্মানী ও জাপানের কমিউনিস্ট-বিরোধী চুক্তি

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে হিটলার এক রাজ্যগ্রাস (aggression) নীতি গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই হিটলারের ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়ার নাৎসীদল অস্ট্রিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে হিটলার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার সুচনিগ (Schuschnigg)-কে ডাকিয়া পাঠান। হিটলারের চাপে সুচনিগ অস্ট্রিয়াবাসীদের মধ্য হইতে নাৎসিদলভুক্ত কয়েকজনকে তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহাতেও অস্ট্রিয়া জার্মানীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কিছুকালের মধ্যেই হিটলারের সৈন্য বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স অথবা রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে কোন প্রকার সাহায্য করে নাই।

হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল

ফলে হিটলার এবারে চেকোস্লোভাকিয়া দখল করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন (Sudeten) অঞ্চল ছিল জার্মান জাতি দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল। হিটলার ঐ অঞ্চলে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানীর সহিত সংযুক্তির সপক্ষে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই আন্দোলনের অজুহাতে হিটলার জার্মানীর সহিত সুদেতেন অঞ্চলের সংযুক্তি দাবি করেন এবং চেকোস্লোভাকিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করেন। চেকোস্লোভাকিয়া সরকার এই বিপদে রাশিয়া ও ফ্রান্সের শরণাপন্ন হয়। এই দুইটি দেশ চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য দানে অগ্রসর হইলে এক ইওরোপীয় যুদ্ধ আসন্ন হয়। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) আসন্ন যুদ্ধ হইতে ইওরোপকে রক্ষা করিবার জন্য মিউনিক (Munich) নামক স্থানে হিটলারের সহিত মিলিত হইয়া মীমাংসার প্রস্তাব আলোচনা করেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার (Daladier) তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য ইংলণ্ডে আসেন। উভয় প্রধানমন্ত্রীই চেকোস্লোভাকিয়া

হিটলার কর্তৃক সুদেতেন অঞ্চল দাবি

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা

সরকারকে জার্মানীর নিকট সুদেতন অঞ্চল হস্তান্তর করিবার চাপ দেন। চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া এই প্রস্তাবে রাজী হইতে বাধ্য হন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণনীতি (Policy of appeasement) হিটলারের দাবি আরও বাড়াইয়া দেয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি

হিটলার তখন কেবলমাত্র সুদেতন অঞ্চল দখল করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়াই অধিকার করিতে চাহিলেন। এই অবস্থায় চেম্বারলেন মধ্যস্থতার জন্য মুসোলিনীর নিকট আবেদন করিলে মুসোলিনীর চেষ্টায় মিউনিক সহরে চেম্বারলেন, দালাদিয়ার, হিটলার এবং মুসোলিনীর এক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হয় কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া বা রাশিয়ার কোন প্রতিনিধিকে ইহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। চেম্বারলেন, দালাদিয়ার এবং মুসোলিনীর অনুরোধে হিটলার কেবলমাত্র সুদেতন অঞ্চল পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই আপস প্রস্তাব মিউনিক চুক্তি (Munich Pact) নামক একটি দলিলে লিখিত হয়। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন মনে করিয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু হতভাগ্য দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া সুদেতন অঞ্চল জার্মানীর নিকট হস্তান্তরিত করিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেসেন (Teschen) দাবি এবং হাঙ্গেরী কর্তৃক ম্যাগিয়ার (Magyer) অধ্যুষিত অঞ্চলটির উপর দাবি চেকোশ্লোভাকিয়া মানিতে বাধ্য হয়। এইভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার এক বিরাট অঞ্চল জার্মানী, হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মিউনিক চুক্তি (Munich Pact 1938)

মিউনিক চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে যুদ্ধ এড়ান সম্ভব হইলেও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানীর গ্রাস হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর কিছুকালের জন্য যে শান্তি ইওরোপে বজায় ছিল সেই সুযোগে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময় পাইয়াছিল। ইহাই শুধু মিউনিক চুক্তির পক্ষে একমাত্র যুক্তি। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন এই চুক্তি হিটলার-তোষণ নীতির এক লজ্জাকর উদাহরণ বলিয়া ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে।

হিটলারেরও মিউনিক চুক্তি মানিয়া চলার ইচ্ছা ছিল না। চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের শাসনাধীন প্রায় আড়াইলক্ষ জার্মান অধিবাসীর নিরাপত্তার অজুহাতে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাচা (Hacha)-কে এক আলোচনা সভায় আহ্বান করেন। এই

হিটলার-হাচা আলোচনা

আলোচনায় যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া হিটলার হাচাকে চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া নামক দুইটি অঞ্চল জার্মানীর সংরক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করেন। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া জার্মানীর শাসনাধীনে আসে।

ইহার পর হিটলার চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে উপস্থিত হন এবং লিথুনিয়া (Lithuania)-কে যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া মেমেল (Mamel) বন্দরটি অধিকার করিয়া লইলেন। ইহার কিছুকাল পরেই পূর্বের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডানজিগ্ (Danzig) বন্দরটি দাবি করেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানীর অপরাংশের সহিত সংযোগ রাখার উদ্দেশ্যে একখণ্ড সংযোগভূমি (Corridor) দাবি করেন।

হিটলার কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া এবং মেমেল বন্দরটি দখল

হিটলার কর্তৃক ডানজিগ বন্দর ও সংযোগভূমি দাবি

হিটলারের অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা এবং মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হইল না। ফলে চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে।* ফ্রান্সও ইংলণ্ডের নীতি সমর্থন করিল। এদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের হিটলার-তোষণ নীতি রাশিয়ার ভীতি সৃষ্টি করিল। এইসব বিবেচনা করিয়া রাশিয়া জার্মানীর সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে (২৪শে আগস্ট্, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ)। কয়েকদিন পর (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ) হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি (Origin of the Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির কারণ খুঁজিতে হইলে আমরা ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তিতে জার্মানীর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে উহার সন্ধান পাই। প্রথমত, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর নাৎসীদলের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই চুক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা। পরাজিত জার্মানীর উপর মিত্র রাষ্ট্রগুলি ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতেই

জার্মানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছা

*"In the event of any action which clearly threatened Polish independence and which the Polish Government accordingly considered it vital to resist with their national forces Great Britain would lend all support that was in its power."—*Vide Carr P. 274.*

এই চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোভাব জার্মান জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্‌র (Ruhr) অঞ্চল দখল এবং মিত্ররাষ্ট্রগুলি কর্তৃক মোতায়েন সৈন্যদ্বারা জার্মান জনসাধারণের প্রতি কঠোর আচরণ মিত্র রাষ্ট্রগুলির প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দেয়।

দ্বিতীয়ত, জার্মানী যখন ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিতে শুরু করে সেই সময় ইঙ্গ-ফরাসী উভয় সরকারই দুর্বলতা প্রকাশ করে। যাহার ফলে নাৎসি সরকারের সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচার কার্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পরোক্ষ উৎসাহ ছিল, যাহার ফলে জার্মানীর প্রতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তোষণমূলক নীতি অনুসরণ করে। জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, মিউনিক চুক্তিদ্বারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর সুদেতনল্যাণ্ড দখলের স্বীকৃতি, এবং জার্মানী কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার এই তোষণনীতিরই পরিচায়ক। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধেও গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন না করার ফলে হিটলার ও মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্রের জয় ও গণতন্ত্রের পরাজয় সূচনা করে। ইহার পর হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী যখন ডানজিগ (Danzig) সহর ও পোলিশ কোরিডর দাবি করে তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জনমতের চাপে জার্মানীকে বাধাদানে কৃতসংকল্প হয়। ফলে জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের দুর্বলতা—তোষণ নীতি

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আরেকটি কারণ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত। বিশ্বের প্রধান শক্তিবর্গ দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়। জার্মানী, ইতালী ও জাপান এই অক্ষ শক্তিবর্গের মৈত্রীর একটি শিবির, আর গণতন্ত্রের সমর্থক ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার আরেকটি শিবির। এই আদর্শগত দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের আদর্শগত সংঘাত

চতুর্থত, ইতালী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি তৈয়ারি করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল এবং ইতালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল লীগের অকর্মণ্যতা সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। এই দুইটি রাষ্ট্রের এবং জার্মানীর জঙ্গী (militarism) মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

ইতালী ও জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি

সর্বশেষে, জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হিটলারের রাজ্য গ্রাস নীতিকে শেষ পর্যন্ত বাধাদান করে। ফলে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ

অনুশীলনী

1. Discuss critically the Locarno Treaty and Pact of Paris.

(লোকার্নো সন্ধি এবং প্যারিসের চুক্তির সমালোচনা কর।

(উত্তর সংকেত ১৮০—১৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

2. What is Disarmament ? How far was it successful after the First World War ?

(নিরস্ত্রীকরণ কাহাকে বলে ? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সমস্যা সমাধান করা কতখানি সম্ভব হইয়াছিল ?

(উত্তর সংকেত ১৮৪—১৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

3. Discuss the activities of the League of Nations after the First World War ?

(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(উত্তর সংকেত ১৮৯—১৯২ পৃষ্ঠা দেখ।)

4. Give an idea of the origin of the Second World War.

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর।

(উত্তর সংকেত ১৯৬—১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

———

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি
(Second World War—its phases)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় বৎসর স্থায়ী ছিল। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া আমেরিকার জেনারেল ম্যাকআর্থার-এর নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জল, স্থল এবং আকাশ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ পদ্ধতি ও মারণাস্ত্রের ব্যবহারের দিক হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে বিস্তৃত হয়, ফলে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক ব্যাপক যুদ্ধে পরিণত হয়। অ্যাটম বোমা (Atom Bomb), বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি নব-আবিষ্কৃত মারণাস্ত্র ব্যবহারের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বেকার যুদ্ধবিগ্রহাদির তুলনায় অনেক বেশী লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু সামরিক দিক দিয়া ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সেই সময় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে জার্মানীর পক্ষে পোল্যাণ্ড জয় করা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কারণ জার্মানী ঐদিকে তেমন সৈন্য সমাবেশ করে নাই।

জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড জয়

পোল্যাণ্ড জয়ের পর হিটলার নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করিলেন। স্ক্যানডানিভিয়া অঞ্চলকে মিত্রশক্তি সামরিক ঘাঁটি হিসাবে পাছে ব্যবহার করে সেইজন্য হিটলার নরওয়ে ও ডেনমার্ক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। উত্তর ইওরোপে জার্মানীর সাফল্যে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার কারণ ফ্রান্স জার্মানীর প্রধান শত্রু। কাজেই জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিবে। কিন্তু ফ্রান্স তাহার পূর্ব সীমান্তে 'ম্যাজিনো লাইন' (Maginot Line) নামে এক সুরক্ষিত প্রতিরক্ষা দুর্গসারি প্রস্তুত করিয়াছিল। জার্মান

হিটলারের নরওয়ে ও ডেনমার্ক অধিকার

বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করিতে গিয়া সম্ভবত ম্যাজিনো লাইন এড়াইয়া চলিবে, ফলে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে চাহিবে এই আশঙ্কা বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। এই আশঙ্কা যে অবাস্তব নহে কিছুকালের মধ্যে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। হিটলার একই সাথে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১০ই মে, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। মাত্র এক সপ্তাহের যুদ্ধেই হিটলার বেলজিয়াম দখল করিতে সমর্থ হন এবং ইউপেন, মরেস্‌নেট ও মামেডি নামক যে তিনটি স্থান বেলজিয়াম জার্মানীর নিকট হইতে অধিকার করিয়াছিল ভার্সাই শর্তানুসারে সেই তিনটি স্থান হিটলার পুনরায় জার্মানীর সহিত যুক্ত করিলেন।

বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড অধিকার

বেলজিয়াম এবং হল্যাণ্ড জয় করিবার পর জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। বেলজিয়াম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রায় চারি লক্ষ ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ডানকার্ক বন্দরে সঙ্কটজনক অবস্থায় অবরুদ্ধ ছিল। জার্মান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে উহার এক বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাইল এবং অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক সৈন্য কোনক্রমে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিল। ফলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে জার্মান বাহিনী অগ্রসর হইয়াছিল উহা অতি সহজেই উত্তর-ফ্রান্সের এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার পর হিটলার ক্যাম্পেইন নামক একটি রেলগাড়ীর কামরায় বসিয়া ফ্রান্সকে যুদ্ধাবসানের চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জার্মানী ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইলে ঠিক সেই স্থানেই একটি রেলগাড়ীর কামরায় ফ্রান্স জার্মান প্রতিনিধিগণকে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করে। হিটলার ঐভাবে ফ্রান্সকে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়া পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সে যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে হিটলারের অধীন হওয়াতে ফ্রান্সের সেই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়াছিল। জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়া ইতালীর অধিনায়ক মুসোলিনী ফ্রান্সের কতকাংশ অধিকার করেন। জার্মানী অধিকৃত উত্তর ফ্রান্স ও ইতালী অধিকৃত ফ্রান্সের স্থানসমূহ বাদে ফ্রান্সের অবশিষ্ট অংশের জন্য জার্মান প্রভাবিত এক ফরাসী তাঁবেদার সরকার ভিচি (Vichy) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রান্সের পরাজয়

এইভাবে ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া হিটলার ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে

প্রতিদিন জার্মানীর বোমারু বিমানের সাহায্যে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশে বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। জার্মান বিমান আক্রমণে ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশ বিশেষভাবে লণ্ডন নগরী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিটলার ইংলণ্ডের সমুদ্রের উপকূলে সৈন্যবাহিনী নামাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু ইংলণ্ডের সরকার সমুদ্রপথে জার্মান আক্রমণের বাধাদানের জন্য সমুদ্র উপকূলের ঘরবাড়ী ও কারখানা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দিয়া উপকূলভাগে বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়া ও বড় বড় কামান স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড সরকার সৈন্যদলে যোগদান বাধ্যতামূলক করিয়া ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোককে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল (Churchill) বলিয়াছিলেন (মে, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ) "আমার রক্ত, শ্রম, অশ্রু এবং ঘর্ম ছাড়া আর কিছুই দেবার নাই।"*

ইংলণ্ডের উপর জার্মানীর বিমান আক্রমণ

আফ্রিকা মহাদেশেও মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের পর আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ বন্ধ করিলে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। এই অবস্থায় ইতালী সহজেই ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড (British Somaliland) দখল করিয়া লইয়াছিল। এরপর মুসোলিনীর উদ্দেশ্য ছিল মিশর ও সুয়েজখাল দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ আধিপত্য নষ্ট করা। কিন্তু ইতালীয় নৌবাহিনী ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সহিত সরাসরি সংঘর্ষ এড়াইয়া চলে। শুধু জার্মানীর বোমারু বিমানগুলি ইতালীর সামরিক ঘাঁটিগুলি হইতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ বন্দর ও নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু ব্রিটিশ জেনারেল আর্চিবল্ড ওয়াভেল (Archibald Wavell) মিশর ও সুয়েজ অঞ্চলে ইতালীর সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দেন এবং ইতালীর সামরিক ঘাঁটি সাইরেনেইকা (Cyrenaica) অধিকার করেন। তদুপরি ওয়াভেল আবিসিনিয়ার (Abyssinia) সিংহাসনচ্যুত রাজা হেইলি সেলাসির (Haile Selassie) সহযোগিতায় ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড, এরিট্রিয়া, আবিসিনিয়া ও ইতালীয় পূর্ব-আফ্রিকা অধিকার করিয়া লন (জানুয়ারী, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ)। হেইলি সেলাসি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে আবিসিনিয়া পুনরায় অধিকার করিয়া সিংহাসন লাভ করেন।

আফ্রিকায় মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ

***"I have nothing to offer but blood and toil and tears and sweat"**—*Churchill Vide Langsam "The World Since 1919, P. 542.*

অন্যদিকে বলকান অঞ্চলে ইতালীয় সৈন্যবাহিনী গ্রীস আক্রমণ করে। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে সাহায্য করা এবং আলবেনিয়া সীমান্তে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের জন্য ইতালী গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ইংলণ্ড গ্রীসকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য পাঠায়। এদিকে ইতালীয় সৈন্যবাহিনী গ্রীস সীমান্ত অতিক্রম করিলে গ্রীস ব্রিটিশের তথা মিত্রশক্তির সহিত যোগদান করে। গ্রীস যুদ্ধে যোগদান করিলে ইংলণ্ডের সুবিধা হইল, তাহার কারণ গ্রীসের অধীন ক্রীট দ্বীপটি ইংলণ্ড সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ পাইল। ইহার ফলে ইংলণ্ড ভূমধ্যসাগর রক্ষা করিবার ও ইতালীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এদিকে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বুলগেরিয়া গ্রীস কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ পুনরায় অধিকার করিবার জন্য অক্ষশক্তিবর্গের (Axis Powers) পক্ষে যোগদান করে। ইহার পরই জার্মান বাহিনী বুলগেরিয়ার রাজধানী সফিয়া (Sofia)-তে প্রবেশ করে এবং বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। এদিকে ব্রিটিশ সরকার যুগোশ্লাভিয়াকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু এইসময় যুগোশ্লাভিয়ায় এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পল সিংহাসনচ্যুত হন এবং দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় পিটার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জার্মানীর সহিত মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে জার্মান সৈন্য যুগোশ্লাভিয়াতে প্রবেশ করে এবং যুগোশ্লাভিয়াকে বুলগেরিয়া, ইতালী ও হাঙ্গেরীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। যুগোশ্লাভিয়ার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লইয়া "ক্রোশিয়া-শ্লাভোনিয়া" (Croatia-Slavonia) নামে একটি জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করা হয়। যুগোশ্লাভিয়া দখলের তিনদিন পর জার্মান সৈন্যবাহিনী গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে প্রবেশ করে এবং ক্রীট দ্বীপটিও দখল করে। ইহার ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইংলণ্ড সম্পূর্ণ মিত্রহীন হইয়া পড়ে।

বলকান অঞ্চলে মিত্রশক্তির পরাজয়—জার্মানী কর্তৃক বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীস অধিকার

এই পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী এবং ইতালীরই জয় দেখা যায় কিন্তু ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী ইরাক, সিরিয়া, ট্রান্স-জোর্ডান এবং পেলেস্টাইনে প্রবেশ করে। মধ্যপ্রাচ্যের ন্যায় উত্তর আফ্রিকাতেও মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিতে থাকে। জেনারেল ওয়াভেল সাইরেনেইকা হইতে

মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির সাফল্য

ইতালীয়ানদের বিতাড়িত করিবার পর জার্মানী সেনাধ্যক্ষ রোমেলের (Rommel) নেতৃত্বে পুনরায় উত্তর আফ্রিকা দখল করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওয়াভেলের উত্তরাধিকারী ইংলণ্ডের সেনাপতি জেনারেল অচিন্‌লেক্ (General Auchinleck) অসাধারণ সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া রোমেলের অগ্রগতি প্রতিহত করেন, ফলে রোমেল শেষ পর্যন্ত উত্তর-আফ্রিকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দেই জাপান জার্মানী ও ইতালীর সহিত এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। জাপানের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করা। এই মিত্রতা চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য নষ্ট করা। যুক্তরাষ্ট্রের দিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের যুদ্ধের মনোভাব আশঙ্কার সৃষ্টি করে।

জাপানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি

এইরূপ পরিস্থিতিতে জাপানী সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে। কিন্তু এই আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই হঠাৎ জাপানী বোমারু বিমানবহর 'পার্ল হারবার' (Pearl Harbour নামক মার্কিন বন্দর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করে (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ)। ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের মিত্রশক্তি হিসাবে জার্মানী এবং ইতালী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।*

জাপান কর্তৃক পার্ল-হারবার আক্রমণ ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু হিটলার যুদ্ধ চলাকালীন এই ধারণা করিলেন যে, শেষ পর্যন্ত রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। একথা ভাবিয়া হিটলার অনাক্রমণ চুক্তি চালু থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন রাশিয়া আক্রমণ করেন। পূর্বেই হিটলার রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সীমান্তে এক বিশাল সামরিক বাহিনী ও বিমানবহর মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে হিটলার এই আক্রমণে সাফল্যলাভ করিলেও শীতের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান

হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ (২২শে জুন, ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ)

*"The war had become global"—*Langsam, "The World Since, 1919. P. 566.*

সেনাবাহিনীর পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া আর সম্ভব হয় না। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে হিটলার স্টালিনগ্রাড (Stalingrad) আক্রমণ করেন এবং কয়েক মাস তুমুল সংগ্রাম চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জার্মান বাহিনী নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সৈন্যবাহিনীর ন্যায় পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া রাশিয়ার সীমা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী জার্মান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলে। ক্রমে লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ জার্মানীর অধিকার হইতে জয় করিয়া লয়। এমনকি রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পূর্ব-প্রাশিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপরদিকে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী গ্রীস হইতে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ও অপসারণ করে। এদিকে তুরস্কও মিত্রশক্তির পক্ষে জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রাশিয়ায় জার্মানীর পরাজয়

আফ্রিকা ও রাশিয়াতে জার্মানীর অগ্রগতি এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর মার্কিন সেনাপতি আইজেন হাওয়ারকে (Eisenhower) ইওরোপে ইতালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আইজেনহাওয়ারের নেতৃত্বে মিত্রশক্তির একদল সৈন্য নরম্যাণ্ডির (Normandy) উপকূলে এবং আরেকদল সৈন্য দক্ষিণ-ফ্রান্সে অবতরণ করে এবং তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অন্যদিকে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে। তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া জার্মানী ও ইতালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ফ্রান্স ও ইতালী মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয়। জার্মানীকেও মিত্রশক্তি চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করে। আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয় দেখিয়া জার্মানী মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিল (২রা মে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ)। জার্মানী রাশিয়ার সহিত একটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া রুশ-জার্মান যুদ্ধের অবসান ঘটায় (৯ই মে, ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ)। জার্মানীকে চারিটি ভাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিজেদের অধিকার স্থাপন করে।

এইদিকে এশিয়া অঞ্চলে জাপান পরপর সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন প্রভৃতি জয় করিয়া লয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জাপানের সাহায্যে আসামের সীমান্ত দিয়া কোহিমা ও বিষেণপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু এডমিরাল মাউণ্ট-ব্যাটেন ও জেনারেল ম্যাকআর্থারের তৎপরতায় প্রাচ্য অঞ্চলেও মিত্রশক্তিবর্গ ক্রমশ

জাপানের এশিয়াতে প্রাথমিক সাফল্য এবং পরে পরাজয়

জয়লাভে সমর্থ হয়। পরাজয়ের সম্মুখীন জাপানকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে জানান হইলে জাপান সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট হিরোসিমাতে ও ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে দুইটি এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করিয়া ঐ দুইটি সহর ধূলিসাৎ করে। ইহার পর জাপানের পক্ষে আর যুদ্ধ চালান সম্ভব হয় না। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণপত্র স্বাক্ষর করে। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (The United Nations Organisation) :

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীর মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই শান্তিকামী করিয়া তোলে। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ-অব-ন্যাশনস্ নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু এই লীগের ব্যর্থতার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয়, অভাবনীয় সম্পত্তি নাশ ও দুঃখ-দুর্দশা ইউরোপ তথা পৃথিবীর রাজনীতিক ও জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর শান্তিস্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই শান্তিস্পৃহার ফলস্বরূপই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামক আন্তর্জাতিক সংঘটির প্রতিষ্ঠা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধ অবসানের কয়েক বৎসর পূর্বেই ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজে বসিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter) নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। প্রথমে ২৬টি এবং পরে আরও ২৯টি দেশ মোট ৫৫টি দেশ আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষর করে। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম ছিল ভারত। আটলান্টিক চার্টারে মোট আটটি শর্ত গৃহীত হয়। ঐ শর্তগুলি আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সংস্থার ভিত্তিস্বরূপ হয়। ইহার পর মস্কো ঘোষণা (১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ) তেহরাণ ঘোষণা, ডাম্বার্টন ওক্স্ আলোচনা (১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ), ইয়াল্টা কনফারেন্স (১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ) এবং সর্বশেষে সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১১১টি ধারা সম্বলিত চার্টার ৫৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

এই ১১১টি ধারা সম্বলিত চার্টারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চারিটি মৌলিক উদ্দেশ্যের ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা

বজায় রাখা; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক জাতির সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা; তৃতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্নাংশের মানব সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষ্টিমূলক এবং মানবতার সমস্যার সমাধান করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করা এবং চতুর্থত, মানুষের অধিকার, সম্মান এবং স্বাধীনতার উন্নতিবিধান করা।

জাতিপুঞ্জের চারটি মৌলিক উদ্দেশ্য

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এগুলির অধীনে নানা শাখা, উপশাখা আছে। প্রধান ছয়টি সংস্থা হইল: (১) সাধারণ সভা (General Assembly), (২) নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council), (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক সভা (Economic and Social Council), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), (৬) দপ্তর (Secretariat)।

জাতিপুঞ্জের সংগঠন

(১) সাধারণ সভা (General Assembly): সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য মাত্রেই এই সভার সভ্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে মোট পাঁচজন এই সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট থাকিবে না। প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা হইবে। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সাধারণ সভায় আলোচনা করা চলিবে। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন এবং নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা যে কোন সদস্য বা সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করিতে পারেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও অছি পরিষদের সকল সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইবে না। এই সাধারণ সভাকে বলা হইয়াছে "ইহা একটি পরিদর্শক, সমালোচক ও আলোচনা সভা"।* সিকিউরিটি কাউন্সিল হইতে প্রেরিত বাৎসরিক রিপোর্ট আলোচনা করা এবং জাতিপুঞ্জের বাজেট আলোচনা ও পাস করা সাধারণ সভার কর্তব্য। অপরাপর সংস্থার বাৎসরিক রিপোর্টও এই সভা আলোচনাকরিবে।

সাধারণ সভা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে সাধারণ সভা সিকিউরিটি

---

* "Deliberative organ, an overseeing, reviewing, and criticising organ"—Longsam, P. 701.

কাউন্সিলের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে পারে। সামরিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে কোন সুপারিশও সাধারণ সভা সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং জাতিপুঞ্জের সদস্যবর্গের নিকট করিতে পারে। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিল যখন কোন আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা বা অনুসন্ধানে রত থাকিবে তখন সাধারণ সভা ঐসব বিষয়ে কোন আলোচনা করিতে পারিবে না।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যনির্বাহক সমিতিস্বরূপ। পাঁচজন স্থায়ী এবং দশজন অস্থায়ী সদস্যসহ মোট পনের জন্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং কমিউনিস্ট চীন হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের কার্যকাল দুই বৎসর। স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলির পাঁচজন নিরাপত্তা পরিষদের "বড় পাঁচজন' নামে অভিহিত। এই পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের 'ভিটো' (Vito) প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। ভিটো প্রয়োগ দ্বারা যে কোন পাঁচটি-সদস্য রাষ্ট্র সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ

গঠন-পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষাই হইল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব।* এই দায়িত্ব পালন করিতে নিরাপত্তা পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি পালন করিয়া চলিবে। এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা সংসদের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকলাপ

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজনবোধে বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, তদন্তের মাধ্যমে, মধ্যস্থতা বা মিটমাটের মাধ্যমে, বিচারালয়ের মাধ্যমে অথবা যে কোন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিতে সাহায্য করিবে।

যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা না হয় তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ যে সকল ব্যবস্থা নিতে পারে তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা আছে। এই সকল ব্যবস্থা হইল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ, রেলপথ, সমুদ্রপথ, আন্তর্জাতিক ডাক সরবরাহ, টেলিগ্রাম, রেডিও বা

---

*"To the security Council was entrusted 'primary responsibility for the maintenance of international peace and security,"—*Vide Langsam. P. 701.*

অপরাপর যোগাযোগের মাধ্যম ছিন্ন করা এমনকি বিবদমান রাষ্ট্রগুলির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করিতে পারে।

এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন মনে করে তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারে। Military Staff Committee নামে একটি সামরিক কমিটির পরামর্শ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীকে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যবহার করিতে পারে।

(৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council): অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব অধিকার' (Human Rights) প্রভৃতি কার্যকরী করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দশম অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা আছে। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত মোট আঠারজন সদস্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। একই রাষ্ট্র হইতে একজনের বেশী সদস্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং অধিকাংশ সদস্যের ভোটে যে কোন প্রস্তাব পাস করা যাইবে।

গঠন পদ্ধতি

এই পরিষদ আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে, রিপোর্ট প্রস্তুত করিবে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ সাধারণ সভা অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্র বা যে সকল বিশেষ প্রতিষ্ঠান ঐ সকল বিষয়ে কার্যে রত আছে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিবে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে উন্নতি এবং মানব অধিকার (Human Rights) বৃদ্ধি করিবার জন্য এই পরিষদ কমিশন স্থাপন করিবে। এই কমিশনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল খাদ্য ও কৃষি পরিষদ (Food and Agricultural Organisation বা F. A. O.) আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund), আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank) আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour

কার্যাদি

Organisation বা I. L. O), ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation বা U. N. E. S. C. O) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) অছি পরিষদ (Trusteeship Council):

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

অছি পরিষদের সভ্য হইল যে সব সদস্য রাষ্ট্র অছি রাজ্যসমূহের শাসনভারপ্রাপ্ত, নিরাপত্তা পরিষদের যে সকল স্থায়ী সভ্য, অছিরাজ্যসমূহের ভারপ্রাপ্ত নয় তাহারাও অছি পরিষদের সভা এবং সাধারণ সভা দ্বারা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত কয়েকজন সভ্য। প্রত্যেক অছি পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে।

কার্যকলাপ

যে সকল রাষ্ট্র অছিরাজ্যসমূহ শাসনের ভারপ্রাপ্ত তাহাদের নিকট হইতে রিপোর্ট গ্রহণ করা, অছিরাজ্যসমূহের অধিবাসীদের অভিযোগ সম্বন্ধে আবেদনপত্র গ্রহণ, তাহা বিবেচনা করা, এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা অছি পরিষদের কার্যতালিকা ভুক্ত। যে সকল অঞ্চল অছি পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রুয়াণ্ডা, উরুণ্ডি, ক্যামেরুন্‌স্‌, টোগোল্যাণ্ড এবং পশ্চিম সেমোয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice):

গঠন পদ্ধতি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ৯২নং ধারায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে জাতিপুঞ্জের প্রধান বিচারবিভাগীয় শাখা বলা হইয়াছে।* এই বিচারালয়ের উপর বিভিন্ন সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত বিবাদ, আন্তর্জাতিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে। মোট পনরজন বিচারপতি লইয়া এই আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যাইবে না। বিচারপতিরা জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা ও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

*"To the Security Council was entrusted 'Primary responsibility for the maintenance of international peace and security"'—*Vide Lnngsm, P. 701.*

*"The International Court of Justice shall be t e principal judicial organ of the United Nations"—*Article 92.*

জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, রাজনৈতিক বিবাদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে সেইরূপে বিবাদের মীমাংসা আন্তর্জাতিক বিচারালয় করিতে পারে না। ইহা নিরাপত্তা পরিষদের কার্যের মধ্যে গণ্য করা হয়।

(৬) দপ্তর (Secretariat):

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি দপ্তর আছে। এই দপ্তরটি স্থায়িভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (New York) নগরে প্রতিষ্ঠিত। প্রচুর কর্মচারী এই দপ্তরের কাজে নিযুক্ত আছে। এই কর্মচারীদের প্রধান হইলেন সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের স্থপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইতে পারে এরূপ যে কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারি জেনারেল নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। তিনি বৎসরে একবার জাতি সম্মেলনের কার্যবিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ করিয়া থাকেন।

সেক্রেটারী জেনারেল

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ (Work of the United Nations):

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলোচনা করিলে এই জাতিপুঞ্জের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। যদিও ইহার কার্যকলাপ পূর্ণমাত্রায় সন্তোষজনক বলা যায় না তথাপি ইহার কার্যাবলী আন্তর্জাতিক অনেক ক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সক্ষম হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথমত ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে, সোভিয়েত সৈন্য ইরানে মোতায়েন করা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এই সোভিয়েত সৈন্য ইরানে মোতায়েন করা হয়। শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের চেষ্টায় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আপস-মীমাংসার মাধ্যমে সোভিয়েত সৈন্য ইরাণ হইতে অপসারিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরাণের বিবাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সিরিয়া ও লেবাননে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন করা ছিল। সেই সৈন্য অপসারণ করিবার জন্য সিরিয়া ও লেবানন জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করিলে জাতিপুঞ্জের ইচ্ছা অনুসারে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার নিজেদের সৈন্য অপসারণ করিয়া লইয়াছিলেন।

সিরিয়া ও লেবানন

কিন্তু কোন কোন বিষয়ে জাতিপুঞ্জের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিপ্লবের ফলে সরকারের পরিবর্তন হইলে ঐদেশে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার জাতিপুঞ্জের নিকট আবেদন করে। নিরাপত্তা পরিষদ এবিষয়ে তদন্ত করিতে চাহিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাধাদানের ফলে কিছু করা সম্ভব হয় না।

চেকোশ্লোভাকিয়া

কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ব্যাপারেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে দীর্ঘকাল আলোচনার পর পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তানের অধিকারে আছে উহা হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তকে এপর্যন্ত মানিয়া লয় নাই।

কাশ্মীর সমস্যা

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তি স্থাপনের চেষ্টা অনেকসময় ব্যাহত হইয়াছে। তাহার অন্যতম কারণ বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের জাতিপুঞ্জকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির বা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যবহারের চেষ্টা। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে কোরিয়া (Korea) যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের মত গ্রহণ না করিয়াই দক্ষিণ কোরিয়াতে সৈন্য পাঠায় উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য। যদিও পরে যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের অনুমোদন গ্রহণ করে এবং জাতিপুঞ্জ কোরিয়াতে সৈন্য পাঠায় কিন্তু ঐ সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ম্যাকআর্থার (General Macarthur) ছিলেন ঐ জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনীর প্রধান এবং কোরিয়াতে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপনের ইচ্ছাই ছিল কোরিয়া যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য।

কোরিয়ার ঘটনা

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে আরব-ইস্রায়েল বিবাদেও আরবের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের যুদ্ধ ঘোষণায় জাতিপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই।

আরব ইস্রায়েল বিবাদ

যদিও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আশানুরূপ ভাবে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি Walter Lipman-এর ভাষায় বলা যায় ইহা একটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান।* ইহার উপস্থিতি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাকে অনেকাংশে দূরীভূত করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে কমিউনিস্ট চীনের স্থায়ী আসনের পর হইতে এবং চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার পর হইতে সম্মিলিত জাতিসম্মেলন মর্যাদার

* "An indispensable Institution".—*Walter Lipman*

আসন লাভ করিয়াছে। Schuman এর কথায় বলা যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কার্যকরী হইতে পারে তখনই যখন বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে

* "An effective U. N. will be one in which the Power have achieved a 'modus vivendi' and have developed peaceful coexistence"—*Schuman*.

অনুশীলনী

1. Discuss the main incidents of the Second World War.

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা।) (পৃষ্ঠা ১৯৯—২০৬)

2. Trace the origin and aims of the United Nations Organisation.

(সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর।)

(পৃষ্ঠা ২০৬—২১১)

3. Discuss the composition and functions of the General Assembly and the Security Council of the U. N. O.

(সাধারণ-সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদের গঠনপদ্ধতি এবং কার্যাবলী আলোচনা কর।

(পৃষ্ঠা ২০৬—২০৮)